মারিয়া
প্রিলেজায়েভা

লেনিন : অরণ্যে অন্তরীণ

"রাদুগা" প্রকাশন
মস্কো

মারিয়া প্রিলেজায়েভা · লেনিন: অরণ্যে অন্তরীণ

মারিয়া প্রিলেজায়েভা

লেনিন : অরণ্যে অন্তরীণ

উপাখ্যান

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: দ্বিজেন শর্মা
অঙ্গসজ্জা: লেভন খাচাত্রিয়ান

МАРИЯ ПРИЛЕЖАЕВА
Удивительный год
На языке бенгали

M. PRILEZHAYEVA

A Remarkable Year
In Bengali

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত
স্কুলের মাঝারি ও বড় বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য

$П \frac{4803010102—341}{031(05)—85} 096—85$

ISBN 5-05-000113-7

॥ ১ ॥

নিজ জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ পরিতুষ্ট লোক দুর্লভ বৈকি। কারও হয়ত সত্যিকার সুখী হবার মতো যথেষ্ট অর্থ নেই: তারা সব সময়ই অন্যদের তুলনায় গরীব। কারণ, ওই অন্যদের আছে দামী ফ্ল্যাট, মহার্ঘ আসবাবপত্র আর সেজন্যই তো সমাজে ওদের ওতটা নামডাক, এমন সহজ সিদ্ধি। কেউ আবার দাম্পত্য জীবনে অসুখী: স্ত্রী বেজায় খরচে কিম্বা হাড়কিপটে, বিষয়-আশয়ে অসম্ভব আসক্ত। নিজ পেশা নিয়ে অসন্তুষ্ট লোকও রয়েছে: শিক্ষা অনুযায়ী চাকুরি জোটে নি, এখনকার কাজ এক উঞ্ছবৃত্তি, আজীবন ঘানি টানার ঝঞ্ঝাট।

কিন্তু প্রখোর এক ব্যতিক্রমী মানুষ। তার স্ত্রী, ফ্ল্যাট, অর্থবিত্ত কিছুই নেই। তবু সে সদাতুষ্ট। তার বিয়ের বয়স হতে এখনো কয়েক বছর বাকী। আর টাকাকড়ি? ওটি তার কোনদিনই ছিল না, হবেও না। এ-নিয়ে সে কখনো মাথাও ঘামায় নি। জীবনে শুধু একটিই দুঃখ এবং সেটি তার ডাক-নামটি: প্রন্‌কা। ওটি শহুরে সমাজে বড়ই বেমানান।

'কী নাম?'

'প্রন্‌কা।'

'প্রন্‌কা, গলাবাজ বাঁদর!'

কিম্বা আরও খারাপ:

'প্রন্‌কা, ঘূর্ণলোচন গাধা!'

সত্যি, তার চোখগুলি বেশ বড়সড়ই ছিল—ধূসর আর নীলের আঁচ মেশান। সে আশপাশের চারদিকে ডাগর চোখে তাকিয়ে থাকত, যেন এই প্রথম নতুন কিছু দেখছে। এই অশেষ কৌতূহলপ্রবণতার সঙ্গে ওর দুর্লভ পেশাটিও চমৎকার খাপ খেয়েছিল।

লিফার্ত মুদ্রণ ও ব্লক নির্মাণ ভবন।
এখানে অতি সুলভে বই, পুস্তিকা, প্রতিবেদন, সাময়িকী
এবং সব ধরনের অফিস-ফর্ম ছাপান হয়

বলশায়া মস্কোয়া সরণীর ভিতঘরপ্রায় একটি বাড়ির সামনে সাইনবোর্ডটি ঝুলান থাকে।

পথের দিকে ঘ্লঘ্লির মতো ঝুলকালি-মাখা কয়েকটি জানালা সহ প্রায়ান্ধকার এই ঘরের দেয়াল নিত্যদিন ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব আর জলে ভিজে ভিজে ওগ্লিতে নোনা ধরেছিল। কোণগ্লি ছাতা-ধরা কাদায় চটচটে থাকত। বদ্ধ ঘরগ্লির বাতাস দ্র্গন্ধে ভারী হয়ে উঠত আর সন্ধ্যার দিকে সকলের ব্ক শ্বাসকষ্টের মতো এক ধরনের ব্যথায় টনটন করত। কিন্তু প্রন্কা তার কাজটি নিয়ে গর্ব করত। সে বই ছাপাত। অবশ্য সে তখনো প্রোদস্তুর ম্দ্রক হয় নি। সে ছিল আসলে শিক্ষানবিস আর ফাইফরমাশ খেটে প্রায়ই তার দিন কাবার হত। প্রন্কা ওদিকে দৌড়া! এদিকে আয়! প্রন্কা ওটা আন, এটা নে! তার নাম ছিল প্রখোর। কিন্তু সতেরো বছর হলেও বয়সের তুলনায় ছোটখাটো, প্ঁচকে দেখাত বলে তাকে সবাই ডাকত প্রন্কা নামে। সর্ কাঁধ, লম্বা গলা—সব মিলিয়ে তার চেহারাটি শ্রমিকের চেয়ে গরীব ছাত্রের সঙ্গেই বেশি মানানসই ছিল। অভাব ছিল কেবল একজোড়া চশমার। চশমা আঁটলেই হল—ব্যস, দস্তুরমতো এক গরীব ছাত্র। তাছাড়া এর আরও একটি কারণ ছিল: বই ছাড়া তাকে বড় একটা দেখা যেত না। বই সে দার্ণ ভালবাসত। বই হলেই হল। এতে ছবি থাক বা না থাক, হোক জীবজন্তু বা মান্ষের গল্প, ভ্রমণকাহিনী, বিদেশ বা রাশিয়া সম্পর্কে কিম্বা রাজনীতির বই। সবই তার পছন্দ!

কাজটি ছিল প্রখোরের জন্য বিরাট এক সৌভাগ্যের ব্যাপার। ছাপাখানার ফোরম্যান ফ্রল ইয়েভসেয়েভিচের সঙ্গে দিদিমার জানাশোনার সত্ত্বেও অনেক ঝামেলা প্রষিয়ে তবেই ওটি জ্টান গিয়েছিল। সে-সময় প্রখোরের কাছে বই ছাপান ছিল অদ্ভুত এক রহস্য, যেন ভোজবাজি। যে-বইটি কোথাও নেই সেটিই এখানে জন্মাচ্ছে। কিভাবে এটা সম্ভব? যেমন এখন তারা ভ্লাদিমির ইলিনের একটি বই ছাপছে। এতে তাদের অনেকটাই সময় যাবে, প্রো মার্চ অবধি। কোথায় কোন এক সময় জনৈক পণ্ডিত তার চিন্তাভাবনা নিয়ে লিখতে শ্র্ করলেন, জীবনযাত্রার ধরন কেমন হওয়া উচিত সে-সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করলেন, ভরে তুললেন একটির পর একটি খাতা। তারপর সবকটি খাতাই ছাপাখানায় এল। এক সময় কম্পোজিটাররা অক্ষর বসাল, প্রখোর ও অন্যরা ছাপার মেশিনের কাজ শেষ করল। সব মিলিয়ে বইয়ের সংখ্যা দাঁড়াল দ্' হাজার চার শ। এগ্লি নানা পথে ছড়িয়ে পড়বে সারা দ্নিয়ার দ্রদ্রান্তরে।

কোন বই ছাপা শ্র্ হলেই প্রখোর এটির বিষয়বস্তু জানতে চাইত। মেশিন থেকে সবে বেরিয়েছে, তখনো ভেজা, ভারি, এমন একটি পাতা হাতে নিয়ে প্রখোর এক অদ্ভুত অন্ভবে আলোড়িত হত, গোগ্রাসে অক্ষরগ্লি গিলতে থাকত। বইটি এখনো কেউ পড়ে নি। সারা দ্নিয়ায় সে-ই এটির প্রথম পাঠক! কিন্তু ভ্লাদিমির ইলিনের 'রাশিয়ায় প্ঁজিতন্ত্রের বিকাশ' বইটি? ওটি পড়ে ফেলা মোটেই সহজ হল না। প্রথম পাতাতেই সে হোঁচট খেল এবং রেখে দিল। কিন্তু ফ্রল ইয়েভসেয়েভিচ ভোঁতা তামাশায় তাকে চটিয়ে দিল। ওকে আনকোরা প্ষ্ঠার উপর চোখ ব্লাতে দেখে ফোরম্যান বলল:

'রাখ, রাখ ছোঁড়া, তোর মুরদে কুলবে না।'

'আমার মতো লোকদের জন্যে নয়, তাই না? কাদের জন্যে তাহলে? ওটা আমি পড়বই!'

কিন্তু সে পারল না। অসম্ভব কঠিন ছিল বইটা। সে এলোমেলোভাবে কিছুটা পড়ার চেষ্টা করল। নিজের মতো কিছুটা বুঝলও হয়ত। তার সবচেয়ে ভাল লাগল রুশ দেশের জেলা ও এলাকাগুলির খুঁটিনাটি বর্ণনা। মনে হল যেন লেখক পায়ে হেঁটে এলাকাগুলি দেখেছেন। কোথাও লিখেছেন ওরিয়ল জেলার শণ চাষ সম্পর্কে, অন্যত্র আছে মস্কো জেলার লেস-শিল্পের আলোচনা। সেখানকার একটি চাষীর মাথায় ধূর্ত বুদ্ধি গজাল: জমি চষে মরছি কেন? সে ভাবল, লেস কিনে লাভ নিয়ে বিক্রি করলেই তো পারি? এভাবেই গাঁয়ে বেনিয়া, পুঁজিবাদী জন্মাল। আরেক জায়গায় প্রখোর শহরতলির সবজি খেতের বর্ণনা পড়ল। সে জানত তার শহরের সবজি-চাষীরা বিক্রির জন্য দুশোর মতো কেয়ারিতে বাঁধাকপি ফলাত। সে বইটিতে রাশিয়ায় আরও বেশি পরিমাণে খামারের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম তৈরির হিসাবটিও পাওয়া গেল। কিছুই লেখক ভ্লাদিমির ইলিনের দৃষ্টি এড়ায় নি। রিয়াজান জেলার সাপোজক শহর এবং আশপাশের গ্রামগুলিতে শস্যমাড়াই ও শস্যঝাড়াই কল তৈরি থেকে যে স্থানীয় বেনিয়ারা অঢেল পয়সা লুটছে — এসব খবরও বইটিতে ছিল।

আশ্চর্য, রিয়াজান জেলার সাপোজক সম্পর্কে পড়ার সময়ই প্রখোর রাশিয়ায় জায়মান পুঁজিতন্ত্রের চেহারাটা মোটামুটি আঁচ করতে পারল।

কিন্তু এটা জানারই বা প্রয়োজন কী?

'যা-সত্য, তাই জানা উচিত,' ফ্রল ইয়েভসেয়েভিচের ব্যাখ্যা।

ফ্রল ইয়েভসেয়েভিচ ছাপাখানার ফোরম্যান। সে কম্পোজিটারদের কাজ দেয়, মেশিনম্যানদের ছাপানোর জিনিসগুলি যোগায় ও কাজের হিসাব বোঝায়, ছাপান পাতাগুলির গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখে। সে গাড়ি করে প্রকাশকদের কাছে যায়, পাণ্ডুলিপি আনে এবং কম্পোজিটার ও মুদ্রাকররা শেষে এই পাণ্ডুলিপিগুলিকেই বইয়ের রূপ দেয়।

পিটার্সবুর্গ থেকে কয়েক শ' মাইল দূরে নিজ গাঁয়ে থাকার সময় প্রখোর গির্জার স্কুলে পড়ত। তাদের শিক্ষক ছিলেন হাড্ডিসার, আর টেকো, পরতেন সোনালী রিমের চশমা। শ্রদ্ধাভরে দুহাতে বই তুলে ধরে উচ্ছল দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি ছাত্রদের বলতেন:

'বই আমাদের বিবেক, আমাদের রাজ্য!'

বইগুলি 'আমাদের রাজ্য' এই কথাটিই বিশেষভাবে প্রখোরের ভাল লাগত। এইসঙ্গে তার মনে পড়ত ইস্টার উৎসবে গির্জার অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি যখন এই ধাতব শব্দস্রোত সারাদিন ধরে শহর ও আশপাশের খেতগুলির উপরে সেঁটে থাকত, উপছে-ওঠা নদীর

স্রোতে ভেসে চলত বরফের টুকরোগুলি ঝিরঝির শব্দে, পরস্পরের সঙ্গে ঘা খেতে খেতে এবং পারে ছিটকে পড়ে...

ফ্রল ইয়েভসেয়েভিচকে দেখে তার ওই শিক্ষকের কথা মনে পড়ত। সেও চশমা পরত এবং সোনালী রিমের। সেও কথা বলত কম এবং যুতসই।

'রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্র বেড়েই চলছে, আর গরীবদের অবস্থা কেবলই খারাপ হচ্ছে,' এভাবেই বইটির সারবস্তু সে প্রখোরকে বোঝাল এবং কঠিন স্বরে হুঁশিয়ারি জানাল: 'বেশি বকবক করিস না! বইটি এখনই আমাদের ছাপিয়ে বের করতে হবে।'

বুঝতে পেরে প্রখোর শিস দিল।

'শিস্‌টিস কম দিবি ছোঁড়া! এখনো বাচ্চাটিই আছিস। এটা তোর গায়ে সেঁটে গেছে। এদিকে আয়, একটা কাজ আছে।'

তাকে ছাপাখানার পাশের ঘরের দিকে ইঙ্গিতে সে তার সঙ্গে যেতে বলল। ওখানে পাণ্ডুলিপি ও জরুরি কাগজপত্র থাকে। সবুজ ছাতলায় কোণগুলি ওখানে ভরে গিয়েছিল আর দেয়ালে ছিল কিপ্রেনস্কির আঁকা পুশকিনের ছবি: হাতমোড়া, চিন্তাবিষ্ট।

'কাজটি এই বইয়ের,' ফ্রল ইয়েভসেয়েভিচ প্রখোরকে বলল। 'প্রুফ দেখার জন্যে কাগজগুলি এক মহিলার কাছে নিয়ে যেতে হবে, মানে তিনি দেখবেন যাতে ছাপার কোন ভুলটুল না থাকে। ওঁর নাম আন্না ইলিনিচ্‌না। দেখা হয়ে গেছে এমন কিছু কাগজ তিনি তোকে ফেরত দেবেন। ওই কাগজগুলি তুই এখানে, ছাপাখানায় আনবি।' চশমাটি নাকের ডগায় নামিয়ে কাচের ভেতর দিয়ে কঠিন চোখে প্রখোরের দিকে তাকিয়ে বলল:

'বুঝলি তো?'

'বুঝেছি। আর এই মহিলা কি লেখক ভ্লাদিমির ইলিনকে চেনেন?'

ফ্রল ইয়েভসেয়েভিচ ধীরেসুস্থে নাক থেকে চশমা তুলল—মনে হল যেন চোখজোড়া বন্ধ করল।

'জানি না।'

'জানেন বলেই মনে হয়!' প্রখোর ভাবল। 'কিছু একটা চাপাচাপের ব্যাপার আছে।'

'যতটুকু জানি আন্না ইলিনিচ্‌না নিজেও লেখিকা,' ফ্রল ইয়েভসেয়েভিচ বলল। 'তিনি কবি। হয়ত তুই ইতালির লেখক অ্যামিচিসের 'স্কুলের বন্ধুরা' বইটা পড়েছিস। উনিই তা রুশীতে অনুবাদ করেন। বইটা বাচ্চাদের জন্যে চমৎকার। শুনলি, এবার কাজে যা।'

প্রখোর প্রায় উড়ে চলল। সে সব সময়ই চটপটে। তবে এবার ভিতঘর থেকে সত্যিই সে গুলির মতোই ছুটে বেরুল। কিন্তু ফুটপাতে বেরিয়ে সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। একটি গাড়ি বলশায়া মরস্কায়া সরণী দিয়ে অনুপথ বসন্তের রোদ্রে ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলছিল। গাড়িটি প্রখোর চিনত। রোজ, একই সময় এই গাড়িতে বলশায়া

মস্কোয়া সরণীর ৬১নং বাড়িতে পুলিশের এক বড়কর্তা আসে। পুরু কাচের জানালা, টবে রাখা পামগাছ, মহার্ঘ গালিচা-পাতা সিঁড়ি, ফটকে পাহারাদার—এই বাড়িতেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গরেমিকিনের অফিস। তিনিই পুলিশ, রক্ষিবাহিনী, জেলখানা, নির্বাসন, সেন্সর ও রাজনৈতিক তদন্তের অধিকর্তা। পুলিশের বড়কর্তা এখানে রোজকার রিপোর্ট দিতে আসে।

দিনটি স্বচ্ছ রৌদ্রোজ্জ্বল, সেণ্ট পিটার্সবুর্গে মার্চ মাসের পক্ষে একটি ব্যতিক্রম। গাড়ির চাকা জমাট কাদা ছিটোচ্ছিল আর চড়ুইগুলি রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রাণপণে কিচিরমিচির করছিল। পুলিশ কর্মচারীটি বারেক টেরা চোখে রোদের দিকে তাকিয়েই সম্ভবত কোন সুখচিন্তায় ডুবে গেল। পরিচ্ছন্ন শ্মশ্রুশোভিত তার সযত্নলালিত মুখে সুস্পষ্ট তুষ্টি, কণ্ঠে কোন গানের অনুচ্চ রেশ।

ঘোড়ার খুরের শব্দ: খট্-খট্।

'ত্রা-রি-রি, ত্রা-রি-রি,' ছাপাখানার কিনার ঘেঁষে চলমান গাড়ি থেকে ভেসে আসা পুলিশ অফিসারের গানের সুর প্রখোর শুনতে পেল।

আর তখন লিফার্তের ছাপাখানার ছাপা-মেশিনগুলি সশব্দে চলেছে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসছিল জনৈক অজ্ঞাত লেখক ভ্লাদিমির ইলিনের লেখা 'রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ' বইটির এক-একটি পাতা।

প্রখোর মুনিয়ার মতো শিস দিয়ে কোটের নিচে রাখা কাগজগুলি এক হাতে চেপে ধরে ঘোড়া-টানা ট্রামের দিকে ছুটে গেল।

অনেকগুলি বই ছাপলেও কোন জলজ্যান্ত লেখক সে আজও দেখে নি। তাই আজকের দিনটি ছিল দারুণ কৌতূহলের। বিকেলেই এক বাড়িতে ব্যতিক্রমী ধরনের কয়েকজনের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার কথা। আর কী আশ্চর্য, এখনই সে দেখতে পাবে জনৈকা লেখিকাকেও।

সে মনে মনে আন্না ইলিনিচ্‌না একটি ছবি আঁকল: গর্বিতা মধ্যবয়সী মহিলা, চোখে চশমা, স্তূপাকারে সাজান চুল, সাদা আঙুলে অনেকগুলি আঙটি। সে এই ধরনের মহিলাদের ছবি 'নিভা' পত্রিকায় দেখেছে এবং তেমনটিই লেখিকাকে কল্পনা করেছে। কিন্তু দেখা গেল তিনি একেবারেই আলাদা। প্রখোর দরজার ঘণ্টা টিপল। দরজা খুললেন জনৈকা মহিলা: প্রায় যুবতী, ফিটফাট, ততটা লম্বা নন, পরনে ছাই রঙের পোশাক। তার কালো চুল কপালের উপর অনেকগুলি আঙটি করে বাঁধা; সরু ভাঙ্গা ভুরুর নিচে গভীর কালো চোখ। তিনি দরজার ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন, যেন সাবধান হওয়ার চেষ্টা করলেন।

'আমি লিফার্ত ছাপাখানার লোক,' প্রখোর বলল।

'ও, আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি!' আন্না ইলিনিচ্‌না বললেন। তার স্বরে খুশির রেশ। 'আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন... আপনার নাম? প্রখোর...

ওখানে, মানে ছাপাখানায় কি অনেকদিন আছেন? কাজ শিখছেন নাকি? আসুন প্রখোর। আমি অপেক্ষায়ই ছিলাম।'

প্রথমে ওভারকোট এবং শেষে কোট খুলে ছাপান কাগজগুলি বের করার সময় তিনি কিছুটা অস্থিরভাবে তাকে লক্ষ্য করছিলেন।

'ধন্যবাদ! চমৎকার! একটুও ধামসে ফেলেন নি, কাজের লোক। অশেষ ধন্যবাদ!' বলে কাগজগুলি বুকে রেখে আড়াআড়িভাবে দু'হাতে চেপে ধরলেন।

সে তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পারল তিনি খুশি হয়েছেন, আর ভাবী বইটির পাতাগুলি এখানে তাঁর কাছে পুরোপুরি নিরাপদ। তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

'আপনাকে কিছু বলে দেয়া হয় নি, প্রখোর?'

'হ্যাঁ, এর বদলে শুদ্ধ করা পাতাগুলি আমাকে ফেরত নিতে হবে।'

'ঠিক কথা। এক মিনিট।'

কাগজগুলি নিয়ে তিনি অন্য ঘরে গেলেন। প্রখোর চারদিকে তাকাল। ঘরটি ছোট, ছাদ নিচু, বেতের তৈরি চেয়ার সহ মাঝখানে ডিমের আকারের একটি টেবিল। দেয়ালে টানা দেরাজ। আর কিছু নেই। অথচ সে ভেবেছিল লেখক মাত্রেই ধনী, বিলাসী। না থাক জাঁকজমক, তবু সাধারণের মতো নয়। কিছুটা আলাদা বৈকি।

'আমি ভেবেছিলাম যে লেখকরা অন্যভাবে থাকেন,' শুদ্ধ করা কাগজগুলি নিয়ে আন্না ইলিনিচ্না ফিরে এলে সে বলল।

একটা আলাপ শুরুর ভণিতা হিসেবেই সে কথাগুলি বলল। তখনই, দু-একটা কথা না বলে চলে যাওয়ার ইচ্ছা তার ছিল না।

'কী ধরনের লেখক?' অবাক হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'এই যেমন আপনি।'

'কে, আমি? হা কপাল, ঠিকই বলেছেন। কোন্ ধরনের লেখকদের কথাই না ভেবেছে!' তিনি হাসিতে ফেটে পড়লেন। সেও হাসতে লাগল।

'হ্যাঁ, ঠিকই, আমিও এক-আধটু লিখি... কেন, আমার কিছু পড়েছেন?'

'না, তেমন সুযোগ হয় নি।'

'ও প্রখোর, মজার লোক বটে আপনি!' তিনি মুচকি হাসলেন। 'ছাপাখানার কাজটি আপনার জন্যে ভালই, কী বলেন?'

'খুব ভাল! আন্না ইলিনিচ্না, লেখকরা কেমন করে লেখেন? ধরুন না ভ্লাদিমির ইলিনের কথাই। কিভাবে উনি লেখেন?'

হঠাৎ তিনি যেন বদলে গেলেন। মুখের সেই ভাবটি আর রইল না।

'আমি জানি না, আমি দুঃখিত। প্রখোর, কাগজগুলি ভালভাবে কোটের নিচে লুকোন যাতে পড়ে না যায়। আর ফ্রল ইয়েভসেয়েভিচকে বলবেন সবকিছু ভালই চলছে...'

তখনই চলে যেতে প্রখোরের ইচ্ছে হচ্ছিল না।

'কেন বললাম,' কাগজগুলি কোটের নিচে গুঁজে যথাসম্ভব আস্তে আস্তে বোতাম আঁটতে আঁটতে সে বলল, 'কারণ, বই ছাপানোর সময় এতে কী আছে, এটা কিভাবে লেখা হয়েছে জানতে ইচ্ছে হয়। আমার জানা একটি লোক বলেছে যে রাশিয়া সম্পর্কে পুরো খাঁটি কথাটাই এতে বলা হয়েছে। রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্র বাড়ছেই, অথচ গরীবদের তো মরণদশা কাটছে না।'

'সে ঠিকই বলেছে,' হেসে বললেন আন্না ইলিনিচ্‌না।

প্রখোর তাঁকে ভালবেসে ফেলল। সে তাঁর সঙ্গে দুনিয়ার যাবতীয় গুরুতর বিষয় নিয়ে অতি গোপনীয় সব ব্যাপারে প্রাণখোলা আলাপ করতে চাইল।

''রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ' বইটিতে জ্ঞানের কথা আছে। বইটি রাজনীতির। আমি ততটা পড়তে পারি নি, তবে মনে হয়েছে এটা রাজনীতি সম্পর্কে—এটুকুই আমি বুঝেছি।'

'সত্যি?'

তিনি আরও কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। তারপর যেন আপনমনেই বলে চললেন: 'হয়ত, হবে। তবে এসব নিয়ে কথা না বলাই ভাল।'

'ঠিকই বলেছেন। পুলিশ-টুলিশরা নাক গলানোর আগেই বইটি ছেপে ফেলা দরকার।'

'কী, কী?' কেমন যেন আঁতকে উঠলেন তিনি। লাল হয়ে ওঠা গালে তিনি আঙুলের ডগা ছোঁয়ালেন। মনে হল গালদুটি যেন পুড়ে যাচ্ছে। 'এই যা বললেন, আর বলবেন না কখনো।'

'বুঝেছি। কেন পুলিশের কথা মনে পড়ল জানেন? এই যখন কাগজগুলি নিয়ে আপনার কাছে আসছি ঠিক তখনই ওদের বড়কর্তাকে গাড়িতে যেতে দেখলাম কিনা। উনি রোজই এপথ দিয়ে যান। ডাইনে-বাঁয়ে তাকান না। ভারি দেমাকী। আমরা রাশিয়া সম্পর্কে কী ধরনের বই ছাপছি এসব কিছু তিনি আঁচ করছেন বলে মনে হয় না। অবশ্য এটা তো বেআইনী কিছু নয়। তবে এসব নিয়ে ভাবলে... আন্না ইলিনিচ্‌না, আপনি কি ভ্লাদিমির ইলিনকে চেনেন?'

আন্না ইলিনিচ্‌না চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। দীর্ঘ, অস্বস্তিকর কয়েকটি মুহূর্ত। 'এসব কী কথা প্রখোর?' আন্না ইলিনিচ্‌নার মিষ্টি মুখটিতে ভয়ের ছোঁয়া লাগল। প্রখোর আপনমনে বলল: 'যেভাবেই হোক আলোচনাটা বদলান দরকার!'

'আপনার 'স্কুলের বন্ধুরা' বইটি লাইব্রেরী থেকে চেয়ে আনব ভাবছি।'

'বইটা তো আমার নয়। আমি ওটি ইতালীয় ভাষা থেকে অনুবাদ করেছিলাম।'

'ইতালীয় থেকে? আচ্ছা! কত লেখাপড়া আপনার!'

আন্না ইলিনিচ্না হাসলেন। আশ্চর্য, মনভুলান হাসি!

'আপনিও পণ্ডিত হতে পারেন প্রখোর। যদি সত্যি চান। আপনি পড়তে জানেন? অনেক পড়াশোনা করেন?'

'করি। একেবারে ছোটবেলা থেকেই পড়ছি। আর আপনি?'

'আমিও ছোটবেলা থেকেই। আমাদের পুরো পরিবারটাই বলতে গেলে বইয়ের পোকা। কৈশোরে আমাকে প্রত্যেকটি গ্রীষ্মই গাঁয়ে কাটাতে হয়েছে। কাজান জেলায়। ওখানে আমাদের একটি ছোটখাটো পুরনো বাড়ি আছে, আর আছে ছায়াঢাকা বাগান, টিলা ও তার তলায় ছোট একটি নদী। ওখানে বার্চবীথির নিচের পথটিকে আমি ভালবাসতাম। স্বচ্ছ জ্যোৎস্নারাতে চাঁদের আলোয় ওটা কেমন এক স্বপ্নের রাজ্য হয়ে উঠত... আর অন্ধকার রাতে পুরনো বাগানটিকে বড় বিষণ্ণ মনে হত। আমরা তখন বারান্দায় আলোর নিচে বসতাম, প্রত্যেকের হাতে থাকত একটি করে বই।'

'আমাকে একজন বলেছে যে আপনি কবি।'

'দেখছি আপনার বন্ধুটি সবজান্তা! আপনার বয়সে অবশ্য লিখতাম।'

'আপনার একটা কবিতা একটু শোনান না আন্না ইলিনিচ্না! শোনাবেন?'

'কী অদ্ভুত লোক রে বাবা। সে তো একযুগ আগের ব্যাপার।'

'তাতে কী। শোনান না!'

'নাছোড়বান্দা বটে। শুনুন তবে:

> রাত তখন গভীর
> নিদ্রিত চরাচর,
> নিবিড় আঁধারে ঢাকা
> মাঠঘাট বাড়িঘর।
> একটি বাড়ির দাওয়ায় তখনো
> আলোর শিখা জ্বলে,
> আজব এক পড়ুয়ার দল
> গেছে সবকিছু ভুলে।

আমার কবিতাগুলি খুবই সহজ সরল।'

'ওই রাতভোর পড়ুয়ারা নিশ্চয়ই আপনার ভাইবোনরা, তাই না? নিশ্চয়ই ভাল পরিবার!'

'তাই। পরিবারে আমি সুখী ছিলাম। যাক, আপনার এখন ছাপাখানায় ফেরা উচিত। কাগজগুলো হারিয়ে ফেলবেন না তো? দেখবেন ভাল করে। ঠিকমতো রেখেছেন তো? শোনেন, আপনাকে দুটো কথা বলি। যাদের ভাল করে জানেন না তাদের সঙ্গে হুঁশিয়ার হয়ে কথা বলবেন, বিশেষ করে রাজনীতি নিয়ে।'

আর প্রখোর এখনই তাঁকে আজ রাতের সভা সম্পর্কে বলতে যাচ্ছিল। খবরটি সে আর চেপে রাখতে পারছিল না। এখন এই হুঁশিয়ারি শোনার পর সে এটা চেপে গেল, শেষে উনি তাকে বাচাল না ভাবেন।

মনের কথা মনে রেখেই সে বিদায় নিল।

সে চলে যেতেই আন্না ইলিনিচ্না দরজা এ'টে জানালায় এসে দাঁড়ালেন। তিনি দেখলেন প্রখোর দৌড়ে রাস্তা পেরিয়ে তড়িঘড়ি ঘোড়া-টানা ট্রাম-স্টপের দিকে যাচ্ছে। ওর কাঁধ সরু, শীতের কোটটা হাঁটুরও নিচে পে'ছিয় নি।

'ভাল ছেলে। খুবই কচি। তবে বুদ্ধু নয়। চমৎকার ছেলে,' আন্না ইলিনিচ্না ভাবলেন। 'তাহলে বইটা রাজনৈতিক, তাই কি? যে-লোক কথাটা বলেছে, ঠিকই বলেছে। মেহনতিরা বইটির সারমর্ম, তাৎপর্য বুঝতে পারছে শুনলে ভলোদিয়া* খুশি হবে।'

ট্রাম এল। প্রখোর চাপল। আন্না ইলিনিচ্না শোবার ঘরে এলেন। ঘরটি খোড়লের মতো, একটি লোহার খাটেই ভরে গেছে। খাটটা সুতিকাপড়ের সাদা চাদরে ঢাকা। কোণে লেখার একটি ছোট টেবিল। ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা। গায়ে চাদর জড়িয়ে তিনি নতুন প্রুফ নিয়ে বসলেন। প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি অঙ্ক তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেন, অনেকক্ষণ ধরে। রাতের খাবার খাওয়া হবে না। বরফের চাঙর থেকে ভেঙ্গে পড়া কোন টুকরো জানালায় ছিটকে পড়লে সেই শব্দেই কেবল মুখ তুলবেন। রাত গভীরতর হবে। সারা পিটার্সবুর্গ ঘুমিয়ে পড়বে এবং তখনই হয়ত বিছানায় যাবেন।

॥ ২ ॥

কাজের শেষে সেই 'বিশেষ বাড়িতে' যাওয়ার আগেই কোন লাইব্রেরীতে যাওয়ার কথা প্রখোর ভাবল। বইটা কেমন—এই কল্পনায় সে আচ্ছন্ন হল। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছিল শিশুসাহিত্য। বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক ইত্যাকার সব কঠিন বইয়ের ভক্ত হলেও প্রখোর ইতালীয় লেখক এদমন্দো অ্যামিচিসের লেখা 'স্কুলের বন্ধুরা' পড়ার জন্য এই মুহূর্তে অধীর হয়ে উঠেছিল। কারণ, বইটি অনুবাদ করেছেন আন্না ইলিনিচ্না।

আন্না ইলিনিচ্নার বাড়ি থেকে প্রখোর ফিরেছিল হৃদয়ে অঢেল উজ্জ্বলতা নিয়ে। কিন্তু ওঁর মধ্যে আশ্চর্য কী দেখেছে এমন প্রশ্নের জবাব দেয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে জানত না। তিনি তার সঙ্গে কথা বলেছেন, জরুরি কিছুর আভাস দিয়েছেন

---

* লেনিনের ডাকনাম।

এবং আরও কিছু, অনেক কিছু যা এখনো অস্পষ্ট, প্রচ্ছন্ন। প্রখোরের ইচ্ছা, সে হবে আন্না ইলিনিচ্‌নার কবিতার সেই পড়ুয়াদের একজন।

পড়ুয়াদের এমন কোন চক্র তার নেই। সে এপথে একা, নিঃসঙ্গ। তার গোপন চিন্তাভাবনার শরিক কেউ নেই। তবে একটি বৈঠকে সে যাচ্ছে... হতে পারে ওখানে... আসন্ন সভার উপর সে তার অশেষ ভরসা ন্যস্ত করল।

ছাপাখানার কাছেই ছিল সাধারণ গ্রন্থাগার। সেই পথে যেতে যেতে সে তার স্বপ্নের জাল বুনে চলল। ওখানে গ্রন্থাগারিকের কাজ করে এক কড়া মেজাজের তরুণী, চুলে কট্টর বব-ছাঁট, পরনে কালো স্কার্টের সঙ্গে সাদা ব্লাউজ—থুতনি অবধি আটকানো অসংখ্য ছোট ছোট বোতামের সার। 'রাজনীতি সচেতন' পাঠকদের সে পছন্দ করে আর সেজন্য প্রখোরের মতো অল্পবয়সী বেয়াড়াদের সব সময়ই গ্রামীণ জীবনের ছবি নিয়ে লেখা গ্লেব উস্‌পেনস্কির গল্প, শ্রমিক শ্রেণী সম্পর্কে শেলগুনোভের প্রবন্ধ এবং নিঃস্ব, হতমান মানুষের জীবন নিয়ে অনুরূপ সারগর্ভ লেখা পড়তে বলে। তাই প্রখোরের চাওয়া বইটির নাম শুনে সে বিস্ময়ে তার বাঁকান ভুরু কুঁচকে বলল:

'মনে হচ্ছে, আপনার ছোট ভাইয়ের জন্যে?'

'আমার কোন ভাই নেই। ওটা আমার নিজের জন্যে...'

'নিজের জন্যে?'

বাঁকান ভুরুগুলি এবার তার ছোট্ট কপাল অবধি পেঁছল আর তখনই এল দুটি ছাত্রী — মাথায় মখমলের টুপি — দেয়ালে টানান আলমারিতে বইয়ের তালিকায় নাম খুঁজছিল তারা। কৌতূহল ও উন্নাসিকতার আঁচ মেশান দৃষ্টিতে তারা তাকাল প্রখোরের দিকে।

'এটা যে বাচ্চাদের বই, আপনি জানেন কি?' গ্রন্থাগারিক জিজ্ঞেস করল।

সে যে 'রাজনীতি সচেতন' পাঠকের মর্যাদা দ্রুত হারিয়ে ফেলছে এটা বুঝলেও এবং হার মানতে না চাইলেও অন্যদের ফরমাশ অনুসারে বই পড়ে পড়ে তার বিরক্তি ধরে গিয়েছিল।

'বাচ্চাদের এই বইটাই আমি চাই।'

'বাচ্চাদের? বটে!..'

'স্কুলের বন্ধুরা' খুঁজতে গ্রন্থাগারিকের তিন মিনিটের মতো সময় লাগল। সময়টা প্রখোর কাটাল উদাসীন ভঙ্গিতে এবং একবারও মেয়েদের দিকে না তাকিয়ে।

'এটা শিশুদের একটি ক্লাসিক,' বলতে বলতে সে ফিরে এল, হাতে রঙবেরঙের বাঁধাই বাদামী চামড়ার কোণওয়ালা একটি ছোট বই।

'ক্লাসিক, তাই না? এটাই চাইছিলাম।'

সে বইটি হাতে নিল এবং দেখল: 'স্কুলের বন্ধুরা', এদমন্দো দ্য অ্যামিচিস। ইতালীয় থেকে অনুবাদ—আ. উলিয়ানভা। তার মন আনন্দে নেচে উঠল।

প্রখোর বইটি কোটের তলায় পুরল।

মখমলের টুপিওয়ালা ছাত্রীরা পরস্পরের দিকে সমবেদনার দৃষ্টিতে তাকাল, যেন বলতে চাইল: আহা, খেটে-খাওয়া, অশিক্ষিত বেচারী, ছেলেমানুষ, এর বেশি আর কীই বা পড়তে পারবে!

মনে মনে প্রখোর জবাব দিল: 'আর কী সব বই পড়েছি তোমরা যদি জানতে।'

মেয়েগুলির সঙ্গে সে পরিচিত হতে পারত। লাইব্রেরীতে বইয়ের তালিকায় পছন্দসই বই খোঁজার সময় প্রায়ই একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হয়, বই নিয়ে মত বিনিময় করে, যেন তারা একই পাঠচক্রের সদস্য। এভাবে এই লাইব্রেরীতেই প্রখোরের পরিচয় পিওতর বেলোগরস্কির সঙ্গে—উসকোখুসকো চুলওয়ালা উঁচু কপালের সেই ছাত্রটি।

'সে খনিবিদ্যা ইনস্টিটিউটের ছাত্র'—কলারে আঁকা প্রতীক ও পোশাকের বোতাম থেকেই বুঝেছিল প্রখোর। তারা বই বেছে নিয়ে একসঙ্গে পথে নেমেছিল। তখনই আলাপ হল আর প্রথম দিনই বেলোগরস্কি তাকে জিজ্ঞেস করেছিল:

'সরকারবিরোধী ছাত্রধর্মঘটের কথা শুনেছ কি?'

প্রখোর উড়ো খবরের মতো এমন কিছু একটা শুনেছিল। এবার সে জানল ছাত্ররা অদম্য সাহসে কিভাবে সরকারের কাছে বাকস্বাধীনতা ও সভানুষ্ঠানের অধিকার দাবি করেছে আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গরেমিকিনের আদেশে ঘোড়সওয়ার পুলিশ ল্যাঠি চালিয়ে মিছিলটা ভেঙেছে।

'গরেমিকিন একটা ইতর, জল্লাদ,' চারদিকে একনজর তাকিয়ে বেলোগরস্কি বলেছিল। সারা বিকেলটাই তারা হেঁটে হেঁটে গল্প করেছিল। এমনটি বলেছিল একনাগাড়ে তিন সন্ধ্যা আর বেলোগরস্কি বলেছিল ছাত্রদের সভা ও ধর্মঘটের কথা, কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের অনন্য ব্যক্তিত্বের কথা এবং মার্কসের সঙ্গে ভিন্নমত, সেরা রাজনৈতিক নিবন্ধকার মিখাইলভস্কির কথা। তারপর বেলোগরস্কি জিজ্ঞেস করেছিল:

'তুমি কি কয়েকজন বিপ্লবীর সঙ্গে দেখা করতে চাও?'

উত্তেজনায় প্রখোরের গলায় কথা আটকে গিয়েছিল, হৃৎস্পন্দন ত্বরিত হয়েছিল।

এখন সে চলেছে প্রস্তাবিত ওই বিপ্লবীদের বৈঠকে। ওখানে তার জন্য কী অপেক্ষা করছে, কী বিপদে সে নিজেকে জড়াতে চলছে—এসব কিছু সে জানে না। তবে তার সময়জ্ঞান কত কম! অ্যামিচিসের বইটি পরে নিলে কি চলত না? এজন্য কমপক্ষে পুরো একটি ঘণ্টা তার দেরি হল।

বিড়বিড় করে নাম-ঠিকানা আওড়াতে আওড়াতে সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় পেঁছে সে শ্বাস নিতে একটু দাঁড়াল। সামনেই বাদামী চামড়া-মোড়া দরজায় একটি নামফলক: 'ইয়েকাতেরিনা দমিত্রিয়েভনা কুসকভা'। সবই খোলামেলা। অথচ এখানেই বিপ্লবী

চক্রের বৈঠক চলেছে। প্রকাশ্যে? তখন অবধি কোন বিপ্লবী চক্রের সঙ্গে প্রখোরের যোগাযোগ ছিল না, তাই সে ধীরেসুস্থে ঘণ্টি টিপল।

উত্তেজিত পিওতর বেলোগরুস্কি কোটের বোতাম না এ'টেই সামনের ঘরে ছুটে এল।

'তাহলে এসেছ, এসেছ? চমৎকার লোক বটে! আমি এদিকে ভয়ে মরছি। ভেবেছি আমাদের প্রলেতারিয়েতটি হয়ত ভয় পেয়ে সরে পড়েছে!'

সে প্রখোরকে হাত ধরে একটি বড় ঘরে নিয়ে এল। ঘরের সবকটি মেঝেতে রঙবেরঙের গালিচা পাতা, কোণে বিশাল এক পিয়ানো। চুল্লির জ্বলন্ত স্তূপাকার কয়লার হালকা নীলচে আলো।

'ইয়েকাতেরিনা দ্মিত্রিয়েভনা, ভদ্রমহোদয়রা!' সে চে'চিয়ে বলল, 'রুশ শ্রমিক শ্রেণীর একজন চিন্তাশীল প্রতিনিধিকে দেখুন!'

সে প্রখোরকে গৃহকর্ত্রীর কাছে এনে দাঁড় করাল। ইয়েকাতেরিনা দ্মিত্রিয়েভনা কুস্কভা অল্পবয়সী, সুন্দর তার গড়ন, গাঢ় রঙের চুল, পরনে কালো রেশমী পোশাক। তাঁকে ঘিরে আছে তরুণের দল, ওদের পরনে ছাত্রদের মতো কোট কিম্বা অভিজাত লোকের স্যুট। কুস্কভার মুখে সরু সিগারেট, ছাই ফেলছেন তিনি সরাসরি কার্পেটের উপর।

'ভাল করে দেখি তো!' ইয়েকাতেরিনা দ্মিত্রিয়েভনা ভারিক্কি গলায় বললেন। 'তাহলে আপনিই প্রখোর? আপনার কথা শুনেছি। বেলোগরুস্কি আমাকে বলেছিল। এই যে, সবাই ওঁর খাঁটি রুশী নামটি লক্ষ্য করুন! আপনি ছাপাখানার মজুর? মহোদয়রা, দেখুন, ছাপাখানার মজুররা আমাদের আন্দোলনে শরিক হতে চাইছে। খুবই টিপিক্যাল। রুশ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এরাই সবচেয়ে চিন্তাশীল। নমস্কার প্রখোর! আমি কুস্কভা। আপনাকে দেখে খুব খুশি হলাম। আসুন আমাদের সঙ্গে। আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। কমরেডরা, কেউ ওঁকে একটু চা দিন...'

ছাত্রদের একজন পাশের ঘর থেকে এক গ্লাস কড়া চা নিয়ে এল। দাঁড়িয়ে চা খাওয়ার অনভ্যাসে তার অসুবিধাই হচ্ছিল। তাছাড়া বগলে চেপে রাখা বইটির বাড়তি ঝামেলা। পাছে সামনের ঘরে সেটা রাখতে হয় সে ভয় তার ছিল অপরিচিতরা লক্ষ্য করছে দেখে তার লজ্জারও শেষ ছিল না।

'ওঁকে বিব্রত করা ঠিক হবে না,' কুস্কভা বললেন। 'প্রখোর, চা'টা শেষ করে ফেলুন। একটু সহজ হোন। মহোদয়রা, ওঁকে জ্বালাতন করবেন না। পরে এক সময় উনি আমাদের বলবেন তাঁর মতে মেহনতিদের কী চাই, তিনি নিজে কী চান।'

অবশ্য তিনি প্রখোরের মতামতের অপেক্ষা না করে নিজেই বলতে লাগলেন:

'মহোদয়রা, শ্রমিকরা রাজনীতিতে উৎসাহী নয়।'

কথাটি শুনে প্রখোর অবাক হল। বলতে গেলে, রাজনীতি ছাড়া আর কিছুতে তার তেমন উৎসাহ ছিল না। রাজনীতির টানেই তো এখানে আসা!

'ওঁর কথা বলছি না, অবশ্যই না!' প্রখোরের ভিন্নমত আঁচ করে কুস্‌কভা বললেন। 'আমি জনগণের কথা বলছি। ব্যতিক্রম তো থাকবেই।' সমর্থকদের কাছে আবেদন জানানোর সময় তাঁর চোখগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'শ্রমিক শ্রেণীর জন্যে উন্নততর জীবন গড়ে তোলা আমাদের সংগ্রামের পবিত্র লক্ষ্য! অজ্ঞ, অত্যাচারিত আমাদের শ্রমিক...'

'অজ্ঞ' কথাটি প্রখোরকে আঘাত করল। হয়ত সত্য, তবু। সে চায়ের গ্লাস টেবিলে রেখে হাত বুলিয়ে চুলগুলি পিছনে সরাল এবং প্রতিবাদের প্রস্তুতি নিল। কিন্তু সুযোগ এল না। মহিলাটি অনর্গল বলে চলেছেন। তিনি রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর কঠিন, নিষ্ঠুর ভাগ্যের কথা বলছিলেন। রুশ শ্রমিকরা নিরক্ষর, গোড়ায় তাদের যা দরকার সেটা হল মানুষের মতো বাঁচার একটা ব্যবস্থা। প্রলেতারিয়েতদের মানুষী জীবন গড়ে তোলার জন্য প্রথমে কারা লড়াই শুরু করবে? বুদ্ধিজীবীরা। নিজেদের শ্রমিক শ্রেণীকে অর্ধভুক্ত রাখার জন্য, তাদের সাক্ষরতার জ্ঞানটুকুও না দেয়ার জন্য বুদ্ধিজীবীদের লজ্জিত হওয়া উচিত। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলের কথা, ক্ষমতা দখলের কথা কি ভাবা যায়? আহা, এসবই হাস্যকর, নাইভ। গোড়ায় শ্রমিকদের লেখাপড়া শেখাতে হবে, মেঝের উপর গাদাগাদি না হয়ে নিজেদের বিছানায় শুতে শেখাতে হবে। ঠিক না?

তাঁর রেশমী পোশাক থেকে খসখস শব্দ আসছিল। তিনি সারা ঘরে পায়চারি করছিলেন, কেবলই সিগারেট টানছিলেন কিম্বা সিগারেট ফেলে দিয়ে আঁটসাঁট কাপড়ের নিচে উঁচু হয়ে থাকা বুকের উপর হাত চেপে রাখছিলেন।

'আমরা, বুদ্ধিজীবীরা, চিন্তাশীল শ্রেণীর মানুষরাই এই দায়িত্ব নেব...'

'কিন্তু মিখাইলভ্‌স্কি তো প্রমাণই করেছেন যে রাশিয়ায় শ্রমিকের বদলে কৃষকদের গুরুত্ব হাজারগুণ বেশি,' মেয়ের মতো লাল গাল আর রোগাটে মুখ ছাত্র উঁচু গলায় প্রতিবাদ জানাল।

'কোন্‌ মিখাইলভ্‌স্কি? আপনার ওই মিখাইলভ্‌স্কিকে নিয়ে তো দেখছি আপনি অনেক পেছনে পড়ে রয়েছেন। অথচ প্রলেতারিয়েতের অভ্যুদয় ঘটে গেছে।'

'রাশিয়ার আরেক নাম কৃষক, গ্রামগঞ্জ! রাশিয়ার ভবিষ্যৎ কৃষকের হাতে, গাঁয়ের মধ্যে,' রোগাটে মুখ ছাত্রটি জেদ ধরে বলল।

কিন্তু পিওতর বেলোগরুস্কি কুস্‌কভার পক্ষ নিল।

'হ্যাঁ, প্রলেতারিয়েত জন্মেছে। কিন্তু, আমরা, বুদ্ধিজীবীরাই রাশিয়ার ভাগ্য গড়ব!' আর সে প্রখোরের কানে কানে বলল: 'উনি সারা ইউরোপ ঘুরেছেন, আলাপ আছে বড় বড় সব দার্শনিকের সঙ্গে। বার্নস্টাইনের নাম শুনেছ?'

'বন্ধুগণ!' যেন আবিষ্ট হয়ে মাথার পেছনটা চেপে ধরে কুস্‌কভা বললেন, 'শান্ত, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন আমাদের নয়। এটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ! আমরা কিছু একটা করতে চাই যা বাস্তব আকর্ষণীয়, বলুন কী, কী ওটা...'

'আপনি বুদ্ধিজীবীদের আত্মা দেখছেন। বুদ্ধিজীবীরা অস্থির হয়ে উঠেছে!..'

'কী জন্যে অস্থির সেটা জানতে পারি কি?' কাছেই প্রখোর একটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। 'যেমন, আমাদের স্কুল-পরিদর্শকও অস্থির, আর সেটা প্রমোশনের জন্যে।'

'আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত!' পিওতর বেলোগরস্কি চেঁচিয়ে উঠল এবং আরেকবার প্রখোরের কানে কানে বলল: 'ভাল লাগে? কেমন ঝগড়াঝাঁটি! মহিলাটিকে কী মনে হয়? কিছুটা মেজাজী, ওই যা। উনিই কেবল সবাইকে জাগিয়ে তুলতে পারেন, এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন...'

'প্রচারের জন্যে আমাদের চাই অন্তত একটা খসড়া থিসিস, রুশ সমাজের উপযোগী একটি কর্মসূচী,' কে একজন দাবি জানাল।

'একটা কর্মসূচী থাকা জরুরি বৈকি।'

'মহোদয়রা, শুনুন!' পিয়ানোর উপর থেকে একটি নোটবুক এনে পাতা ছিড়্‌তে ছিড়্‌তে কুস্‌কভা চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'আসুন আমরা সবাই মিলে এটা ঠিক করি। এটা হোক আমাদের সকলের সমবেত চেষ্টার ফল। প্রকোপভিচ আর আমি এ নিয়ে ভাবছিলাম...'

'যে-কোন ধরনের বিপ্লবেরই আমরা বিরোধী, এই ঘোষণা দিয়েই কাজটি শুরু হওয়া উচিত!' একটি হেঁড়ে গলা শোনা গেল।

'নিশ্চয়ই, তবে...'

'কোন 'তবে' নেই, আমরা সমাজের ক্রমাগত বিকাশ চাই। বিপ্লব মানেই ধ্বংস।'

'মহোদয়রা, শুনুন!' প্রবল উত্তেজনায় পিওতর বেলোগরস্কি চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার প্রস্তাব...'

কিন্তু সকলেই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। কারও কোন কথাই বোঝা যাচ্ছিল না। কেউ রুশ মেহনতিদের চরম দুরবস্থা সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা দিচ্ছিল, কেউ বলছিল বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের উপর ইতিহাসদত্ত দেশোদ্ধারের দায়িত্বের কথা, কেউ বা অন্যদের থামাতে গিয়ে বাধাচ্ছিল হট্টগোল:

'শ্রমিকদের পার্টি গড়তে দেয়া মানে তাদের জাহান্নমে পাঠান, জাহান্নমে মশাইরা!'

তারা সকলেই মেহনতিদের জন্য দুঃখ বোধ করছিল। গোলমাল ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে প্রত্যেকেই নিজের মতামত জাহির করছিল বলে প্রখোর বিশেষ কিছুই বুঝতে পাচ্ছিল না। তবে একটা ব্যাপারে তার সন্দেহ ছিল না যে মাদাম কুস্‌কভা ও তাঁর

অতিথিরা মেহনতিদের সম্পর্কে খুবই সহানুভূতিশীল, কিন্তু ওদের উদ্ধারের কোন পথ তাদের জানা নেই।

'মহোদয়রা!' কুস্‌কভা জোরে বললেন, 'পশ্চিমের শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের শুরু করতে হবে। বলতে গেলে, আমরা তো পশ্চিমেরই এক দুর্বল সংস্করণ।'

'শুরুতেই বলা দরকার, বিপ্লব রাশিয়ার জন্যে নয়। এটাই গোড়ার কথা। রাশিয়ায় এর এখনো অনেক দেরি। আমাদের, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বিপ্লব সম্পর্কে চুপ করে থাকাই উচিত,' একই হেঁড়ে গলা শোনা গেল।

'না, না, মহোদয়রা, প্রথম ও আসল ব্যাপার হল...'

প্রখোরের চিন্তাভাবনা সব তালগোল পাকিয়ে গেল। সভাটিতে এতটুকও শৃঙ্খলা ছিল না।

'এটা বরং মুলতুবি রাখা যাক'—অবশেষে কুস্‌কভা বললেন। 'বিষয়টা ভেবে দেখব। আমাদের আগামী বৈঠক পর্যন্ত...'

তিনি নোটের পাতায় যা-কিছু লিখেছিলেন সবই কেটে দিয়ে ওগুলি পিয়ানোর উপর ছুঁড়ে ফেললেন। মনে হল সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'ঠিক কথা, তড়িঘড়ি এসব কাজ করা যায় না। তাড়াহুড়ো করে তো একেবারেই অসম্ভব। মহোদয়রা, পরের বার আমি এর একটা খসড়া তৈরি করব...'

কুস্‌কভা আরেকটি সিগ্যারেট ধরিয়ে ধোঁয়ায় কুণ্ডলী ছাড়তে ছাড়তে প্রখোরের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

'প্রথমত, একেবারে গোড়ায়ই শ্রমিকদের চাই যথেষ্ট খাবারদাবার, ভাল থাকার জায়গা আর... শিক্ষাদীক্ষা—আপনি আমার সঙ্গে একমত, নাকি?'

অবশ্যই! সবাই একই কথা বলবে। মহিলাটির কথা বিশ্বাসযোগ্যও বটে। কিন্তু শ্রমিকদের পার্টি ও বিপ্লব সম্পর্কে নিজের ভাবনা প্রখোর তখনই ভালভাবে বুঝিয়ে বলতে পারল না। কুস্‌কভার পুরো বক্তব্যটি বিশ্বাসযোগ্য হলেও প্রখোরের মনে এর বিরুদ্ধে একটা অস্পষ্ট প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠছিল।

'এটা কী বই?' কুস্‌কভা জিজ্ঞেস করলেন, 'দেখি কী পড়ছেন? অ্যামিচিস? দেখি তো... অনুবাদ আ. উলিয়ানভা। সত্যি! জানেন, আন্না উলিয়ানভার সঙ্গে বিদেশে আমার দেখা হয়েছিল। এটা তাঁর। তাঁর অনুবাদ। উলিয়ানভদের সম্পর্কে কিছু জানেন?'

'উনি দুনিয়ার সবাইকেই জানেন, তোমাকে বলি নি?' উত্তেজিত বেলোগরুস্কি প্রখোরের কানে কানে বলল।

'জানেন না, সত্যি? সত্যিই জানেন না? এই আন্না ইলিনিচ্‌নারই ভাই হলেন আলেক্‌সান্দর উলিয়ানভ। জারকে মারতে গিয়ে ধরা পড়লে ওঁর ফাঁসি হয়।'

একটা আলোড়ন, একটা হল্লা উঠল।

'সেই উলিয়ানভ? অসম্ভব?'

'অসম্ভব কেন? সেই উলিয়ানভই! ওঁর বাড়ি ভোল্গার পাড়ে কোথায় যেন...'

প্রখোর মনে আঘাত পেল। ফ্রল ইয়েভসেয়েভিচের কাছ থেকে সে এই হত্যার চেষ্টা সম্পর্কে শুনেছিল। কিন্তু এজন্য যাঁদের ফাঁসি হল তাঁদের একজন যে তার প্রিয়, হাশিখুশি আন্না ইলিনিচ্‌নার ভাই, সে জানত না।

'মহোদয়রা, আপনারা ওঁর পরের ভাইটি, মার্কসবাদী উলিয়ানভের কথা জানেন? আমাদের সঙ্গে তর্কে যদি কেউ নামেন তাহলে তিনিই।'

'কেন?'

'আমরা কাজ করি, উনি স্বপ্ন দেখেন। আমাদের অশিক্ষিত রুশদেশে মার্কসবাদী পার্টি তৈরির আশা কি অলীক স্বপ্ন নয়?'

'আমি ভ্লাদিমির উলিয়ানভের কথা শুনেছি। তাঁর সম্পর্কে আমি কিছু কিছু জানি,' চিন্তিত স্বরে কুস্‌কভা বললেন, 'তিনি ছিলেন এক মারাত্মক তার্কিক।'

'ছিলেন, কেন?'

'এখন তিনি নির্বাসনে। কিন্তু ভ্লাদিমির ইলিচ, আপনার সঙ্গে তর্কবিতর্ক করার সুযোগ পেলে সেটা মজারই হত!'

প্রখোরের মাথায় কী যেন চমকাল: 'ভ্লাদিমির ইলিচ, ভ্লাদিমির ইলিন, 'রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ'। আন্না ইলিনিচ্‌না, ভ্লাদিমির ইলিন...'

'আপনি আমাদের মধ্যে নতুন,' প্রখোরের বিব্রত ভাব দেখে কুস্‌কভা বললেন। 'আপনি রাজনীতি নিয়ে পড়াশোনা করে নিজের পথটি খুঁজে নেবেন। মেহনতিদের জন্যে উন্নত জীবন গড়ে তোলার সত্যিকার লড়াইয়ে আমরা আপনাকে শরিক হতে বলছি। এমন সব রাজনীতিক আছেন যাঁরা...'

'...যাঁরা ভ্লাদিমির উলিয়ানভের মতো, যাঁরা মানুষকে নিজেদের হুজুগ বশে সর্বনাশের পথে টেনে নেন,' বেলোগরুস্কি কুস্‌কভার কথাটা শেষ করল।

'ভ্লাদিমির উলিয়ানভ, ভ্লাদিমির ইলিন, আন্না ইলিনিচ্‌নার ভাই,' প্রখোর ভাবছিল। ''রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ' মোটেই কোন অলীক কল্পনা নয়।' কিন্তু সে একটি কথাও বলল না। লিফার্তের ছাপাখানায় ভ্লাদিমির ইলিনের বইটি ছাপা হওয়ার পুরো ব্যাপারটিই সে চেপে গেল।

'উলিয়ানভ পরিবার রাজনীতির মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছে,' ধোঁয়ার অলস কুণ্ডলী ছাড়তে ছাড়তে কুস্‌কভা বলল। 'বোন এখন শিশুসাহিত্য অনুবাদ করেন, ভাই দূর সাইবেরিয়ায় চুপচাপ বসে আছেন।'

মনে মনে প্রখোর বলল: 'চুপচাপ বসে আছেন? আর বইটা?'

কিন্তু সে মুখে কিছু বলল না। এক ধরনের সহজাত অনুভূতির তাড়নায় সে

আন্না ইলিনিচ্‌নার কথা, বইয়ের কথা চেপে গেল, যদিও পিওতর বেলোগরুস্কি, কুস্‌কভা ও সমবেত সকলে শ্রমিকদের জন্য লড়াইয়ের একটা যুতসই পথ খোঁজা নিয়ে সারা সন্ধ্যা তর্কবিতর্কে মেতে রইল। মাদাম কুস্‌কভাকে তার ভাল লাগল। তার রূপ, তার অটল স্বভাব দেখে সে মুগ্ধ হল।

'আমরা একটা শক্তি বৌকি!' কুস্‌কভা ঘোষণা করলেন। আমরা আমাদের পথেই শ্রমিক শ্রেণীকে চালিয়ে নেব।'

'সাবাস, সাবাস!' ছাত্ররা চেঁচাতে লাগল।

তখন প্রখোর ভাবছিল: 'ভ্লাদিমির ইলিন, ভ্লাদিমির ইলিচ। আন্না ইলিনিচ্‌না। তাঁদের পথ আলাদা। আর আমার?'

সে অবশ্যই পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে, জারের বিরুদ্ধে। সে গরেমিকিনেরও বিরুদ্ধে। ও তো ছাত্রদের উপর সশস্ত্র পুলিশ লেলিয়ে দেয়। তবু কে শুদ্ধ সেটা বলা মোটেই সহজ নয়: কুস্‌কভা না ভ্লাদিমির ইলিন। মনে হচ্ছে মহিলাটি শ্রমিকদের পক্ষে এবং তিনিও...

'আবার আসবেন!' বিদায়ের সময় কুস্‌কভা বললেন। 'আমাদের মধ্যে ঐক্য থাকা দরকার, মহোদয়রা, আরও শ্রমিক নিয়ে আসবেন।'

প্রখোর ও বেলোগরুস্কি যখন কুস্‌কভার বাড়ি ছাড়ল তখন অনেক রাত।

'অবিকল 'যোয়ান অব আর্ক*,' তাই না?' নিচু, আবিষ্ট গলায় বেলোগরুস্কি বলল। 'তোমার মনে হয় না? উনি পাথর জ্বালাতে পারেন, তুষারস্তূপ গলিয়ে দিতে পারেন। তাঁর মধ্যে এতটা আবেগ, এতটা উত্তাপ আছে! সভাটা কেমন লাগল? কাজ করবেন তো?'

প্রখোরের মগজ তখন আবেগ ও পরস্পরবিরোধী চিন্তায় বোঝাই। কুস্‌কভা ও তাঁর অনুগত ছাত্ররা সবাই শিক্ষিত, সুবক্তা এবং মেহনতিদের জন্য তাঁদের উদ্বেগ সত্যই বিস্ময়কর! তাঁদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য সে ঈর্ষিত। এ'দের অনেকের সঙ্গেই পাল্লা দেয়ার ক্ষমতা তার নেই। ওই ছাত্ররা লেখাপড়া জানে। ভালই জানে। তাঁদের কথা শুনে ওঁদের সব প্রস্তাবেই সে রাজি হয়েছে। তাঁদের যুক্তিগুলি এমনই অকাট্য! কিন্তু...

॥ ৩ ॥

আন্না ইলিনিচ্‌নার প্রুফ দেখা শেষ হল। সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তা ছাপাখানায় ফেরত পাঠান হয়েছে। পিটার্সবুর্গে এখন তাঁর আর কোন কাজ নেই।

* যোয়ান অব্ আর্ক (১৪১২-১৪৩১) ফ্রান্সের জাতীয় বীরবালা।

বাড়ির মালিককে দেনাপাওনা মিটিয়ে দিয়ে একটি ছোট সুটকেস নিয়ে তিনি বাইরে এলেন। মুক্ত বাতাসে কী আশ্চর্য স্বস্তি: আজ কতদিন হল কাজের চাপে ওই নিচু ছাদের গুমোট ঘরে তিনি আটকে ছিলেন। বাতাসে বসন্তের তীব্র, উন্মদ গন্ধ। তাঁর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

ট্রেনের জন্য তাঁকে দিনের অর্ধেক আর পুরো সন্ধ্যাটা অপেক্ষা করতে হবে। একবার তাঁকে যেতে হবে লিতেইনি সরণীর বইয়ের দোকানে আলেক্সান্দ্রা মিখাইলভ্না কালমিকভার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু এখন ইচ্ছেমতো তিনি এপথ-ওপথ ঘুরে বেড়াবেন, পিটার্সবুর্গের বহু জায়গা বহু কারণেই তাঁর কাছে বিশেষ অর্থবহ: কতকগুলি সুখের সঙ্গে জড়ান, কোন-কোনটি আছে গভীর দুঃখ ও যন্ত্রণার স্মৃতি। ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপটি তাঁর খুবই প্রিয়। পিটার্সবুর্গে এলে আন্না ইলিনিচ্না হেঁটে কিম্বা ঘোড়া-টানা ট্রামে অন্তত কয়েক মিনিটের জন্য হলেও এখানে একবার আসবেনই। আজও সেই একই ট্রাম চলছে: মড়মড় শব্দ উঠছে, দুলছে, যেন এখনই ভেঙ্গে পড়বে আর সব স্টপে সেই একই কানফাটা শব্দে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। এমন কি ট্রামে জোতা পেটমোটা দুবলা ঘোড়াগুলিও যেন সেই বারো বছর আগের ঘোড়াই রয়ে গেছে। কী দ্রুতই না সময় বদলাচ্ছে! এই তো সেদিন তিনি বেস্তুজেভের তরুণী-প্রশিক্ষণ কোর্সে পড়াশোনা করেছেন, ভাই আলেক্সান্দর যেত বিশ্ববিদ্যালয়ে আর মার্ক এলিজারভও তখন ছাত্র। কত অল্প বয়স তখন তাঁদের। তাঁরা সবাই পড়াশোনা নিয়ে মেতে থাকতেন।

...ইউনিভার্সিতেত্স্কায়া উপকূল-সরণী। বিশ্ববিদ্যালয়ের লালচে-হলুদ দালানের কারুকাজযুক্ত পাঁচিলের ছোট ছোট ব্যালকনিগুলি রাস্তা বরাবর ঝুলে আছে। এখানেই সাশা* পড়ত। কাছেই নিচু, গাদাগাদি করা ব্যারাক। ওখানকার প্যারেড-ময়দানে সারা দিনই সৈন্যদের কুচকাওয়াজ চলছে।

'লেফ্ট, রাইট, লেফ্ট, রাইট, লেফ্ট!' অফিসারের হেঁড়ে গলা শোনা যাচ্ছে।

এই গলা শুনে রক্ত হিম হয়ে এল। নেভা নদীর ওপাড় বরাবর বিশাল শীত প্রাসাদ। প্রাসাদের তুঁতরঙ দেখলেই তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। এই প্রাসাদ পেরিয়েই আলেক্সান্দর মিনার, চূড়ায় এক দেবদূত, হাতে ক্রুশ—মানুষকে আশীর্বাদ করছে কিম্বা তাদের মনে ঈশ্বরভীতি জাগাচ্ছে। প্রাচীর, মিনার, চূড়া। সবই পাথুরে, কঠিন, বিশাল, অনড়।

আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে এলে তাঁর চোখের জল বাধা মানত না। তিনি সাশাকে সাবেগে ভালোবাসতেন। তার প্রতিভা ছিল। সব অধ্যাপকই বলতেন। সবাই তাকে সম্মান করত। অসীম সাহস ছিল তার। আজকাল এখানে এসে ভাইয়ের কথা ভাবলে

---

* আলেক্সান্দরের ডাকনাম।

আন্না ইলিনিচ্না আর কাঁদেন না। এখন তাঁর বেদনার্ত হৃদয় যেন এখানে একটি গম্ভীর ঐকতানধর্মী সঙ্গীতের রেশ শুনতে পায়।

এখানকার একটি বাড়িতেই বেস্তুজেভের তরুণী-প্রশিক্ষণ কোর্সে বারো বছর আগে তিনি পড়াশোনা করতেন। এই তো সেই বাগান। এই বুড়ো লাইম গাছের নিবিড় ছায়ায় মার্ক এলিজারভের সঙ্গে কতবারই তো দেখা হয়েছে। লাজুক মার্ক চাষীসুলভ কঠিন হাতে তাঁর হাত ধরত, তাঁরা বসতেন লাইম-তলার বেঞ্চিতে, কথা বলতেন। তাঁদের দুজনের কাছেই সাশা ছিল সবার সেরা, সম্পূর্ণ দোষমুক্ত আর দুনিয়ায় সবচেয়ে উচ্চমনা মানুষ। তাঁরা তার কথা, তার সঙ্গে নিজেদের বন্ধুত্বের কথা আলোচনা করতেন।

শ্পালের্নায়া সড়ক। শ্পালের্নায়া ও লিতেইনি সরণীর মোড়। দুঃখস্মৃতিময় একটি জায়গা। কোণের ওই বাড়িটি কী বিষণ্ণ নিষ্প্রাণ। এর অন্ধকার জানালাগুলিতে কোন মুখের ছায়া পর্যন্ত নেই। এটিই বন্দীশিবির।

১৮৮৭ সালের ১ মার্চ তাঁকে এখানে আনা হয়। বসন্তের এই দিনটি ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল, রাস্তার উপর বরফ-গলা জলের স্রোত বইছিল। সবকিছু তাঁর স্পষ্ট মনে আছে। সারা দিন তিনি সাশার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সন্ধ্যায়ও সাশা আসে নি। উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি তার ঠিকানায় খোঁজ নেন। ঘরে আলো জ্বলছে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন: নিশ্চয়ই আছে!

কিন্তু সাশা ছিল না। ছিল পুলিশ।

'আন্না উলিয়ানভা? ছাত্রী? আলেক্সান্দর উলিয়ানভের বোন?'

তারপর জেলে গিয়েই শুধু সবকিছু জানতে পারেন। সাশার চিন্তাভাবনার কিছুই তাঁর জানা ছিল না। এখন তার কী হবে? আতঙ্ক তাঁকে আড়ষ্ট করে দেয়। নির্জন সেলে, সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সাশার গ্রেপ্তার হওয়ার আগের দিনগুলির সবকিছু খুঁটিনাটি তিনি বারবার স্মরণ করার চেষ্টা করছিলেন। তখন সে কেমন ছিল? কিছু কী তাঁর চোখে পড়েছিল? আসন্ন বিপদের কোন আভাস? সব সময়ই তো তাঁদের দেখা হত। সাশা তো আগাগোড়া একই রকম ছিল। সন্দেহ হলে নিশ্চয়ই কিছুটা তিনি আঁচ করতে পারতেন। সে যে জারকে হত্যার চেষ্টা করছে অন্তত এর সামান্য কিছু অবশ্যই তাঁর চোখে পড়ত। সে মাঝেমাঝেই কেমন চোখে-পড়ার মতো বিষণ্ণ, অন্তর্মুখী দৃষ্টিতে তাকাত। কিন্তু সেটা তো মুহূর্ত মাত্র। তারপরই ভাবটা কেটে যেত। তবু সেই মুহূর্তগুলিতেও তার মুখে একটি কঠিন, নিস্পৃহ ভাব ফুটে উঠত: যেন বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলেছে, বহুদূরে...

শেষের এই দিনগুলিতে ওর অস্থিরতা ও বেখাপ্পা হাবভাব তাঁর চোখে পড়েছিল: তাঁর ঘরে এসেই আবার হঠাৎ চলে যেত। আন্না ইলিনিচ্না এসবের কিছুই জানতেন না। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় সাশার ফ্ল্যাটে, জারের পবিত্র দেহের উপর হামলাকারী

আলেক্সান্দর উলিয়ানভের বোন হিসেবে। 'মা আমাদের! মমতাময়ী মা! তুমি আমাদের সঙ্গে জেলে দেখা করেছিলে। সাশা আর আমি। তুমি কি জানতে আমি জানতাম না: জানতে কি তার ফাঁসির হুকুম হওয়ার খবর। ওরা তোমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে দিলে সে তোমাকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করেছিল, বলেছিল সে তোমাকে ভালবাসে, ভালবাসে আমাদেরও, কিন্তু দেশের প্রতি তার কর্তব্য... ও সাশা. সোনামণি ভাইটি আমার! ওর ফাঁসি হওয়ার পর মা, তুমি আমার কাছে এলে। তুমি তখন ভেঙ্গে পড়েছ। তবু বল নি যে ও আর নেই। তুমি আমাকে বাঁচাতে চাইলে। মা, প্রিয়, মামণি!'

আত্মসংযমের প্রাণান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে গেল। লিতেইনি দিয়ে দ্রুত হেঁটে গেলেন তিনি।

'কেঁদো না, কাঁদা উচিত নয়, এসব বহুকাল আগের ঘটনা,' তিনি নিজেকে প্রবোধ দিতে লাগলেন। কিন্তু যতকাল আগেরই হোক না কেন, সেই আতঙ্ক কোনকালেই আর পুরনো হবে না।

ধীরে ধীরে সেই উচ্ছ্রিত উদ্বেগ শান্ত হয়ে এল। তিনি ফিরলেন শ্পালের্নায়ায়। এই ভয়ঙ্কর জায়গাটা আরেকবার তাঁকে পার হতে হবে।

সাশার ফাঁসি হওয়ার আট বছর পর তার ভাই ভলোদিয়াকে গ্রেপ্তার করে এখানেই আটক রাখা হয়। খবর শুনে ভয়ঙ্কর উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি ও তাঁর মা পিটার্সবুর্গে ছুটে আসেন। যে-কোন কিছুই ঘটতে পারে। আন্না ইলিনিচনাকেই সকল দায়িত্ব নিতে হয়: ভয়, দুশ্চিন্তার কিছুই মাকে দেখান চলবে না। 'কিন্তু মামণি, তুমি আরেকবার আমাদের আড়াল করে দাঁড়ালে। তুমিই গেলে জেলে ভলোদিয়ার সঙ্গে দেখা করতে। এখানেই ফাঁসির আগে সাশার সঙ্গে তোমার শেষ দেখা। আবার তো এলে এখানেই, ভলোদিয়ার কাছে। তুমি তখন কী আশ্চর্য ধীরস্থির। মুখে হাসি। তুমি হাসছিলে, মা, মা আমাদের! কেবল তোমার চোখের আলোটাই নিষ্প্রভ ছিল, সেখানে ওই হাসির কোন ছায়া পড়ে নি...'

এ কি, সন্ধ্যা হয়ে এল নাকি? রাস্তার বাতি জ্বলছে। তাঁর অজান্তেই দিনটি ফুরিয়ে গেছে। রাতের লিতেইনি সরণীতে এখন সজ্জার সমারোহ। অভিজাত পোশাকে বড়লোকেদের দ্রুত চলাফেরা: তারা চলছে নিজ নিজ সমাজে বা অন্য কোথাও। গাড়ির স্রোত ছুটছে। মননশীল ও ধনী দর্শকরা যাচ্ছে রঙ্গমঞ্চে, কনসার্টে।

ট্রেনে উঠার আগে একবার যেতে হবে কালমিকভার কাছে। আলেক্সান্দ্রা মিখাইলভ্না থাকেন লিতেইনি সরণীতে। ওখানেই তাঁর বইয়ের দোকান। এঁরাই রাশিয়ার প্রত্যন্ত জেলাগুলির গ্রামে গ্রামে পাঠ্যবই পাঠান। দোকানের লাগোয়া স্টোরে কাজ করে কালমিকভার মেয়ে-কর্মচারীরা: পরিচ্ছন্ন ও রূপসী। তাদের যোগানদার ছেলেগুলিও তেমনি ফিটফাট সুশ্রী ও একই ধরনের কোট-পরা। পুরো সংগঠনটাই

ব্যতিক্রমী, আকর্ষণীয় এবং পিটার্সবুর্গের অন্যান্য বইয়ের দোকান থেকে খুবই আলাদা।

ওখানে একটা বেশ বড়সড়ো ফ্ল্যাটে আলেক্সান্দ্রা মিখাইলভ্‌না থাকেন।

দ্রুত চলতে চলতে আন্না ইলিনিচ্‌না ভাবছিলেন: 'দেখব কী কী নতুন বই বেরিয়েছে, শুনব রাজনীতির খবরাখবর। কেউ কি ভাবতে পারে যে এক সিনেটারের বিধবা, অভিজাত এই বৃদ্ধাটি শ্রমিক আন্দোলনের এমন কট্টর সমর্থক, ভলোদিয়ার এত ঘনিষ্ঠ! অদ্ভুত, তাই না? অথচ সত্য।'

কালমিকভার খাবার ঘরটি আন্না ইলিনিচ্‌নার খুবই পছন্দসই: জানালার আর দরজার মোটা পর্দাগুলির জন্য কথাবার্তার শব্দ বাইরে পৌঁছত না, খাবার গোল টেবিল ঘিরে প্রায়ই বসত তরুণ উৎসাহী মার্কসবাদীরা, আলাপ চলত উচ্চস্বরে, আলোচনার ঝড় উঠত। এমনটি চলছিল সেই ১৮৯৫ সালের ৯ ডিসেম্বর অবধি যতক্ষণ না কালমিকভার তরুণ বন্ধুদের প্রায় গোটা দলটি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

আলেক্সান্দ্রা মিখাইলভ্‌না আন্না ইলিনিচ্‌নাকে স্বাগত জানালেন।

তিনি বেশ চটপটে, হালকা, মুখাবয়ব বেয়াড়া ধরনের হলেও বুদ্ধিদীপ্ত, প্রাণবন্ত, সুশ্রী দেখায় তাঁকে। তিনি সব সময় কিছু একটা নিয়েই থাকেন: শ্রমিকদের সান্ধ্য স্কুলে পড়ান, বইয়ের দোকান দেখাশোনা করেন, মার্কসবাদী পার্টির কাজকর্মেও হাত লাগান।

'তোমাকে কী অল্পবয়সীই না লাগছে!' হেসে আন্না ইলিনিচ্‌না বললেন।

'অল্পবয়সী তো বটেই! সবে পাঁচ দশক পার হলাম। পুরো পঞ্চাশটি বছর।'

'বিশ্বাস করি না!'

'আমি নিজেও না।'

পঞ্চাশ বছর বয়সের জন্য তাঁর কোন দুঃখ নেই। বয়স তাঁর উপর কোন ছাপ ফেলে নি। জনগণের জীবন সম্পর্কে উৎসাহী মানুষের আত্মা কখনো বয়স্ক হয় না। কালমিকভা চিরদিনই আশার দীপশিখাটি জ্বালিয়ে রেখেছেন। বৃদ্ধ, তরুণ, বিজ্ঞানী, শ্রমিক, মার্কসবাদী, অ-মার্কসবাদী সহ হরেক রকম লোক—যার মধ্যেই কোন স্ফুলিঙ্গের আভাস আছে তার সঙ্গেই তিনি আছেন। তাঁর বন্ধুদের কোন সীমাসংখ্যা নেই।

ভ্লাদিমির ইলিচের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা অনেক দিনের। তাঁর কাছে খুবই মূল্যবান। কিন্তু এটা কি খুবই পুরনো? দেখাই যাক, কবে ভ্লাদিমির ইলিচ প্রথম পিটার্সবুর্গে এলেন।

উলিয়ানভদের কেউ বাড়ি এলে কালমিকভা তাঁর ভাষায় 'উৎসবে' মেতে ওঠেন। এই পুরো পরিবারটিই তাঁর প্রিয়। ইদানীং অন্যদের তুলনায় আন্না ইলিনিচ্‌নাকেই বেশি কাছে পাচ্ছেন।

'উৎসব শুরু করি, কী বল?' তিনি বললেন।

সামোভার থেকে চা নিয়ে দুই মহিলা গোল টেবিলে বসলেন। তাঁরা কথা বলে চললেন। অবশ্যই দরকারী কিছু নয়। সে তো তোলা আছে: নেভ্স্কি ফটকের পেছনের সান্ধ্য স্কুল, সাময়িকীর প্রবন্ধ, গোপন ঠিকানা, রাজনীতির খবর, বই ছাপানো, সবই পরে আসবে।

'উৎসব' শুরু হল স্মৃতিকথা দিয়ে।

ভ্লাদিমির ইলিচ পিটার্সবুর্গে আসেন ১৮৯৩ সালে। রুশ পুঁজিতন্ত্র তখন বর্ধমান, চোখে আসন্ন প্রস্ফুটনের স্বপ্ন। রোমানভ পরিবার সৈন্য ও পুলিশবাহিনীর ছত্রছায়ায় দেশ শাসন করছে। আমলাতন্ত্র ও অভিজাতদের মর্মর নগরী পিটার্সবুর্গ রাজকীয়, শীতল নেভার তীরে সজ্জিত।

এই নগরেই একদিন এলেন ভোলগা-তীরের শহর থেকে এক তরুণ। বয়স তেইশ। জার হত্যার চেষ্টার অপরাধে এখানেই ফাঁসি হয়েছে অগ্রজের। সাশা! ওকে মারতে পারলেও বংশধারায় অপেক্ষমাণ আরেক রোমানভই রাজা হত। আতঙ্কিত কোন প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজার পক্ষে পূর্বসূরীদের তুলনায় হিংস্রতর হওয়াই তো স্বাভাবিক।

না, মার্কসবাদীদের হাতিয়ার অন্যতর। তারা মার্কসবাদকে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার পক্ষপাতী। তারা শ্রমিকদের হাতে বৈপ্লবিক তত্ত্বের হাতিয়ার তুলে দেবে। এবং তারপর? ভ্লাদিমির ইলিচ পিটার্সবুর্গে আসার দু'বছরেরও কম সময়ের মধ্যে একটি শক্তিশালী মার্কসবাদী শ্রমিক আন্দোলন দেখা দিল।

কালমিকভার তামাটে উদ্দীপ্ত মুখ দেখে আন্না ইলিনিচনা হাসলেন। কাজ শুরুর জন্য পিটার্সবুর্গে আসার পর ভলোদিয়ার জীবনের এই সময়টির প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে।

তারপর ভলোদিয়ার বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীরা।

'গ্লেব ক্রজিজানভস্কির কথা তোমার মনে আছে? নির্বাসনে ও কী করছে জানি না। ভলোদিয়া লেখে যে গ্লেব আগের মতোই আছে। উচ্ছল হাসিখুশি, বুনো কালোজামের মতো ছোট ছোট চোখ, কোঁকড়া চুল... অঢেল পড়াশোনা। পাণ্ডিত্যে সে আর ভলোদিয়া সেরা মার্কসবাদী, প্রথম শ্রেণীর।'

'আর আনাতোলি ভানেয়েভ? তাকে মনে আছে?'

'সেও ভোলগা-তীরের মানুষ, নিজনি নভ্গরদ শহরের। তুমি জান, নিজনি নভ্গরদের লোকজনদের নিয়ে এই পিটার্সবুর্গে পুরো একটি সমিতি গড়া যায়: ভানেয়েভ, সিল্ভিন, নেভজোরভ বোনেরা। শুশেনস্কয়ে থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে ভানেয়েভ অসুস্থ, বেচারী। কেমন কিছুটা যেন স্বপ্নবিলাসী!'

'আর মিখাইল সিল্ভিন—সে অন্য ধাতুতে গড়া।'

'সিল্‌ভিন? কেন? ও, তাই বল, সে অনেক বেশি মাটির কাছাকাছি। তাই বলছ কি?'

'বোধ হয় আরও টেকসই, নির্ভরযোগ্যও।'

'ভলোদিয়ার বিশ্বস্ত বন্ধুর সংখ্যা কিছু কম নয়,' আন্না ইলিনিচ্‌না বললেন।

'ভ্লাদিমির ইলিচের একটি নিজস্ব পথ রয়েছে। সেরা সব বুদ্ধিজীবীরা, প্রতিভাবানরা তাঁকে ঘিরে থাকে। নয় কি?'

'তাই,' আন্না ইলিনিচ্‌না সায় দেন।

আগে এভাবে ব্যাপারটা তিনি ভেবে দেখেন নি। এখন মনে পড়ল কমরেডদের নিয়ে ভলোদিয়ার 'সংগ্রামী লীগ' গঠনের কথা। তিনি আবার মনে মনে বললেন: 'তাই।'

অল্প সময় হাওয়ায় উড়ে চলে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আন্না ইলিনিচ্‌না বুঝলেন ট্রেনের সময় হতে আর দেরি নেই।

এখন কাজের কথাগুলি শেষ করা হবে। প্রথমে শুশেনস্কয়ের বইয়ের ব্যাপার। আন্না ইলিনিচ্‌না বললেন যে ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁকে লিখেছেন: বইয়ের জন্য এতটা দেনা জমে ওঠায় তিনি খুবই লজ্জিত।

'লেনদেনটা বন্ধুদের মধ্যে, তাই এ নিয়ে ভাবনার কিছু নেই,' কালমিকভা বললেন।

তাঁরা সাময়িকীতে ইদানীং প্রকাশিত প্রবন্ধ, লিফার্তের ছাপাখানায় লেনিনের পাণ্ডুলিপির মুদ্রণ, আর শুশেনস্কয়ে থেকে পাঠান তাঁর চিঠিগুলি নিয়ে আলোচনা করলেন।

'ওরা দুজনেই অঢেল কাজ করছে, ভ্লাদিমির ইলিচ আর নাদিয়া*,' বললেন আন্না ইলিনিচ্‌না। 'ভ্লাদিমির ইলিচ তার বইটি শেষ করে এখন একটি প্রবন্ধ লিখছে। তারা দুজনেই জার্মান থেকে অনুবাদও করছে। নববর্ষে গিয়েছিল মিনুসিনস্কে, ক্রঝিজানভস্কিদের ওখানে। জমেছিল ভালই। ভাবতে পার, ভ্লাদিমির ইলিচ এখন পাকা শিকারী? অঢেল পড়াশোনাও করেছে। যত বইই পাঠান না কেন ওদের চাওয়ার শেষ নেই। আর রাজনৈতিক ব্যাপারে তারা যথাসম্ভব তাজা খবর জানতে চায়।'

'এইমাত্র মনে পড়ল, একটা খবর আছে,' কালমিকভা চেঁচিয়ে উঠলেন। 'সফর শেষ করে কুস্‌কভা ফিরে এসেছে।'

'তেমন কোন খবর তো ওটা নয়!' আন্না ইলিনিচ্‌না বললেন।

তিনি কুস্‌কভাকে চিনতেন। যদিও খুব ঘনিষ্ঠ নন, তবু। সুশ্রী, স্মার্ট। বিখ্যাত আইনজীবী প্লেভাকোর টাইপিস্ট ছিলেন। ওঁর কাছ থেকেই বক্তৃতা শিখেছেন।

---

* নাদেজ্‌দা ক্রুপ্‌স্কায়া।

রাজনীতি নিয়ে আলোচনা ছিল সেকালের ফ্যাশন। কুস্কভা সেটা ভালবাসতেন। তাঁর বর্তমান স্বামী প্রকোপভিচকে নিয়ে তিনি সারা ইউরোপে প্রচার চালিয়েছেন... তাঁর প্রচারের বিষয় কী ছিল?

'এক মিনিট, একটা জিনিস দেখাব,' কালমিকভা তাঁকে বললেন। পাশের ঘর থেকে কয়েকটি টাইপ-করা কাগজ নিয়ে তিনি ফিরলেন।

'প্রচারের ব্যাপারটা পড়ে দেখ। একটি ছাত্র আমাকে ওটা দিয়ে গেছে। এই হল কুস্কভার মতামত। সে আর প্রকোপভিচ ওটা লিখেছে। তবে কেবল ওরা দুজনই নয়, একটা দলও আছে, হয়ত বেশ বড়সড়ই।'

আন্না ইলিনিচ্না প্রথম অনুচ্ছেদটার উপর ভাসাভাসা চোখ বুলাতে গিয়ে হঠাৎ ভুরু কুঁচকে মনোযোগের সঙ্গে পড়তে শুরু করলেন।

'এসব কী? অদ্ভুত সব কথা বলছে দেখছি। রাজনীতি মেহনতিদের ব্যাপার নয়? ওরা লড়াইয়ের অনুপযুক্ত? মালিকের সঙ্গে মিটমাট করতে হবে? বটে! তাদের মতাদর্শ! এই প্রচারে মানুষ সরাসরি মার্কসবাদ থেকে দূরে সরে যাবে। খবরটা ভ্লাদিমির ইলিচকে জানাব, কী বল?'

'নিশ্চয়ই, অবশ্যই জানাবে। দেখ, শ্রমিকদের ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে! চোরাবালিতে!'

আন্না ইলিনিচ্না কাগজগুলি ব্যাগে ঢুকিয়ে উঠলেন। তাঁর স্টেশনে যাবার সময় হয়ে গেছে।

'জায়গাটা গোয়েন্দায় বোঝাই। সবাই আমার উপর চোখ রাখছে,' কালমিকভা আন্না ইলিনিচনাকে বললেন। 'ওই তো আমার জানালার নিচের উঠোনেই একজন দাঁড়িয়ে। ফটকের উল্টোদিকে লিতেইনিতে আরেকজন। আর লিতেইনি ও নেভ্স্কির কোণে আরও। হাবভাব দেখেই ওদের চিনতে পারি। আমার কাছে কেউ এসেছে ওরা এরই মধ্যে নিশ্চয়ই জেনে গেছে। কিছু ভাববে না, ওই আহাম্মকদের একটা অন্তত তোমার সঙ্গে স্টেশন অবধি যাবে। বিদায়, প্রিয় আন্না ইলিনিচ্না। উলিয়ানভদের আমার অশেষ শ্রদ্ধা জানাবে।'

আন্না ইলিনিচ্না পথে গোয়েন্দাদের চেনার কোন চেষ্টা করলেন না। ওরাই না হয় তাঁকে স্টেশনে বিদায় জানাবে।

ছাদ থেকে গলা বরফের জল পড়ার টুপটাপ শব্দ শোনা যাচ্ছে। বসন্তের পক্ষে ব্যতিক্রমী এক শীতার্ত সন্ধ্যায় রৌদ্রোজ্জ্বল দিনটি হঠাৎ শেষ হয়ে এল। সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা আসছে। তাড়িত কালো মেঘের দল ধোঁয়ার মতো নীচু হয়ে সারা আকাশ ভরে দিল। নেভ্স্কি সরণী দ্রুত জনশূন্য হয়ে গেল। শীত, কেবল শীত। বিদায় পিটার্সবুর্গ, যতদিন আবার দেখা না হয়!

ট্রেন ছাড়ার পনের মিনিট আগে আন্না ইলিনিচ্না স্টেশনে পৌঁছলেন। শীতে

শরীর জমে গেছে। তিনি ক্লান্ত। মস্কোর বাড়ির কথা মনে এল; শরীর গুটিয়ে শুয়ে থাকা, গাড়ির চাকার ঘুম-পাড়ানি আওয়াজ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়া, তারপর ভোরে জেগে ওঠা। তিনি ট্রেনের দিকে দ্রুত এগোলেন। প্ল্যাটফর্মে সেই চিরন্তন হট্টগোল। সাদা, বড় বড় এপ্রন ও ব্যাজ পরা কুলির দল, বগলে হাতে বোঝাই বাক্সপেটরা। উচ্ছ্বাস ও বিদায়ী অভিনন্দন। হঠাৎ ভিড় থেকে একটি পরিচিত মুখ এগিয়ে এল। কংকালসার একটি ছেলে, পরনে অসম্ভব খাটো কোট, লম্বা, সরু গলা এবং প্রশ্নঘন বিস্ফারিত দুটি চোখ।

'আন্না ইলিনিচ্না!' সারা প্ল্যাটফর্মে তার চিৎকার অনুরণিত হল।

প্রখোর! লিফার্ত ছাপাখানার সেই ছেলেটি।

॥ ৪ ॥

সে প্রাণপণে চেঁচিয়ে ডাকল: 'আন্না ইলিনিচ্না, আন্না ইলিনিচ্না!' কাছে পৌঁছনোর জন্য প্রখোর বেপরোয়া হয়ে ট্রেন বরাবর ভিড় ঠেলে ঠেলে তাঁর দিকে এগুতে লাগল।

কিন্তু গোয়েন্দাটি তাঁর পিছু নিয়ে যদি স্টেশনে এসে এখনো সেখানে থাকে, তাহলে? তাঁকে ওরা কোন কিছুতেই জড়াতে পারবে না। তবু এভাবে তাঁর নাম ধরে চেঁচান কেন? আহাম্মক ছেলেটা! কিজন্য তাঁর দিকে ওদের লেলিয়ে দেয়া? বোকা কোথাকার! নাকি সেও?.. আসলে ছেলেটি তো তাঁর একেবারেই অচেনা...

কুস্কভার বাড়ির বৈঠক থেকে অনেক রাতে ফিরলেও প্রখোর 'স্কুলের বন্ধুরা' না পড়ে পারে নি। সকাল নাগাদ বইটি সে শেষ করতে পারত! রাতটা তার পক্ষে পড়ার জন্য আদর্শ হলেও সে তখন পড়তে পারে না। চারিদিক নিঃশব্দ, দুনিয়ায় একমাত্র সেই জেগে আছে। কারও জীবনের ছবি সামনে ফুটে উঠছে, জীবন্ত মানুষের দল তাকে ঘিরে ধরেছে, সে তাদের জানতে চায়, জানতে চায় তাদের সুখদুঃখ...

কিন্তু রাতে আলো জ্বালা দিদিমার নিষেধ। দশটা বাজতেই তাকে আলো নেভাতে হয়। মা মারা যাওয়ার পর প্রখোর আজ তিন বছর দিদিমার সঙ্গেই আছে। তার বাবা তখনই আবার বিয়ে করেছিল। সৎমা মাত্রেই খারাপ না হলেও এই মহিলাটি লোককাহিনীর সৎমাদের মতোই হিংসুটে। তার বয়স অল্প, ঠোঁটদুটি শক্ত করে আটকান; চাহনিতে উদোম লালসা। সে প্রখোরের দিকে তাকাত না, যেন এমন কেউ নেই, ছিলও না। কিছুদিনের মধ্যেই সাংসারিক ব্যাপারে তার বাবার আর কোন

বক্তব্য রইল না, তার ইচ্ছাশক্তির শেষটুক অবধি উবে গেল। সে প্রখোরের দিদিমাকে পিটার্সবুর্গে লিখল: এখানে মা-হারা অসহায় ছেলেটি নিয়ে সে বড় বিপদে পড়েছে... ইত্যাদি। যথা সময়ে উত্তর এল: 'আমি গরীব মানুষ, তাই বলে নাতিকে তো ভাসিয়ে দিতে পারি না। আসুক সে। কিছু একটা কাজে লাগিয়ে দেব। বুড়ো বয়সে আমাকে দেখবে।'

দিদিমাকে দেখার কিছু ছিল না। শরীরটা তার ভালই। সে ঝি-গিরি আর মেঝে পরিষ্কার করে, কখনো-সখনো কাপড় ধুয়ে সংসার চালাত। রবিবারে গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা পুরো না হওয়া পর্যন্ত সে একঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকত। তাদের বারোয়ারি ভাড়াবাড়ির যাবতীয় খোঁজখবরও রাখত। বুড়ি ছিল নাতির পড়াশোনার ঘোর বিরোধী। প্রখোরের কাছে প্রত্যেকটি বই ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের একেকটি আড়াল।

'বইটা ভাল, আর কেবল শিশুদেরই নয়, আমাদের মতো বড়-হয়ে-ওঠা ওদের বন্ধুদের জন্যও।' সে হালকাভাবে শ্বাস ছেড়ে, মধুর জল্পনায় ঠোঁট চুষতে চুষতে একেবারে ইতালি পেঁছিল: দেখা হল চমৎকার সব নরনারী, শ্রমিক পুরুষ, নিঃস্ব স্ত্রীলোক, নানা বয়সী ছেলেমেয়ে ও এক দুঃখী শিক্ষকের সঙ্গে। সেই জগতে নিমগ্ন প্রখোর আচমকা কঠিন এক হুমকিতে সম্বিত ফিরে পেল:

'বাতি নেভা! অনেক রাত হয়েছে।'

'দিদা, সোনামণি! দোহাই যিশুর, আরেকটু পড়তে দাও!'

সোহাগী কথাবার্তা বলা প্রখোরের স্বভাব নয়, অথচ এবার সে দিদিমাকে 'সোনামণি দিদা' বলছে, 'খ্রীস্টের দোহাই' দিচ্ছে।

বুড়ির মন গলল। বলল: 'পড়বিই? পড় তাহলে।'

বইটি ছিল সব ভাল মানুষের কাহিনী। ভাল মানুষ ছাড়া জীবন দুর্বিষহ -- হোক সেটা ইতালি কিম্বা রাশিয়া।

বইটি সে ধারাবাহিকভাবে পড়ল না। লেখাগুলি একটু অদ্ভুত ধরনের: স্কুলের বন্ধুদের একটি গল্পের মাঝখানে হঠাৎ আসছে বীরব্রতী কোন বালকের কাহিনী।

অনেক আগেই সে সতেরোয় পড়েছে। ছাপাখানায় শিক্ষানবীশিরও কম দিন হল না। সে 'রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ' ছাপিয়েছে। বইটার সারবস্তু মোটামুটি বুঝেছেও। অর্থাৎ মাথায় ঘিলু আছে। তবু বীরব্রতী বালকদের কাহিনীতে তার নেশা ধরে!

এইসব গল্পের একটি লিখেছেন আন্না উলিয়ানভা নিজে। সে প্রথমে পড়ল ওটাই। গল্পটির নাম 'কারুসো'। গন্ধকখনির বাচ্চা মজুরদের এই নামেই সিসিলিতে ডাকা হয়।

গল্পটি পড়ার সময় আন্না ইলিনিচ্‌নাকে সে অনুক্ষণ মনে রাখল। ইতালির এই গরীব ছেলেগুলির জন্য তিনি মনে কী গভীর ব্যথা অনুভব করেছেন, ওদের বন্ধুত্ব কতটা ভালবাসতেন, বেচারি বাচ্চা পাওলোর মৃত্যুতে কী গভীর আঘাত

পেয়েছিলেন, গন্ধকখনির মালিকদের প্রতি তাঁর ঘৃণা ছিল কতটা তীব্র — সবই সে অনুভব করল।

'কারুসো' পড়ে আর কুস্‌কভার চক্রের বৈঠকে গিয়ে তার যে শিক্ষা হয়েছিল সেজন্য আরেকবার আন্না ইলিনিচ্‌নার সঙ্গে দেখা করার কথা প্রখোর ভাবল। পড়ার মতো কোন প্রুফ না থাকলেও সে এমনিই ওখানে যাবে বলে ঠিক করল। অজুহাত ছাড়া কারও সঙ্গে দেখা করার মতো সাহস তার মোটেই ছিল না। কিন্তু সে তখন নাচার, দেখা তাকে করতেই হবে। একদিন সে পরিচিত ঠিকানার উদ্দেশে রওনা দিল। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, কাজে আটকা পড়ে তার খুব বেশি দেরি হয়ে গেল। ওখানে সে পেঁছিল সন্ধ্যায়, ঘণ্টি বাজাল। এবার আন্না ইলিনিচ্‌নার বদলে দরজা খুলল কালো গাউন-পরা এক কাটখোট্টা বুড়ি।

'আন্না ইলিনিচ্‌না আছেন?'

'না, উনি বাসা ছেড়ে দিয়ে আজই চলে গেছেন।'

'ছেড়ে দিয়েছেন? গেলেন কোথায়?'

বৃদ্ধা কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল:

'জানি না বাপু। খুব সম্ভব বাড়ি গেছেন। আজ থেকে ঘরগুলি আবার ভাড়া দেয়া হবে।'

'ও,' প্রখোর বলল। 'আসি তাহলে।'

সে ছুটে রাস্তায় এল। এটাই তার স্বভাব: সব সময়ই কোথাও না কোথাও সে তড়িঘড়ি ছুটছেই। কিন্তু এখন কোথায়? উনি তবে পিটার্সবুর্গের স্থায়ী বাসিন্দা নন। তাহলে রেলস্টেশনেই খুঁজে দেখা যাক। হয়ত এখনো ওঁর ট্রেনের সময় হয় নি। রাতেই তো পিটার্সবুর্গ থেকে ট্রেন ছাড়ে।

প্রখোর নিকোলায়েভস্কি স্টেশনে এল। এখান থেকেই মস্কোর ট্রেন ছাড়ে। কিন্তু মস্কো কেন? না, তার মনে কোনই সন্দেহ ছিল না। ট্রামের পয়সা না থাকায় সে স্টেশনের দিকে ছুটল। আন্না ইলিনিচ্‌নার সঙ্গে অবশ্যই তার দেখা হওয়া চাই! কারণ, অবচেতন সে মনের কথা হঠাৎ বুঝতে পেরেছিল: 'কুস্‌কভার চক্রটি আমার ভাল লাগে নি। কেন? জানি না। কিছু একটা গোলমাল আছে, যা চেয়েছি তেমন কোন কিছুর অভাব। আন্না ইলিনিচ্‌না না গেলে কী চমৎকারই না হত! তাঁর মতো কারও এই চক্রে থাকা দরকার। এখনই তাঁর সঙ্গে যদি দুটি কথা বলতে পারতাম?'

স্টেশনের সেই চিরন্তন দৃশ্য: চকচকে পিতলের ব্যাজ-পরা কুলিরা মালের বোঝা নিয়ে ট্রেনের দিকে ছুটছে, স্টিম-ইঞ্জিন ঝাঁকুনি খেতে খেতে সশব্দে সাদা ধুঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়ছে, বগির সামনে ভিড়, বিদায় দেওয়া-নেওয়া। প্রখোর আন্না ইলিনিচ্‌নাকে দেখতে পেল। সে ভিড় ঠেলে তাঁর দিকে ছুটে চলল। তাঁর মুখে

হঠাৎ কিছু একটা পরিবর্তন প্রখোরের চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার উৎসাহ নিভে গেল, সে আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল।

'আন্না ইলিনিচ্না, আমি আপনার পারিবারিক পদবীটা জানি। বইয়ে পড়েছি। অরেকটা কথা, আমি জানি আপনার ভাইয়ের নাম...'

'আপনি কী চান?' আন্না ইলিনিচ্না হঠাৎ রুক্ষভাবেই ওকে থামালেন।

একটি শীতল কঠিন হাত যেন প্রখোরের হৃৎপিণ্ড চেপে ধরল। এ তো স্নেহলেশহীন এক অদ্ভুত মহিলা। একেবারে আলাদা এক আন্না ইলিনিচ্না। এমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তার দিকে ভ্রূকুটি করলেন, মনে হল নিজেকে তিনি কঠিন বরফের দেয়ালের আড়ালে গুটিয়ে নিলেন, আর একটিও কথা বলবেন না। নিজের সব কথা সে ভুলে গেল। এখানে আসাটাই তার নিরর্থক হয়ে গেল।

'এখান থেকে ট্রেন পদল্স্কে যায়,' সে বলল।

'ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এল,' বলেই তিনি নিঃশব্দে তাঁর বগিতে উঠে গেলেন। বিদায় জানান দূরের কথা, তিনি মাথাটা পর্যন্ত হেলালেন না।

সিটি বাজল। এখনই ট্রেন চলতে শুরু করবে।

'এসবের অর্থ কী?' ভাবতে ভাবতে আন্না ইলিনিচ্না বগিতে উঠে জানালার পাশের সিটে বসলেন। 'ও এখানে এল কেন? আর ভলোদিয়া সম্পর্কে ওই ইঙ্গিতটা... পদল্স্কই বা বলছে কেন? কী চায়?'

তিনি এক কোণে স্থির হয়ে বসলেন। তাঁকে যাতে স্বাভাবিক দেখায় সেজন্য নিজের উপর জোর খাটাতে লাগলেন। রক্তের চাপে কপালের পাশদুটোয় হাতুড়ি-পেটা শুরু হল। 'ও কেন এল? এসবের অর্থ কী?'

ট্রেন চলতে শুরু করল। তিনি জানালার বাইরে তাকালেন। প্রখোর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে: ছোট কাঁধ আর লম্বা সরু গলা ছেলেটার।

'ওর কানগুলো কী বড় বড়, বাচ্চাদের কান,' আন্না ইলিনিচ্না আপনমনে বললেন।

শীত পড়েছিল। দমকা বাতাস বইছে। খাটো ওভারকোটে প্রখোর কাঁপছে। শেষ মুহূর্তে ওর জমে-ওঠা হাতদুটি আন্না ইলিনিচ্নার চোখে পড়ল। খাটো আস্তিনে সে হাতগুলি ঢোকানোর চেষ্টা করছে।

বগিটি ওকে পেরিয়ে গেল। ক্রমে চাকার শব্দ তীব্রতর, দ্রুততর হল। প্রখোর এখন অনেক পেছনে।

'ঈশ্বর জানেন, ওকে কি ভুল বুঝলাম? ওকে এতটা অনাদর দেখানোর কি প্রয়োজন ছিল?'

॥ ৫ ॥

'ও, কত বরফ রে বাবা! কী ঝলমলে উজ্জ্বল, পায়ের দাগটি পর্যন্ত পড়ে নি!' পাশা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। 'দেখ, বনে কোমর পর্যন্ত উঁচু বরফ। ঢিপি হয়ে আছে। এই তো খরগোসের পায়ের দাগ। এপথেই ঝোপের দিকে পালিয়েছে। বাছা কোথায় গেলি? ওই ঝোপের তলায় নেতিয়ে পড়ে হয়ত কাঁপছে। ভয় পাস নে। আমরা তোর গায়ে আঁচড়টুকু দেব না। লাফ দিলে ওকে গুলি করো না কিন্তু। আর এটা কী? এক গাদা বীজ দেখছি গাছের তলায়। কাঠবিড়ালীরা বাদাম চিবুচ্ছিল নিশ্চয়ই। গাছের খোঁড়লে ওরা ভাঁড়ার বানিয়েছে। বুড়ো গাছ এক দঙ্গল কাঠবিড়ালীকে গ্রীষ্মের আগ পর্যন্ত জায়গা দিতে পেরে নিশ্চয়ই খুশি। অন্তত বুড়ো বয়সেও সে কারও কাজে লাগছে। বেহুদা বেঁচে থাকা নিরর্থক, তাই না? মানে, জীবন যদি কারও কোন কাজেই না লাগে। আমাদের বনগুলি কাঠবিড়ালীদের স্বর্গ। এক নাগাড়ে তিন-তিনটি শীত কাটানোর মতো অঢেল বাদাম জমিয়ে রাখতে পারে বলেই তো ওরা এতটা বেপরোয়া। এখানে সারা দিন বসে যতটা খুশি বাদাম তারা ভাঙতে পারে। দেখ, দেখ, সূর্য ডুবছে। ভয় হচ্ছে, শেষে কর্তাঠাকরুণদের বকুনি খেতে হয়। সারা দিন আজ বাইরে কাটল। কাজ করবে কে?'

'কেউ সারাক্ষণ কাজ করতে পারে না,' লেওপোল্ড বলল।

'অঢেল কাজ। তবে চালিয়ে যাচ্ছি। এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্না আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর এই তো, বাইরে এসে সারাটা দিন বনেই কাটল। আমি তোমার শিকার করা দেখতে চেয়েছিলাম। অথচ তুমি একটিও গুলি করলে না। হয়ত বন্দুক ছোঁড়াই জান না। নেহাত দেখানোর জন্যেই ওটা এনেছ!'

'দেখানোর জন্যে, তুমি বলছ?' লেওপোল্ড কাঁধ থেকে বন্দুক নামিয়ে বলল। 'ওখানে ওই পাইনের চারাটা দেখছ? ওর মাথাটা এখনই মুড়িয়ে দিচ্ছি।'

ধুম্। পাইনের ডালপালা নড়ে উঠল। ছড়িয়ে পড়ল গুঁড়ো বরফ। গাছটির মাথাটা উধাও। লেওপোল্ড বন্দুকটা আবার কাঁধে রাখল। তারা হাঁটতে শুরু করল।

'বাড়িতে বকুনি খেতে না হয়,' পাশা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'তোমার কর্তাঠাকরুণরা কি কখনো তোমাকে বকাঝকা করেছেন?' লেওপোল্ড জিজ্ঞেস করল। 'কর্তারা সচরাচর যেমন হয়ে থাকে ওঁরা সেরকম নন। ওরা চাকর-বাকরদের হুমকি দেয়, তাদের ওপর কড়া নজর রাখে। কিন্তু তোমার ওঁরা?'

'আমার কর্তারা একেবারে দুনিয়া ছাড়া। প্রথম দিনই আমাকে কাজে না লাগিয়ে লেখাপড়া শেখাতে বসান। এমনটি আর কোথাও দেখি নি।'

'আমার রোজকার আসা নিয়ে আকারে-ইঙ্গিতে ওঁদের বিরক্তির কোন আভাস পেয়েছ কখনো?' লেওপোল্ড জিজ্ঞেস করল।

'না, না কী যে বল! কী সব কথা। তাঁরা তোমাকে দারুণ ভালবাসেন। সুযোগটা হারাবে না। আসতে থাক। সারা জীবন টিকে থাকার মতো মালমশলা তোমার মাথায় ঢুকবে।'

'এছাড়াও ওখানে আসার আমার আরেকটা কারণ আছে,' লেওপোল্ড বলল। হঠাৎ রক্তের তোড়ে তার মুখটা লাল হয়ে উঠল। পাশার মুখেও লালের আঁচ। সে ফিরে দাঁড়িয়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল:

'দেখ, সূর্যটাকে বেগুনি দেখাচ্ছে! মানে ঝড় উঠবে। কাল ইয়েনিসেই-এর দিক থেকে ঝড় শুরু হবে। জলদি বাড়ি চল। এখনই সবাই রাতের খাবার চাইবেন। ওঁরা সারা দিন কেবল বইই লেখেন আর এজন্যেই কেবল খিদে পায়।'

'পাশা,' লেওপোল্ড বলল।

'বল,' সে আস্তে জবাব দিল।

তারা মাঝপথে দাঁড়াল। কারও মুখে কথা নেই। পাশার হৃৎপিণ্ডে আনন্দের শব্দিত স্পন্দন।

'জান, আমার মা কী বলে তোমাকে ডাকে? বড়ছেলের রূপসী তরুণী প্রিয়তমা,' লেওপোল্ড বলল।

'কী যে বল! খেপাচ্ছ? তোমার মার ঠাট্টা আর কি! এর পুরোটাই তোমার বানানো!'

বিব্রত পাশা তার মোটাসোটা বিনুনিটা টানতে টানতে এগিয়ে গেল। আশা করল, লেওপোল্ড আরও কিছু বলবে। রূপসী তরুণী বলে ডাকবে।

'কিছুই আমি বানাই নি,' ওর পাশে হাঁটতে হাঁটতে লেওপোল্ড বলল। 'সত্যিই মা তোমাকে রূপসী তরুণী বলেন। খারাপ কিছু?'

'না, খারাপ নয়। কেবল কথাগুলিই যা আমাকে মানায় না। তুমি বই পড়, আর আমি!'

'তুমি কী? তোমাকেও পড়তে শেখান হয়েছে। ব্যস, এগিয়ে যাও, পড়তে শুরু কর।'

'হল। আমি না হয় বই পড়লাম। তারপর? তারপর কী হবে আমার?'

সে তার মুখোমুখি দাঁড়াল: নীল চোখে স্পষ্ট রাগের আভাস, মাথায় ফুল-তোলা ওড়না, সামনে ঝুলছে হালকা সোনালি রঙের মোটাসোটা বিনুনি।

'তারপর কী হবে আমার?' সে জানতে চাইল। 'আজ, কাল, এক সময় তোমাদের মেয়াদ তো শেষ হবেই। কীজন্যে তাহলে আমি এখানে বসে থাকব?'

'তুমি জান না? জান না যে ও আসবেই?'

তারা এগিয়ে চলল। বন এবার হালকা হয়ে আসছে। গাছপালার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে শুশেনস্কয়ে। নির্জন, বরফ-ঢাকা এই বনে অন্য কেউ না থাকলেও কথাগুলি লেওপোল্ড খুব নিচু স্বরেই বলল।

'তুমি 'তাঁকে' বিশ্বাস কর না?' আরও নিচু গলায় সে জিজ্ঞেস করল।

'তিনি আমাকে কিছুই বলেন নি। কখনই না।'

'আমি বলছি। কাউকে বলবে না তো?'

'শপথ করছি।'

'শপথের দরকার নেই। ঈশ্বর-টিশ্বর যে নেই এটা তো জানই। ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক সবই কল্পনা!'

'হয়েছে, হয়েছে। কিন্তু আমাকে কী বলছিলে?'

'তোমাকে নিশ্চিত বলছি ওটা ঘটবেই। হয়ত খুব বেশি দেরিও নেই। জারকে হটিয়ে দেয়া হবে। পুলিশ, বেনিয়া, পাদ্রি-পুরোহিত সবাইকেই আমরা বিদায় করব।'

'আমাদের পাদ্রিকেও?'

'সেও তো অন্যদের মতোই। তোমাদের শুশেনস্কয়ের টাকার কুমিরগুলোকেও তাড়াব। কিসের অপেক্ষায় থাকা? থাকা নতুন জীবনের। সবকিছু নতুন হবে। পড়তে চাইলে তুমি ক্রাসনোয়ার্স্ক, এমন কি পিটার্সবুর্গেও যেতে পারবে, অথবা যেখানে খুশি।'

'তারা আমাকে ভর্তি করবে? গাঁয়ের একটি মেয়েকে?'

'তখন সবাই সমান হবে। সেদিন গাঁ আর শহরের লোকজনদের মধ্যে, বড়লোক ও চাষীর মধ্যে, রুশী ও পোলদের মধ্যে কোনই তফাত থাকবে না...'

সে চুপ করল। আচমকাই। মুখে বেদনার ছায়া পড়ল। ভুরু কুঁচকে গেল। চোখেমুখে একটা অনমনীয় ভাব ফুটে উঠল।

অনেকদিন থেকে জাঁ প্রমিনস্কি শুশেনস্কয়েতে সপরিবারে নির্বাসনে আছে। অথচ লেওপোল্ড তার শহুরে দেমাকী ভাবটা আজও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তার চামড়াটা এতই সাদা যে গ্রীষ্মেও কোন রঙবদল ঘটে না, এমনি সাদাই থেকে যায়। গাঁয়ের মেয়েরা তাকে ঈর্ষা করে, ফসল তোলার সময় রোদকে তাদের প্রতি সদয় হতে বলে। সে যথেষ্ট লম্বা, ছিপছিপে। কিন্তু, বলতে কী কিছুটা অদ্ভুত ধরনের।

'লেওপোল্ড, তুমি তোমার পোল্যান্ডকে নিয়ে এত কষ্ট পাও কেন? আমাদের দেশের ওই মধুর নাম আমাদের লোকজনরা কখনই ব্যবহার করবে না, তারা হাসাহাসি করবে...'

'কারণ, তুমি, তারা... কারণ তোমরা নির্বাসনে নেই। আমিও যখন লদ্জে আমার বাড়িতে ছিলাম...'

লেওপোল্ডের মতে লদ্জের মতো শহর আর দুনিয়ায় দুটি নেই। পাশা মাঝেমাঝে ভাবে সে পোল্যান্ডের গল্প শোনে বলেই লেওপোল্ড তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। সে তার 'রূপসী তরুণী প্রিয়তমা' বলে নয়, হয়ত বা কেবল পোল্যান্ডে ফেরার জন্য উতলা বলেই।

'আমাদের পোল্যান্ড। পোল্যান্ড আমাদের আর নেই!' লেওপোল্ড চেঁচিয়ে উঠে রাগে বুটের আগা দিয়ে লাথি মেরে কিছুটা বরফ ছিটোয়।

লেওপোল্ড রাগলে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে, ভুরুগুলি নাকের গোড়ায় এসে মিশে যায়। পাশার তখন ভয় হয় আবার দুঃখও হয়।

'ও, ঠিক আছে, লেওপোল্ড।'

'কী ঠিক আছে? পোল্যান্ড আমাদের নেই! আমরা টুকরো টুকরো হয়ে গেছি। জার্মানরা আর রুশ জার... এর মানে যদি বুঝতে... তুমি যে রুশী সেটা তোমাকে ভুলে যেতে বলা হলে? আমি পোল সেটা ভুলতে চাই না!'

'এসব থাক, লেওপোল্ড।'

'আমরা একদিন স্বাধীনতা ফিরে পাবই। লদ্জের ধর্মঘটের সময় আমার বাপ তাদের দেখিয়ে দেন। মিছেই ওরা তাঁকে সাইবেরিয়া পাঠায় নি। বাবা আমার বিপ্লবী।'

বলেই লেওপোল্ড ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা উঁচু করল। কী অহঙ্কারেই না সে মাথা উঁচু করে। রাজকীয় অহঙ্কারে। হোক পরনে ছাগলের চামড়ার শতচ্ছিন্ন কোট আর পায়ে জীর্ণ বুটজুতো। তার গায়ে পোশাকের দারিদ্র্য চোখে পড়ে না। ছেঁড়া কাপড়েও তাকে রাজার মতোই দেখায়।

'আমার বাবা বিপ্লবী,' সে আবার বলল। 'ভ্লাদিমির ইলিচ বাবাকে শ্রদ্ধা করেন।'

'ভ্লাদিমির ইলিচ সজ্জন মাত্রকেই শ্রদ্ধা করেন।'

'বাবাকে সজ্জন বলাটাই যথেষ্ট নয়। তিনি বিপ্লবী, মার্কসবাদী।'

পাশা কোন মন্তব্য করে না। সে মার্কসবাদ বোঝে না।

ইতিমধ্যে গাছপালার আড়ালে সূর্য ডুবে গেছে। ফেব্রুয়ারির সূর্য। শুশেনস্কয়ের বনে এই বেড়ানোর ঘটনাটা ঘটেছিল ইতিপূর্বে বর্ণিত পিটার্সবুর্গের কাহিনীর একমাস আগে।

বন থেকে তারা বেরিয়ে এল। দূরে তুষার-ঢাকা গম্ভীর পর্বতমালা। বিপুল, চিরন্তন। আকাশে হেলান দেয়া পাহাড়ের শিরদাঁড়ার ঢেউ। ওখানে এখনো অস্পষ্ট আলোর আভা। কিন্তু নীল ছায়া নামছে পাহাড়ের গা বেয়ে, ঘন হয়ে মিশে যাচ্ছে পাহাড়তলার ঘন অন্ধকারে। সায়ান পর্বতমালা। দৃশ্যে সমাহিত গাম্ভীর্য। নিথর নৈঃশব্দ সর্বত্র তার বিশাল কায়া বিস্তার করছে।

কুয়াশার আঁচ-লাগা সূর্যের লাল গোলকটি পশ্চিম আকাশে ডুবছে। দিগন্তে বিস্তৃত গোলাপী রঙ। অস্তমান সূর্য চোখের আড়াল হল। তুষার উজ্জ্বলতা হারিয়ে ধীরে ধীরে নীল হয়ে উঠল। ঘুম-কাতুরে, বিরক্ত সায়ান পর্বতমালা বেগুনি আঁধারে ডুবে যাচ্ছে। সূর্য অস্তমিত। গোলাপী আভা নিমেষে মিলাল। এবার অন্ধকার।

'লেওপোল্ড, কিছু একটা আবৃত্তি কর,' পাশা বলল।

ওর মন সরিয়ে নেওয়ার কৌশলটি সে জানে। এভাবে হঠাৎ বিষণ্নতায় ডুবে গেলে আদাম মিস্‌কেভিচের* কবিতাই কেবল তাকে উদ্ধার করতে পারত।

লেওপোল্ডের মুখে এই কবির কবিতা শুনতে পাশা ভালবাসে। সুন্দর আর অদ্ভুত বিষণ্ন।

'লেওপোল্ড, তোমার বাবার মেয়াদ শেষ হলেই তোমরা দেশে ফিরবে. শুশেনস্কয়ে একেবারেই ভুলে যাবে।'

'ভাইবোনদের জন্যে গরম কোট তৈরির চেষ্টায় বাবা এই দুই শীতেই খরগোস শিকার করে বেড়াচ্ছেন। এখানে আমরা ক'জন, তুমি জান। সব মিলিয়ে ছয়। এত দূরের পথের জন্যে প্রস্তুত হওয়া, কাপড়-চোপড় জোগাড় করা চাট্টিখানি কথা নয়।'

'তোমরা সবাই চলে যাবে, শুশেনস্কয়েকে ভুলে যাবে,' পাশা আবার বলল।

'আমি ভুলব না।'

'এতটা জোর দিয়ে বল না। তুমি ভুলবে। ইশ্, দেরি হয়ে যাচ্ছে। কর্ত্রীরা খোঁজ করবেন।'

সে জোরে ছুটতে লাগল। তার নতুন ফেল্টের বুটের চাপে বরফ গুঁড়িয়ে যাওয়ার শব্দ। এমন ভাল জুতা আর কোনদিন সে পরে নি, ওটা তার নিজের রোজগারে কেনা। এই নির্বাসিতরা সত্যিই অসাধারণ মানুষ। বেচারী পাশার সৌভাগ্য যে সে ওখানে কাজ পেয়েছে। আত্মীয়-স্বজনরা গরীব না হলে পাশার মা কখনই ওকে উলিয়ানভ পরিবারে কাজ করতে পাঠাত না। আর পাশাও জানতে পারত না ভ্লাদিমির ইলিচ, নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না ও এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্‌নাকে। এবং হয়ত দেখাও হত না লেওপোল্ডের সঙ্গে।

লেওপোল্ডদের পরিবারের নিজস্ব কোন জমিজমা ঘোড়া, বাড়িঘর নেই। সে তাই গাঁয়ের লোকজনদের সঙ্গে খড় তোলা বা মাড়াইয়ে শরিক হয় না। তাহলে কোথায় তার সঙ্গে দেখা হত পাশার? তাছাড়া সে নির্বাসিত রাজনৈতিক কর্মীর সন্তান। স্থানীয় লোকরা নির্বাসিতদের এড়িয়ে চলে। এরা বাইরের, এখানকার কেউ নয়।

॥ ৬ ॥

দেখলে মনে হয় গ্রামটি কাছেই। পেছনের মাঠগুলিতে নিরেট অন্ধকার। শুশেনস্কয়ের বসতির আলো দেখা যাচ্ছে: লোকজন বাতি জেবলেছে। কুয়ো থেকে জল তোলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। গোরুর জন্য জল আনছে কারা।

হঠাৎ অনেক দূর থেকে স্লেজের ঘণ্টির উচ্ছল ঝুনঝুন আওয়াজ ভেসে এল।

---

* আদাম মিস্‌কেভিচ (১৭৯৮-১৮৫৫) পোল কবি। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকর্মী।

এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজটা ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠল আর গাঁয়ের বড় রাস্তার মোড়ে বরফে সাদা একজোড়া ঘোড়া সহ একটি ছইয়ালা স্লেজ পাশা ও লেওপোল্ডের চোখে পড়ল।

'দাঁড়াও!' একটি ঘোড়া হঠাৎ লেওপোল্ডের ঘাড়ে মাথা রেখে তার কানে গরম শ্বাস ফেলতে লাগল।

'হেই, শিকারী!' গাড়োয়ান ঘোড়ার লাগাম টেনে হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল। 'ওই বাড়িটা কোন দিকে, কী নাম যেন?..'

'ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ, নির্বাসনে আছেন,' যাত্রীই কথাটা শেষ করল।

যাত্রী ছই থেকে মুখ বের করল। মাথায় ভেড়ার লোমের টুপি। লেওপোল্ড দেখল: শেয়ালের লেজের উল্টান কলার আঁটা এক তরুণ, চওড়া মুখ, গোঁফ দাড়ি বরফে সাদা।

'কথা বলছ না কেন? কোন্ পাশে উলিয়ানভদের বাড়ি?'

লেওপোল্ড কাঁধে আঁটা বন্দুকের বেল্টটা নিঃশব্দে ঠিক করল।

'অদ্ভুত ছেলে তো! চুপ করেই থাকবে নাকি! চলা যাক তাহলে। আরও কাউকে জিজ্ঞেস করব 'খন!' ধৈর্য হারিয়ে যাত্রীটি বলল।

'সোজা যান, একেবারে গাঁয়ের শেষ মাথায়,' বলতে বলতে লেওপোল্ড যেন ঝাঁকি খেল।

গাড়োয়ান জোরে লাগাম টানল। ঘোড়াগুলি ছুটল।

'ঈশ্বর, ওদের ওখানে পাঠালে কেন?'

'এছাড়া উপায়ই বা কী ছিল? চল, দৌড়ই!'

তারা ছুটতে লাগল।

'জোরে, পাশা, জোরে!'

শুশেনস্কয়ে গ্রামটি খুবই বড়, এলাকার কেন্দ্র। বড় রাস্তাটি প্রায় মাইল খানেক লম্বা। পাশেই, চোখে পড়ার মতো জায়গায় ইটের তৈরি একটি সাদাসিধে গড়নের গির্জা। তারপর শুঁড়িখানা। ওখানেই মাতালরা ভিড় জমায়, হল্লা করে। আরও দূরে দোকানপাট ও সরাইখানা। সরাইয়ের লাগোয়া উঠোনে ঘোড়ার আস্তাবল থেকে শোনা যায় চিঁ-হিঁ-হিঁ আর ভেসে আসে তাজা নাদের গন্ধ। বড় রাস্তা বরাবর কুলাকদের বাড়ি, শক্ত কাঠের গুঁড়িতে তৈরি, দু'শ বছরেও চিড় ধরার নয়। বেড়াগুলিও উঁচু, ফটকে তালা। এই ধরনের বাড়ির পাশেই আছে একটি ছোট কুঁড়েঘর, কুঁজো অরা বেটপ। এই ধরনের ভাঙ্গাচোরা বাড়িগুলি বড় রাস্তা থেকে দূরে, অলিগলিতেই দেখা যায়। বসন্ত ও শরতের বৃষ্টিশেষে রাস্তাটি কাদার কুণ্ডে চলাচলের অযোগ্য হয়ে ওঠে।

একটি ছিমছাম ছোট রাস্তা সরাসরি শুশা নদী পর্যন্ত গেছে। এই নদীপাড়ের একটি বাড়ির দিকেই লেওপোল্ড ও পাশা ছুটছিল। ছইয়ালা স্লেজটি তখন আড়াল হয়ে গেছে।

'ঈশ্বর, কী যে হচ্ছে ওখানে!' বলতে বলতে লেওপোল্ডের কাছ থেকে লুকিয়ে ক্রুশ কাটতে লাগল পাশা।

লেওপোল্ডের দুশ্চিন্তা পাশাকেও আবিষ্ট করেছিল: কোন তল্লাসী? স্লেজের লোকটির কথায় কী এমন কোন ইঙ্গিত ছিল? স্লেজটা গেলই বা কোথায়? গাঁয়ের অন্য কিনারে এখনো খুঁজে বেড়াচ্ছে? যে-কোন মুহূর্তেই ওটি এখানে পৌঁছবে। লোকগুলি ক্ষেপে উঠবে ভুল পথ দেখিয়ে তাদের হয়রানি করা হয়েছে বলে। উলিয়ানভদের এখনই হুঁশিয়ার করা দরকার।

ঘেরাও-দেয়া বারান্দায় উঠে রান্নাঘর থেকে আসা একটানা আওয়াজ শুনে লেওপোল্ড ও পাশা থমকে দাঁড়াল।

'ঈশ্বর, কী জানি হচ্ছে ওখানে!' পাশা বলল। রান্নাঘরে এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্না উনুনের সামনে গুটিসুটি বসে আগুন ধরাবার জন্য কুড়ুল দিয়ে কাঠের টুকরো কাটছিলেন। পাশে তাঁদের পাটকিলে কুকুর জেনি আড়চোখে তাকিয়ে মেঝেতে লেজ আছড়াচ্ছিল।

'হা ঈশ্বর, এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্না!' পাশা তাঁর কাছে ছুটে গেল। 'সারা শীতের মতো অঢেল কাঠ উনুনের পেছনটায় জমিয়ে রেখেছি। এক মিনিটও লাগবে না। ওটা আমাকেই করতে দিন। এখনই সামোভার গরম করছি। কেউ এসেছে, নাকি?'

'পিটার্সবুর্গের এক বন্ধু। মিখাইল আলেক্‌সান্দ্রভিচ সিল্‌ভিন। ইয়ের্‌মাকভ্‌স্ক-য়েতে তাঁকে নির্বাসন দেয়া হয়েছে। পথে আমাদের দেখে যাচ্ছেন,' দাঁড়াতে গিয়ে এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্না বললেন।

'জানেন, গাঁয়ের পথে স্লেজের সামনে পড়েছিলাম। ওটা পুলিশের ভেবে আমি আর লেওপোল্ড ওদের ভুল পথ দেখিয়ে দিয়েছিলাম। এখন দেখছি ওরা আপনাদের বন্ধু। নিশ্চয়ই, ভ্লাদিমির ইলিচ আর নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না খুব খুশি?'

'খুবই খুশি হয়েছেন তাঁরা! পাশা, মামণি, ভাঁড়ার থেকে কিছু ভাপা-সিঙাড়া আনো তো। অতিথিদের খাঁটি সাইবেরীয় খাবার দেব ভাবছি।'

পাশা তখনই কাজে লেগে গেল। শিগগিরই সামোভারে জল ফোটার আওয়াজ শোনা গেল। বরফে জমে-ওঠা নুড়ির মতো ঠনঠনে সিঙাড়াগুলি সিদ্ধ করার জন্য রাখলেন তিনি। নতুন চাদরে টেবিল ঢেকে খাবারের আয়োজন শেষ করা হল।

'এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্না, মনে হচ্ছে সব তৈরি,' পাশা বলল। 'ওঁদের এবার ডাকুন।'

'এখনই? তুমি খুব চটপটে মেয়ে বাছা! আমি ডাকছি।'

পাশা শুনতে পেল রান্নাঘরের লাগোয়া ভ্লাদিমির ইলিচের পড়ার ঘরে চেয়ার ঠেলার শব্দ। তাঁরা দুজন এখনই খাবার ঘরের দিকে রওয়ানা দেবেন। ঠিক সময় সে

সিঙাড়ার পাত্র নিয়ে ঘরে ঢুকল। জিভে জল আসার মতো ধোঁয়া উঠছে পাত্রটি থেকে। এই বিশেষ মুহূর্তটির গাম্ভীর্যে পাশার মুখে রঙের আঁচ লাগল।

'রাতের খাবার তৈরি, মিখাইল আলেক্সান্দ্রভিচ!' অতিথিকে আমন্ত্রণ জানালেন ভ্লাদিমির ইলিচ।

'আপনি এখানে অবাক করে দেয়ার মতো কাজ করছেন ভ্লাদিমির ইলিচ!' সিল্ভিন বললেন। 'নির্বাসনে, তাছাড়া এই দূরে সাইবেরিয়ায় এমন গভীর পড়াশোনার ব্যবস্থা! আর বাড়ির পুরো আবহাওয়াটাই এমন সৃষ্টিশীল। অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য বটে!'

অতিথি অবিরাম কথাই বলছেন। তিনি অঙ্গভঙ্গি করছেন, হাত নাড়ছেন, কাঁধ ঝাঁকাচ্ছেন।

'আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, ভ্লাদিমির ইলিচ...'

টেবিলের দিকে যাবার পথ আড়াল করে চৌকাটের সামনে দাঁড়িয়ে সিল্ভিন কথা বলছিলেন। মাঝে মাঝে পলক ফেলে ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁর কথা শুনছিলেন। বলাই বাহুল্য, অতিথিটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। হঠাৎ তিনি দেখছেন সিঙাড়ার পাত্র থেকে ধোঁয়া উঠছে। ভাপা-সিঙাড়া ঠান্ডা হয়ে গেলে বেচারী পাশা যে দারুণ দুঃখ পাবে এটা সহজেই আঁচ করলেন ভ্লাদিমির ইলিচ।

'এ হল পাশা মেজিনা,' তিনি পাশার দিকে মাথা হেলিয়ে মুচকি হেসে অতিথিকে বললেন। 'ও আমাদের সহকারী। আমার আর নাদিয়ার সময়মতো কাজ শেষ করাটা ওর ওপরই নির্ভর করে।'

তাঁর কথায় পাশা বিব্রত হল, নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্না লাল হয়ে ওঠায় তাঁকে চমৎকার দেখাল। পাশা এই তরুণী কর্ত্রীকে কী শ্রদ্ধাই না করে!

'ভলোদিয়া, তুমি বই লিখছ। কিন্তু আমি তো এর শরিক নই। বড়জোর নকলনবিস,' বললেন নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্না। লজ্জা পেয়ে তিনি নিজের প্রসঙ্গটি অন্যত্র সরানোর জন্য হঠাৎ হাততালি দিয়ে উঁচু গলায় বলে উঠলেন: 'বন্ধুগণ, বসে পড়ুন! পাশা সিঙাড়ার পাত্র এনেছে, আমাদের ভাল মেয়ে পাশা!'

শেষ পর্যন্ত সবাই বসলেন। তাঁরা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সিঙাড়ার সদ্ব্যবহার শুরু করলেন এবং শোনা গেল পাশার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। পাশাকে টেবিলে বসতে বলা হলেও তাকে ততটা জোর করা হয় নি। একটি গ্রাসও তো সে গিলতে পারত না। তোলপাড় চলছে তার ভেতর। তাছাড়া রান্নাঘরে যাওয়া-আসা, কড়াই থেকে তৈরি সিঙাড়া তুলে আনা। লেওপোল্ডও প্রথমে রাজি হয় নি। কিন্তু কর্ত্রীরা তার 'না' শুনতে চান নি।

'এই কমরেড সমাজতন্ত্রে উৎসাহী,' ভ্লাদিমির ইলিচ তাকে সিল্ভিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। 'আর এরই মধ্যে অনেকটা এগিয়েও গেছেন।'

মুখের সিঙাড়া লেওপোল্ডের গলায় আটকে যাচ্ছিল। সে কথা শুনতে,

উলিয়ানভদের জীবনযাত্রা দেখতে ভালবাসত। কিন্তু তার দিকে নজর দিলে লজ্জামিশ্রিত এক ধরনের উদ্বেগ তাকে পীড়িত করত। এমন লাজুক অহঙ্কারী লোক আর দুটি হয় না।

যুতসই শব্দ খুঁজে না পেয়ে সে চুপ করে থাকল। ইতস্তত করার সময় সিল্‌ভিন তার দিকে ভালভাবে তাকিয়ে হঠাৎ চিনতে পারলেন। লেওপোল্ড ও পাশা দুজনকেই।

'আরে, আপনাদের দুজনের সঙ্গেই তো পথে দেখা হল, তাই না? আপনার কাঁধেই বন্দুক ছিল। নিশ্চয়ই আপনি। আপনিই গাড়োয়ানকে ভুল পথ দেখালেন। কেন বলুন তো?'

কয়েক মুহূর্ত লেওপোল্ডের মুখে কথা যোগাল না। শেষে বিড়বিড় করে বলল:

'মানে, মানে... এই তামাশা করেছিলাম।'

পাশা যেন শ্বাসকষ্ট থেকে মুক্তি পেল। সে এতটা চতুর? পাশা হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরেছিল। ভ্লাদিমির ইলিচ কাঁটা রেখে ওর দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর লেওপোল্ডের দিকেও। শেষে পাশার দিকে আরেকবার। তিনি একটিও কথা বললেন না। মুহূর্তের জন্য তাঁর মুখে মায়াভরা, মনোযোগী একটি অনুভব চকিত হল। .

পাশার তা নজরে এড়ালো না। সে ভাবল: 'কিছুই ওর পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না। সকলের ভেতরটাই উনি দেখতে পান। জাদুকর যেন।'

'চমৎকার তামাশা বটে,' সিল্‌ভিন বললেন। তিনি ভ্লাদিমির ইলিচের সঙ্গে আলাপ চালানোর জন্য অধীর হয়ে উঠেছিলেন। মনের মধ্যে যে সমস্ত প্রশ্ন উঠছিল সেগুলির জবাব তিনি শুনতে চান। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কী? এখন কী করা উচিত? যা হোক, চিরদিন তো আর নির্বাসনে কাটাবেন না। তারপর কী? তখন তাঁরা কী করবেন?

পাশা খালি থালাগুলি নিয়ে রান্নাঘরে গেল। সে সামোভার আনল। সাজাল চায়ের সরঞ্জাম। আলাপের টুকিটাকি তার কানে আসছিল। লেওপোল্ড দুজনের প্রত্যেকটি কথাই তখন গিলছে। গৃহকর্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভোজ শেষেই তার চলে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে ঠায় বসে রইল। আলাপে উত্তেজনা সঞ্চারিত হচ্ছিল। ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন:

'এখানে, এই মুহূর্তে বাইরের দিক থেকে আমরা যখন নিষ্ক্রিয় তখন আমাদের উচিত প্রতিটি পদক্ষেপের, প্রতিটি কাজের সঠিক গতিপথ স্থির করে নেওয়া। তারপর সময় এলে নিশ্চিন্তে আমরা সেই পথ ধরেই চলব। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলি ঠিক করে রাখা দরকার। দীর্ঘমেয়াদী!'

'পার্টি' শব্দটি তিনি উচ্চারণ করেন নি। তিনি কিন্তু পার্টির কথাই বলছিলেন। তাঁর মনের কথাটি উপস্থিত সবাই ঠিকই বুঝলেন। পার্টি ভেঙ্গে গেছে। পার্টির ভিত

টলে গেছে। ফলত, আবার নতুন করে গড়তে হবে। সারা সন্ধ্যা লেনিন এ-সম্পর্কেই বললেন।

ভ্লাদিমির ইলিচের মুখ থেকে মুহূর্তও চোখ না সরিয়ে লেওপোল্ড তাঁর কথাগুলি শুনছিল। 'টেবিল ছেড়ে এখনই তিনি উঠবেন, শুরু হবে পায়চারি,' লেওপোল্ড মনে মনে ভাবল। আর ভ্লাদিমির ইলিচও ঠিক তাই করলেন। তাঁর অভ্যাসগুলি লেওপোল্ড জানত। সে গোগ্রাসে তাঁর কথাগুলি গিলত। মনে হত ভ্লাদিমির ইলিচ যেন তার সঙ্গে কথা বলছেন, কেবল তার সঙ্গেই, যাতে সে, লেওপোল্ড তাঁকে বুঝতে, তাঁর ভাগ্যের, তাঁর লক্ষ্যের শরিক হতে পারে, যেন সে জেল ও পুলিশ না ডরায়, ভয়কে জানতে যেন ভয় না পায়, যেন বিপ্লবে বিশ্বাস অটুট রাখতে পারে। তাঁরা বিপ্লব ঘটাবেন। অবশ্যই ঘটাবেন। তাঁরা! ভ্লাদিমির ইলিচ কথাগুলি তাকে, লেওপোল্ডকেই বলছিলেন।

পাশা এল। চোখে চাপা ক্রোধ।

'পুলিশটা এখানেই।'

এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্না দেশলাই জ্বাললেন। সিগারেট ধরালেন। ধীরে ধীরে নীল ধোঁয়ার কুন্ডলী ছাড়তে লাগলেন।

'রাগের কিছু ঘটে নি, বাছা, রাগ করা একেবারেই অযথা।'

'মার্মণি, তুমি আমাদের উশিন্স্কি*!' বলে হেসে উঠলেন নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্না।

ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজে দরজাটা একটু ফাঁক হল। এরই মধ্য দিয়ে একটি লোক এমনভাবে ঘরে ঢুকল, যেন নিজের উপস্থিতিকে অস্বস্তিকর করাটাই তার ইচ্ছা। কুৎসিত এই লোকটির দাড়িটা ছোট, হালকা, বিবর্ণ। সে পুলিশ ইন্স্পেক্টর জাউসায়েভ। নির্বাসিতদের পাহারাদার। টেবিল ঘিরে বসা লোকজনদের উপর বারেক চোখ বুলিয়ে মাঝখানের নবাগতটিকে মনে মনে সে পরখ করতে লাগল। ভেতরের পকেট থেকে সে বাঁধাই-করা একটি নোটবুক বার করল। নিজের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য বুক উঁচিয়ে জাউসায়েভ বলল:

'নির্বাসিত রাজনৈতিক কর্মী ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ উপস্থিত?'

সে রোজই আসে। সকালে, বিকালে। নির্বাসিতদের খোঁজখবর নেয়। নিয়মমাফিক জিজ্ঞাস্য সাধারণ প্রশ্নের প্রায় কোনটিই সে উচ্চারণ করত না। একটি খাতায় ভ্লাদিমির ইলিচ ও নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্নার সই নিয়েই চলে যায়। গাঁয়ের সকল নির্বাসিতের খোঁজখবর রাখা তার দায়িত্ব। কিন্তু তার মন পড়ে থাকত নিজের খামারে, ওখানে অপেক্ষিত কাজকর্মে। কিন্তু এবার এক নতুন আগন্তুককে সে দেখল। তাই জাউসায়েভ

---

* ক. দ. উশিন্স্কি (১৮২৪-১৮৭০) বিখ্যাত রুশ শিক্ষাব্রতী।

ভাবল এই নতুন লোকটিকে প্রভাবিত করা, সে নিজে কী, তার কাজ ও ক্ষমতা কতটা— এসব কিছু বুঝান দরকার।

'নির্বাসিত রাজনৈতিক কর্মী, ভ্লাদিমির ইলিন উলিয়ানভ উপস্থিত?'

'না, উলিয়ানভ নেই।'

অভাবিত এই উত্তরে তার মুখ থেকে কোন কথা সরল না।

'আর উনি কে? ওখানে কে দাঁড়িয়ে আছেন?'

'দেখছেন না, উনি কে?'

সবাই তাকে নিয়ে তামাশা শুরু করলেন। নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না আর এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্‌না চাপা হাসিতে গড়াগড়ি খেলেন। গলা ফাটিয়ে উদ্ধতভাবে হাসছিল কেবল লেওপোল্ড, ওর মুখ থেকে একবারও চোখ না সরিয়ে। জাউসায়েভ বাঘের ওই ছানাটিকে তার বেপরোয়া, অবজ্ঞাসূচক চাহনির জন্য অসম্ভব ঘৃণা করত। হাসির জন্য ওর পিঠে বেধড়ক চাবুক চালাতে তার হাত নিসপিস করছিল কিন্তু অতটা সাহসী সে নয়। নির্বাসিত ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভের সামনে তার লজ্জা। তার উপর জারিজুরি খাটানোর ক্ষমতা এই ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভের নেই। বরং উল্টোটাই, সত্যি। তবু জাউসায়েভ তাঁর সামনে লেজ গুটিয়ে থাকে। কেন? কারণ, তাঁর মধ্যে একটি লুকনো শক্তি আছে। এই শক্তিটাই তাকে বশে রাখে, কিছুতেই তাকে নড়তে দেয় না। তার হাত অবশ হয়ে যায়, আর আঘাত করা তো দূরের কথা!

ঠিক কথা। ভ্লাদিমির ইলিচ তার সঙ্গে সামান্য তামাশা করলেন। হাজিরার জন্য এটুকু তার পাওনা। আসলে সে তো এক সরল, সাইবেরীয় চাষী মাত্র। ভদ্রলোকের প্রতি তার সহানুভূতি থাকাই উচিত।

জাউসায়েভ পা সরিয়ে ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে বলল:

'ভ্লাদিমির ইলিচ, একটা সই দিন। এটা নিয়ম। এছাড়া আমি নাচার। আমাকে হুকুম তামিল করতে হয়।'

ভ্লাদিমির ইলিচ নাম সই করলেন। আর কোন তামাশা নয়। নিঃশব্দে নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌নাও নাম সইটি দিলেন। সিল্‌ভিনও তাঁর সনাক্তিপত্র দেখালেন। এতে ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়ে গাঁ যাবার পথটি চিহ্নিত ছিল। জাউসায়েভ কাগজটা কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখে শেষে ফেরত দিল।

'আচ্ছা চলি,' সে বলল।

সামনের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল। নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না বললেন:

'লোকটা খারাপ নয়। বেচারী একেবারেই নিরক্ষর।'

কেউ কোন মন্তব্য করলেন না। এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্‌না বললেন, ঘুমের সময় হয়েছে। সিল্‌ভিন রাতটা এখানেই কাটাবেন। পাশা ও নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না তাঁর জন্য বিছানা করতে গেলেন।

লেওপোল্ড সবাইকে বিদায় জানিয়ে রান্নাঘরের কোণায় রাখা বন্দুকটা নিয়ে ঘর ছাড়ল। গাঁয়ের বিশাল আকাশটা তারায় ভরা। তার মনে শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা উপচে উঠছে। শুশেনস্কয়ের আকাশের মতোই বিশাল, অত্যুচ্চ কিছু একটা আসছে। সারা সত্তায় এর আলোড়ন সে অনুভব করল। সে এজন্য উন্মুখ। বাত্যা শুরু হয়েছে। পাশা ঠিকই বলেছে: লাল সূর্যাস্ত ঝড়েরই আরেক নাম। বসন্ত অনেক দূরে। তবু শুশেনস্কয়ের বাতাসে অনাগত বসন্তের অস্পষ্ট রেশ এখনই আঁচ করা যায়।

॥ ৭ ॥

পরদিন ভোরে ঘুমভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই লেওপোল্ড ভাবল: 'ওখানে যাওয়ার আর কী অজুহাত বের করা যায়?'

রোজই সে উলিয়ানভদের বাড়ি যায়। ওয়ারশ ও সেণ্ট পিটার্সবুর্গে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তরুণরা ওখানে নিজেদের পছন্দসই বিষয় পড়ে, বক্তৃতা শোনে। আর উলিয়ানভদের বাড়ি হল লেওপোল্ডের বিশ্ববিদ্যালয়। সকালে প্রায়ই তার ওখানে যাওয়া হয় না। কিন্তু আজ না গেলে অনেক কিছুই তাকে হারাতে হবে: সিল্ভিন চলে যাওয়ার আগে চায়ের টেবিলে তাঁরা আবার কথা বলবেন। অজুহাত মিলেছে। যুতসই বটে: ধার করা বইটি ফেরত দেয়া। সালতিকভ-শেচেদ্রিনের বই 'গলভ্লিওভ মহোদয়রা' বেল্টের পেছনে গুঁজে গায়ে ভেড়ার চামড়ার কোঁট চাপিয়ে সে দরজার দিকে পা বাড়াল।

'চললি কোথায়?' তার বাবা বললেন।

একহারা, লম্বা চেহারার মানুষটি, জানালার ধারে বসে খদ্দেরের জন্য খরগোসের চামড়ার টুপি তৈরি করছিলেন। পেশাদার টুপি-কারিগর তিনি। লদ্জে সব ধরনের ফ্যাশনদুরস্ত ফেল্ট টুপি, লোমের টুপি, রেশমী টুপি, পোশাকী টুপি তৈরি করতেন। নামডাকও ছিল। আর এখানে শুশেনস্কয়েতে দৈবাৎ ফরমাশ আসে। কিন্তু সুযোগ পেলেই তিনি লেওপোল্ডকে কাজ শেখাতে চান। কারিগরিটা শেখে ওর কাজে লাগতে পারে।

'বাবা, এখন বাইরে গিয়ে তোমাকে পরে সাহায্য করলে চলবে? খুবই জরুরি কাজ।'

সেলাই থেকে চোখ সরিয়ে তার বাবা কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'জরুরি হলে অবশ্যই যাবি।'

তিনি অল্প কথার মানুষ। সন্তানদের জন্য তাঁর মন সব সময়ই টনটন করে। ছ'জনকে তিনি খাওয়ান, পরান। তাদের ভবিষ্যৎই বা কী? কিন্তু বাড়িতে কখনই

ঝগড়াঝাঁটি হয় না। লেওপোল্ডের বাবা ভাগ্য নিয়ে অনুযোগ করেন না, দোষ দেন না ভাগ্যকে। তবে লেওপোল্ডের মা মাঝেমাঝে অনুতাপ শাপশাপান্ত করেন।

যথারীতি লেওপোল্ড নতুন কিছু শেখার সুখী প্রত্যাশা নিয়েই উলিয়ানভদের বাড়ি গেল। ওখানকার আলাপ-আলোচনা সব সময়ই কৌতূহলপ্রদ, মোটেই একঘেয়ে নয়।

দরজায় জেনি শুয়ে, কুকুরটার মাথা সামনের থাবাদুটির উপর, চোখে হুঁশিয়ারী দৃষ্টি। জেনি অত্যধিক চটপটে স্বভাবের কুকুর। শিকারী ও পাহারাদার জাতের এক সংকর এবং এর মধ্যে কোন্‌টি প্রকট বলা মুশকিল। লেওপোল্ডের বাবা ও অস্‌কার এঙবার্গ বন্দুক নিয়ে ভ্লাদিমির ইলিচকে শিকারে ডাকতে এলে জেনির শিকারী স্বভাব উথলে ওঠে। ওঁদের গন্তব্য সে তখনই আঁচ করতে পারে, উত্তেজনায় লাফাতে থাকে। অস্থির জেনি তখন গোঙায়, লেজ নাড়ে, দরজা আঁচড়ায়, সতৃষ্ণ চোখে ভ্লাদিমির ইলিচের দিকে তাকায়, তাঁর হাঁটুতে নাক ঘষে আর অনুনয় করে: শিকারে আমাকে সঙ্গে নাও, নাও না...

আর ভ্লাদিমির ইলিচ যখন শিস দিয়ে বলেন: 'চল জেনি, চল,' তখন ওর ফুর্তি বাঁধ মানে না।

কিন্তু বাড়ি পাহারার কাজও জেনি ভালই করে।

উলিয়ানভদের চা খাওয়া শেষ হয়েছে। তাঁরা এখনো টেবিল ছেড়ে উঠেন নি। এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্‌না সিগারেট টানছেন। তাঁর চা ঠান্ডা হচ্ছে, কাপে চুমুকও দেন নি তিনি। ভ্লাদিমির ইলিচ ঘরে ধীরে ধীরে পায়চারি করছেন। তাঁরা আনাতোলি ভানেয়েভের সম্পর্কে কথা বলছেন। ভ্লাদিমির ইলিচের অনেক সহকর্মীর কথাই লেওপোল্ড ওঁর মুখে শুনেছে। বিশেষত আনাতোলি ভানেয়েভে। ভ্লাদিমির ইলিচ ওঁকে খুবই ভালবাসেন। তাঁকে আর ক্র্‌জিজানভ্‌স্কিকে। ক্র্‌জিজানভ্‌স্কি সুস্থ, থাকেন শুশেনস্কয়ের কাছেই। ভানেয়েভ থাকেন অনেক দূরে, তিনি অসুস্থ। মনে হচ্ছে খুবই অসুস্থ।

'কিছু একটা করতেই হবে! তাকে সরানো দরকার। এত দূরে, মারাত্মক শীত আর বরফের এলাকা ইয়েনিসেইস্কে তাকে ফেলে রাখা যায় না!' পায়চারি করতে করতে ভ্লাদিমির ইলিচ বলছিলেন। 'অসাধারণ ভাল মানুষ!' তারপর সিল্‌ভিন যেখানে বসে ছিলেন সেই উঁচু পিঠওয়ালা কাঠের সোফাটার সামনে গিয়ে বললেন: 'যার কথা আমি আপনাকে বলছি আর কি! আপনারা দুজনেই নভ্‌গরদের মানুষ আর পিটার্সবুর্গে ছাত্রজীবনে ভানেয়েভের সঙ্গে আপনি একই ঘরে থাকতেন। তাই না?'

'ভানেয়েভ একজন মানুষ বটে,' সিল্‌ভিন বললেন।

'একবার হঠাৎ পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কতকগুলি প্রবন্ধের খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়ে আমার,' ভ্লাদিমির ইলিচ স্মরণ করলেন। 'তখনো আমরা পিটার্সবুর্গের জেলে।

ভানেয়েভ এটা শোনা মাত্রই জেল থেকে নির্জন নভ্‌গরদের বন্ধুদের লিখে সেগুলি আমাকে পাঠাতে বললেন। আর এই সাইবেরিয়ায় দরকার পড়লেই আমার জন্যে তিনি বইয়ের ফরমাশ পাঠান। আমি তাঁকে লিখি, আর তিনি লেখেন নির্জনিতে। যেমন কাজের তেমনি দয়ালু মানুষ। সত্যিকার বন্ধু বটে। লেওপোল্ড, কী বল?'

যথারীতি লেওপোল্ড কিছুই বলতে পারল না। সে ভুরু কোঁচকাল, যেন কোন জটিল সমস্যা নিয়ে মশগুল। লজ্জা, নাকি নিরেট ভীরুতা।

'কী বই ওটা?' বেল্টের পেছনের বইটি দেখতে পেয়ে ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন। 'শেষ করে ফেলেছ? এবার তোমাকে কী দেয়া যায়? আবার সালতিকভের কিছু? না? তাহলে? রাজনীতির কোন বই? খুব ভাল!' তিনি পড়ার ঘরে গেলেন এবং শেল্‌ফ থেকে একটা বই বেছে নিয়ে ফিরলেন। এঙ্গেলসের লেখা 'সমাজতন্ত্র: কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক'। 'এটা তোমার জন্যে। খুব সাবধানে পড়বে। স-মা-জ-ত-ন্ত্র! 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি শুনলেই ওরা আঁত্‌কে ওঠে। তাড়াহুড়া করো না। বইটি হেলাফেলা করে পড়ার মতো নয়।'

এবার ভ্লাদিমির ইলিচ সিল্‌ভিনের দিকে ফিরে বললেন: 'জানেন এইমাত্র কী আমার মনে পড়েছে, মিখাইল আলেক্‌সান্দ্রভিচ? আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানে, ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়েতে একজন ডাক্তারকে আমি চিনি। নাম, সেমিয়ন মিখেয়েভিচ আরকানভ। ভাবছি, আপনার সম্পর্কে ওঁকে দু'লাইন চিঠি লিখে দেব।'

'ধন্যবাদ, ভ্লাদিমির ইলিচ। এজন্যে কষ্ট করার কোন প্রয়োজন আছে?'

'কিসের কষ্ট? ওখানে পেঁাছে অনেক রকম অসুবিধায় পড়তে পারেন। ডাক্তার ওখানকার সবাইকে চেনেন। থাকার ব্যবস্থা সম্পর্কে উনি সাহায্য করতে পারেন। এক মিনিটও লাগবে না।'

তিনি পড়ার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। জেনি আস্তে আস্তে দু'পা হেঁটে বন্ধ দরজার সামনে শুয়ে পড়ল।

'আপনাদের এখানে কী ভালই না লাগছে!' হঠাৎ সিল্‌ভিন বলে উঠলেন। 'কী সৌভাগ্য যে আপনারা সবাই একসঙ্গে আছেন!'

'কিন্তু আপনিও তো এমনি থাকতে পারেন মিখাইল আলেক্‌সান্দ্রভিচ। এতে আপনার অসুবিধা কোথায়?' একই সঙ্গে মা ও মেয়ে বলে উঠলেন।

পাশা বাসনগুলি রান্নাঘরে না নিয়ে টেবিলের কোণায় রেখে সোফার কিনারে স্থির হয়ে বসল, মন দিয়ে ওঁদের কথা শুনতে লাগল।

'আমার অসুবিধা কোথায়? সত্য কথা বলব, নাকি? সম্ভবত গভীর প্রেম। আমার জীবনের কষ্টের, অসুবিধার ভাগ নিতে ওকে বলতে ভয় পাই। ওর জন্যে আমার ভয় হয়। এতে তার জীবন, স্বভাব, তার অভ্যাস সবই ভেঙ্গে পড়বে! তাকে ভালবাসি

বলেই এতটা ত্যাগ করতে বলতে পারি না। অচেনা সাইবেরিয়ায় নির্বাসিতের জীবনযাত্রার সম্ভাব্য দুর্ভাগ্যের মধ্যে ওকে আমি টানতে চাই না...'

নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্নার বেদনামিশ্রিত বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টির সামনে হঠাৎ তিনি চুপ করে গেলেন।

'আপনার প্রেম অদ্ভুত বটে।'

'আর তার ভালবাসাটাই যে অদ্ভুত নয়, এ-সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত?' বললেন এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্না।

'ও, মা! হয়ত ওঁর বান্ধবী পুরোপুরি মনস্থির করতে পারেন নি... উনি ওঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন, মানে আপনার জন্যে, আপনিই যাতে প্রস্তাব দেন। আপনি তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন, মিখাইল আলেক্সান্দ্রভিচ? আমার সন্দেহ হয়।'

'কী বলছেন?' তীব্র যন্ত্রণায় সিল্ভিন যেন চেঁচিয়ে উঠলেন। তিনি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং আবার বসতে গিয়ে চায়ের গ্লাস উলটে দিলেন।

'আ!' পাশা অনুচ্চ চিৎকার চেপে গেল কিন্তু ন্যাপকিন আনতে তখনই ছুটল না।

'তাঁকে সম্মান করলে আপনি কেন এমন সন্দেহ করেন যে তিনি শহুরে জীবন, নিজের অভ্যাস আর আরাম-আয়েস ছেড়ে আসতে ভয় পাবেন? ভালবাসা আর ব্যক্তিগত অভ্যাস। এই দুটো জিনিস কি তুলনীয়? রাজনৈতিক কারণে নির্বাসিত স্বামীর ভাগ্যের ভাগী হওয়া কি স্ত্রীর পক্ষে সুখ ও গৌরবের নয়? তার লক্ষ্য ও আদর্শের শরিক হওয়া? একই সঙ্গে দুঃখ বরণ? আর তাই যদি না হয় তবে তিনি আপনাকে ভালবাসেন না। ভুলে যান ওঁকে। ভুলে যান যত শিগগির সম্ভব। কারণ উনি আপনাকে ভালবাসেন না।'

'সে আমাকে ভালবাসে।'

'মনে হয় এতে কিছুটা সন্দেহের হেতু আছে,' এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্না সামান্য হেসে বললেন। 'পুলিশ আপনাকে স্লেজে তুলে ইয়ের্মাকভ্স্কয়ে নিয়ে চলছে আর তখন তিনি... আ! এই তো স্লেজ এসে গেছে।'

তাঁরা জানালা দিয়ে লাল গোলাপ-আঁকা ঘোড়ার জোয়াল দেখতে পেলেন। ঘণ্টি বাজিয়ে গাড়িটা সিল্ভিনকে ডাকছিল।

'ও আমাকে ভালবাসে,' সিল্ভিন আবার বললেন। 'লক্ষ লক্ষ প্রমাণ আছে।'

'আপনার প্রয়োজন শুধু একটার, আপনার সুখদুঃখের সাথী হওয়ার ইচ্ছা।'

'আপনাদের দুজনের জন্যে রান্নাবান্না করবেন, এটা তাঁকে করতেই হবে—মাঝে মাঝে কল্পলোক থেকে নেমে আসতেই হবে,' এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্না বললেন।

'আপনার কাজের শরিক হওয়া, ঝুঁকি নেওয়া, বিপদের মুখে দাঁড়ানো। এমন কি মৃত্যুর...'

'মৃত্যু নিয়ে কথা না বলাই ভাল,' এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্না মেয়েকে থামিয়ে দিলেন। 'এই ধরনের চিন্তা কোন কাজের কথা নয়।'

পড়ার ঘরের দরজা খুলে তাড়াঘাড়ি ভ্লাদিমির ইলিচ এলেন।

'এই চিঠি, মিখাইল আলেক্সান্দ্রভিচ। নিশ্চয়ই মন খারাপ করে যাচ্ছেন না। তাই না?'

'আমার মন আনন্দে ভরে গেছে। আমি চলছি দুরন্ত আশা নিয়ে!' সিল্ভিন আবেগের সঙ্গে বললেন।

হঠাৎ যেন ধাক্কা খেয়ে ভ্লাদিমির ইলিচ একপা পিছিয়ে গেলেন।

'কী হচ্ছিল এখানে? গোপনীয় কিছু? আমি জানি এসব ব্যাপারে আপনাদের অঢেল আগ্রহ। তবে এখন নয়। এসব রাখুন। আসুন, আসুন, আমাকে সবকিছু খুলে বলুন। জলদি আসুন!'

তিনি একে একে সবার মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে শেষে লেওপোল্ডের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

'শিগগিরই মিখাইল আলেক্সান্দ্রভিচের বান্ধবী আসছেন!' হঠাৎ বলে ফেলে লেওপোল্ড নিজেই অবাক হল।

'সাবাস, সাবাস! চমৎকার!' সিল্ভিনের কাঁধ চাপড়ে ভ্লাদিমির ইলিচ আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'নির্বাসিত সকলের বান্ধবীরাই এসে গেছেন। আপনার উনিও নিশ্চয়ই আপনাকে এখানে এই নির্জনে একা ফেলে রাখবেন না। চমৎকার, আপনার জন্যে খুব ভাল। কিন্তু বলুন তো, এমন একটা খবর একেবারে শেষ মুহূর্তে ভাঙলেন কেন?'

'আমি আপনাদের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ,' আবেগ জড়ান স্বরে সিল্ভিন বললেন।

ব্যাপারটা এখন স্থির হয়ে গেছে, সিল্ভিন বুঝলেন। অথচ গতকালও কী করা উচিত তিনি জানতেন না। এখন আর কোন দ্বিধা নেই। কোন দোটানা নেই। বন্ধুদের সহযোগিতা ও সুপরামর্শের জন্যই এটা হল। কিন্তু নিজেকে এটা করতে হলে এখনো মনস্থির করা সম্ভব হত না। ভালমন্দ তিনি ওজন করতেন: তাঁর আসাটা কি ওঁর জন্য আত্মত্যাগের ব্যাপার? যদি হয়ই বা, তাহলে? আত্মত্যাগে অনীহ ভালবাসা কি সত্যিকার ভালবাসা?

'এই বাড়ির সকলের জন্যেই আমার ধন্যবাদ, ভ্লাদিমির ইলিচ। সকলের জন্যে। আর তোমাকেও!' তিনি লেওপোল্ডকে জোরে বুকে চেপে ধরলেন।

বাইরের ঘণ্টি এবং ঘোড়ার গাড়ির লাল গোলাপ-আঁকা জোয়াল তাঁকে আজ বর্তমানের কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্না সবাইকে বসতে বললেন। শুভযাত্রার প্রাক্কালীন ক্ষণিক বসে থাকা এখানকার রীতি। ঠিক তখনই জেনি এসে মুখটা ভ্লাদিমির ইলিচের

হাঁটুতে রাখল। তিনি তার কান আঁচড়ালেন এবং সে ধন্যবাদ জানানোর জন্য বারেক লেজ নাড়ল।

'আপনার বান্ধবীকে বলবেন এখানে আসার সময় সম্ভব হলে পথে যেন আমাদের আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করেন,' ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন।

'নিশ্চয়ই, ভ্লাদিমির ইলিচ!' সিল্‌ভিন বললেন এবং সুখচিন্তায় ভাবলেন: 'ওঁরা তার আসার কথা বলছেন, যেন আসাটা ঠিক হয়ে গেছে!'

এখন দাঁড়ানোর সময়। বিদায়। কিছুটা বিভ্রান্তির মধ্যে বিদায় সম্ভাষণ বিনিময় করা হল।

'হতাশ হবেন না। অসুখে পড়বেন না। গুছিয়ে বসবেন।'

'আপনার বইটা ভালভাবে শেষ করুন, এটাই কামনা করছি, ভ্লাদিমির ইলিচ!'

বাইরের বারান্দায় পেঁৗছেও তাঁদের কথা শেষ হল না।

'বিদায়,' সিল্‌ভিন বললেন। 'আপনাদের বাড়িটা কী চমৎকার, আত্মীয়ের মতো।'

'আপনার বান্ধবীকে তাড়াতাড়ি আসতে বলুন। তখন আপনিও এমনটিই থাকবেন। ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়েতে কেমন আছেন আমাদের লিখবেন।'

'আপনারা ঘরে যান। আপনাদের সবার ঠান্ডা লাগবে! বিদায়।'

জানালা দিয়ে হাসিমুখে তাঁর উদ্দেশে হাত নাড়তে মহিলারা ঘরে গেলেন। ভ্লাদিমির ইলিচ একটি গরম কোট গায়ে জড়িয়ে বারান্দায়ই রইলেন।

'কী চমৎকার বাড়িটি আপনার, ভ্লাদিমির ইলিচ। আসার সময় তাড়াহুড়োর মধ্যে এটা আমার চোখে পড়ে নি।'

সিল্‌ভিন একপা স্লেজে দিয়ে উপরে না গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি বাড়িটা আগাগোড়া দেখতে লাগলেন। কোন বৈশিষ্ট্য ছিল বাড়িটার, আলাদা কিছু ছিল, কোথায় যেন কাব্যিক আঁচ ছিল। বারান্দার সামনে ছাদের সঙ্গে লাগান দুটি খোদাই করা খুঁটি, বারান্দায় ওঠার সিঁড়ির তিনটি ধাপ, রেলিংহীন। এইই সব। অথচ আশপাশের ঘরগুলির তুলনায় চোখে পড়ার মতো।

'এটা সত্যি ব্যতিক্রমী ধরনের,' ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন। 'এর নকশাকারী হলেন ডিসেম্‌ব্রিস্ট আলেক্‌সান্দর ফ্রলভ। কঠিন সশ্রম কারাভোগের পর এখানে আরও দুজন ডিসেম্‌ব্রিস্ট থেকেছেন। তারপর আসেন নির্বাসিত পোলিশ বিপ্লবীরা। আর এখন আছি আমরা। আমরা চাই, আমরাই যেন এখানকার শেষ নির্বাসিত হই। তাই না? এবার শুভযাত্রা। ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়ে তো খুব দূরে নয়, সাতান্ন মাইল মতো। আমরা যারা সাইবেরিয়ায় আছি তাদের জন্যে কোন দূরত্বই নয়!'

গাড়োয়ান চাবুক ঘুরাল। কিন্তু সিল্‌ভিন চেঁচিয়ে বললেন, 'একটু দাঁড়াও, বিদায়, ভ্লাদিমির ইলিচ। আর লেওপোল্ড, তুমি আমার সঙ্গে খানিকটা যাবে তো।'

তিনি লেওপোল্ডকে স্লেজে টেনে তুললেন। ঘোড়াগুলি চলতে শুরু করল এবং

মুহূর্তে মূল সড়কের জমাট বরফের উপর দিয়ে স্লেজ প্রায় উড়তে লাগল। হিমেল বাতাস লেওপোল্ডের কানে শিস দিল, মুখে ঝাপটা মারতে শুরু করল। এই হল সাইবেরিয়া। বসন্ত এখনো বহু দূরে।

'ডিসেম্‌ব্রিস্ট, পোল, আমরা...' সিল্‌ভিন ভাবতে লাগলেন এবং চাপা স্বরে পুশকিনের কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করলেন: ''যে-বিষণ্ণতা দিনের শূন্যতা ভরে দেয়, অন্তুত, তা হল মধুর বেদনা ও মধুরতর আনন্দের মিশ্রণ'...'

তিনি লেওপোল্ডের সঙ্গে খুশিমতো কথা বলতে পারছিলেন না। গাড়োয়ানের চামড়ার কোট-ঢাকা পিঠটা তাঁদের মুখের সঙ্গে প্রায় লেপটে ছিল।

'আমার মনে হচ্ছে, এবার আমাদের বিদায় নেওয়া উচিত,' বেশি দূরে যাওয়ার আগেই সিল্‌ভিন বললেন। 'তোমাকে আমার ভাল লেগেছে, আশা করছি আবার দেখা হবে। আর ওটা,' লেওপোল্ডের কোটের নিচে কোমরের বেল্টে গোঁজা এঙ্গেলসের বইটির দিকে ইশারা করে বললেন, 'আমাদের মতো লোকের জন্যে খুবই উপকারী!'

তিনি বললেন: 'আমাদের মতো লোকের জন্যে।' যদি তার বাবা শুনতে পেতেন উলিয়ানভদের বন্ধু, একজন পেশাদার বিপ্লবী লেওপোল্ডের সম্পর্কে কী উচ্চ ধারণাই না পোষণ করেন! শয়নে স্বপনে লেওপোল্ডের একটিই চিন্তা: 'ওঁদের একজন' হওয়া এবং জীবনে একটিই লক্ষ্য: স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা। পোল্যান্ডের জন্য। মাতৃভূমির জন্য। পবিত্র পোল্যান্ডের জন্য।

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে দেখল পেছনে বরফের ধূলিঝড় তুলে স্লেজটি ক্রমেই ছোট হয়ে হয়ে দূরে মিলিয়ে গেল।

গাড়োয়ান লেওপোল্ডকে চিনতে পারে নি। কিন্তু পারলে?

তারপর দেখল সে একেবারে আঞ্চলিক প্রশাসন দপ্তরের সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেরানী সার্টের উপর একটি কোট চাপিয়েই বারান্দায় এল, কানে তার অপরিহার্য কলমটি। তাকে ইশারায় ডাকল:

'এই, এখানে এসো!'

কেরানী কী চায় ভাবতে ভাবতে লেওপোল্ড বারান্দায় উঠে এল।

'অফিসে যাও। সার্জেণ্ট ডাকছেন।'

উলিয়ানভদের সঙ্গে স্বর্গীয় সকালের অভিজ্ঞতার পর এখানে আসাটা তার কাছে কাদায় ডোবার সামিল মনে হল। অফিসরূপী এই আস্তাবলের কোনায় নোংরা ঝাড়ু, বাজে তামাকের গন্ধে ভরা বাতাস, দেয়ালে গত বছরের মাছি বসার দাগে ডিম কলঙ্কিত জার ও জারিনার ছবি, এবং সেটির নিচে পা ছড়িয়ে বসা পুলিশ সার্জেণ্ট, তার পাশে তলোয়ার -- চ্যাপ্টা নাক, হলুদ চোখ, যেন হুলো বিড়াল। তার সোনালী রঙের লম্বা, সোজা, চোস্ত গোঁফজোড়া হাড়-ওঠা মুখের এপার-ওপার ছড়ান। সে সব সময়ই গোঁফে তা দিচ্ছে, কখনো এদিকে, কখনো ওদিকে।

'তুই দেশের ওই শত্রুকে বিদায় জানাতে গিয়েছিলে, তাই না?' সে জিজ্ঞেস করল। ওর তলোয়ার মাটিতে লেগে যাওয়ায় ঝনঝন শব্দ উঠল।

লেওপোল্ড ইতস্তত করতে লাগল। সিল্‌ভিনকে দেশের শত্রু বলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত, নাকি চুপ করে থাকাই ভাল? সার্জেণ্টের প্রশ্নের কোন উত্তর সে খুঁজে পেল না।

'ভুরু কোঁচকাচ্ছিস, তাই না?' তলোয়ার আরও জোরে বাজল। 'হাজতে আটকে রাখলেই ওপরওয়ালার সামনে ভুরু কোঁচকানোর মজাটা টের পাবি।'

এবারও লেওপোল্ড কথা বলল না। সে ভয় পেল এই ভেবে যে তাকে হাজতে আটকালে কোমরের বইটি সে লুকাতে পারবে না। আর বইটা হল এঙ্গেলসের 'সমাজতন্ত্র: কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক'। বইয়ের মালিকের নাম তারা জানতে চাইবে। কোথায় ওটা পেয়েছে তাকে জিজ্ঞেস করবে। এসব অনুমান করা সহজ। আর ভ্লাদিমির ইলিচ তাকে বলেছেন যে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি শুনলেই ওরা আঁতকে ওঠে।

তার মনে হল বইটি ফসকে যাচ্ছে, নামছে কোমর বেয়ে আর এখনই পড়বে মেঝেতে। সে ঠায় দাঁড়িয়েই রইল, যেন মরমে মরছে।

'ঘুঘুর বাচ্চা, ধরা পড়ে গেছিস। এই খাঁচা থেকে পালাতে পারবি না...' গোঁফে তা দিতে দিতে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে হেঁড়ে গলায় বলল সার্জেণ্ট। 'বল্ তো, নির্বাসিত উলিয়ানভ আর নবাগত সিল্‌ভিন কী নিয়ে আলাপ করেছেন?' তার কথার কুশ্রী ঝাঁঝে লেওপোল্ডের শিরদাঁড়ায় কাঁপুনি ধরে গেল। সে অবশ্য শান্তভাবেই কথা বলছিল। কারণ অফিসে তারা ছাড়াও অন্য লোক ছিল: কেরানীটি একটানা কিছু একটা লিখছিল আর বারবার দেখছিল বেঞ্চের এক মাথায় বসে থাকা গাঁয়ের স্কুলশিক্ষককে।

'ওঁরা কী নিয়ে আলাপ করছিলেন? বল্, কিচ্ছু লুকবি না।'

'শিকার নিয়ে।'

'বাজে। আর কী?'

'শুশেনস্কয়ের আবহাওয়া।'

'ধোঁকা। আর?'

'ভাপা-সিঙাড়া নিয়ে। সাইবেরিয়ার মানুষ কিভাবে শীতের জন্যে যথেষ্ট সিঙাড়া জমিয়ে রাখে!'

'মিথ্যা বলছিস!' ধৈর্য হারিয়ে সার্জেণ্ট চেঁচিয়ে উঠল।

সরাসরি সার্জেণ্টের মুখের দিকে তাকিয়ে লেওপোল্ড ভাবছিল: 'আমি মিথ্যে বলছি। আমি মিথ্যেই বলে যাব। আমার কাছ থেকে সত্যের একটা দানাও বের করতে পারবে না।'

'নাম?' সার্জেণ্ট বেঞ্চিতে কিল মারল। 'তোর নাম, তাই জিজ্ঞেস করছি!'

'লেওপোল্ড প্রমিন্‌স্কি।'

'লেওপোল্ড! নাম? কোন্‌ কুত্তার?'

'হুজুর, ওরা যে পোল,' সার্জেণ্টকে মদত যুগিয়ে অনুগত স্বরে শিক্ষকটি ব্যাখ্যা করল। 'ওর বাবা তো বেআইনী রাজনীতির জন্যেই এখানে নির্বাসনে রয়েছে। সে তো ওদেরই একজন।'

'মানে ওই বদমাশদের দলের!'

'আমার বাবা একজন সৎ কর্মী, ভালমানুষ, সাহসীও বটেন!' ক্রুদ্ধ লেওপোল্ড পোলিশ ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল।

তার মাথা বিগড়ে যাচ্ছিল। সার্জেণ্টের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে, ওর হেঁড়ে মুখ থেঁতলে দেয়ার দুর্নিবার ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসেছিল।

হঠাৎ তার মনে হল বইটা বেল্ট থেকে সত্যিই পিছলে যাচ্ছে। এটাই তাকে বাঁচাল। ঠিক সময়েই। না-হলে সে সার্জেণ্টের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। ভ্লাদিমির ইলিচের বইটি ওর হাতে পড়বে এই ভাবনায় তার মুখ পাংশু হয়ে গেল। সে প্রায় মূর্ছাই যাচ্ছিল। দারুণ দুর্বলতায় তার হাঁটু কাঁপছিল।

'গোঁয়ারটা ঘাবড়ে যাচ্ছে,' লক্ষণ দেখে সার্জেণ্ট বুঝতে পারল। নিজের অশেষ শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত সার্জেণ্ট বেপরোয়া ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলল:

'ওপরওয়ালার সামনে কথা বলার সময় তোদের কুত্তার ভাষায় আজেবাজে বকিস না। মনে রাখিস রুশদেশের মাটিতে রুশদেশের রুটি খেয়ে আছিস। তাই বলি ধানাই-পানাই ভুলে যা।'

'ঈশ্বর, ওরা আমাকে নিয়ে এসব কী শুরু করেছে? কী করব আমি? ভালমানুষ, বন্ধুরা, আমার কী করা উচিত? মুখ বুজে থাকব, মুখ বুজে। তাই। আমাকে ওরা কাবু করতে চায়। লেঙ্‌ মেরে ফেলে দিয়ে ধরতে চায়। কোন ভুল করা নয়। ওরা তাই চাইছে। ওদের ফাঁদে পা দেব না। ওরা নেকড়ে। আমাকে জ্যান্ত চিবিয়ে খাবে।'

'আমার ভাষা কুকুরের ভাষা নয়। পোল ভাষা,' ঠোঁট কুঁচকে লেওপোল্ড বলল। 'আমাদের মহান লেখক আদম মিস্‌কেভিচকে পোল্যান্ড থেকে রাশিয়ায় নির্বাসনে পাঠানোর পরও তিনি পোল ভাষা ছাড়েন নি।'

'বড় বড় কথা বলে তুই আর তোর বাবা তোদের মেয়াদ আরেকটু বাড়াবি দেখছি। এবার আদমকে আনা হয়েছে। আদম কী যেন... আরেকটা বদমাশ, নিশ্চয়ই... আপাতত বিদায় হ। ভাগ। মনে রাখিস।'

লেওপোল্ড হোঁচট খেতে খেতে বেরুল। দেখলে মনে হয় তার চোখ বরফের টুকরোর মতো ঠাণ্ডা আর শুকনো। কিন্তু ভেতরে কান্না উথলে উঠছিল। যদি একটু সে কাঁদতে পারত? যদি একবার ভ্লাদিমির ইলিচের কাছে গিয়ে এই লাঞ্ছনার কথা বলা যেত? বেল্টের বইটা নিরাপদে আছে। ওঁকে বলা যায়? তাঁর পরামর্শ

চাওয়া। খুবই সহজ। আরেকবার ঠাণ্ডা মাথায় ভাবা যাক। ভ্লাদিমির ইলিচ এখন কাজ করছেন। তিনি 'রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ' বইটি লিখছেন। আজ সকালে তাঁর বন্ধুর সঙ্গে একটি বাড়তি ঘণ্টাও তিনি কাটান নি। এখন গেলে তাঁর সারা দিনের কাজটিই পণ্ড হবে। কিন্তু আরেকবার যদি সার্জেণ্ট আজেবাজে বকে আর সে ওকে মেরেই বসে? এতে তার বাবার মেয়াদ আরও কয়েক বছর বাড়বে। না, সেটি হবে না। বাবা, বাবা আমার! তাঁকে এসব বলা নয়। এমন কি কাউকে বলতেই হবে না।

লেওপোল্ড দ্রুত চলতে লাগল। লম্বা, সোজা, কাঠির মতো সরু একটি মানুষ। একফোঁটা চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে নামল। দস্তানা-পরা হাত দিয়ে সে গাল মুছল। ঠোঁটটা সে জোরে কামড়ে ধরল। কান্নাকাটি আর নয়।

* * *

ইতিমধ্যে সিল্‌ভিন ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়ের পথে মাইলের পর মাইল এগিয়ে চলেছেন। তিনি শক্তি ও সাহস পেয়েছেন। ভ্লাদিমির ইলিচের সঙ্গে থাকার পর এমনটি সব সময়ই ঘটে। এইসঙ্গে তিনি নিঃসঙ্গ, বিষণ্ণও। অন্য সময়ের তুলনায় অনেক বেশি।

তিনি ভাবছিলেন: 'তাঁরা পরস্পরকে ভালবাসেন। ভ্লাদিমির ইলিচ আর নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না। একে অন্যের সঙ্গ উপভোগ করেন। একটি মুহূর্তও তাঁদের একঘেয়ে মনে হয় না। ওঁদের একসঙ্গে থাকাটা চমৎকার। একটি সুন্দর, মহৎ জোট!'

আসলে ওল্‌গার কথাই তিনি ভাবছিলেন। বেচারি বড় নাজুক, দুর্বল।

তাঁর মনে পড়ল নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌নার কথা। তাঁর হতাশ, বিদ্রূপ-মেশান কণ্ঠস্বর: 'কেউ যদি ভালোবাসার খাতিরে নিজের আরাম-আয়েস, গুরুতর কিছু নয়, আরামে থাকার অভ্যাসটি ছাড়তেই না পারল, তাকে কি আর ভালবাসা বলা যায়?'

নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না ভুল বলেন নি। তবু, তবু এটা ভালবাসা। নিশ্চয়ই ভালবাসা।'

'ওল্‌গা, তোমাকে ভালবাসি!' কী লিখবেন সেটাই সিল্‌ভিন ভাবলেন। 'তুমি যদি এই পরীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে পড়, আমি তোমাকে আপ্রাণ সাহায্য করব। এ তো আমার স্বাভাবিক কর্তব্য। তোমাকে ছাড়া আমার সুখ নেই। আর তুমি, তুমি আমাকে ভালবাস?'

মনে মনে তিনি চিঠির খসড়া লিখে বললেন। ঘোড়াগুলি ছুটছে। খুরের ঘায়ে বরফের গুঁড়ো উড়ছে। মুখে হুল ফোটাচ্ছে। নির্বাসিতদের সঙ্গে গাড়োয়ানের কথা বলা নিষেধ। সে চুপ করেই আছে।

তাইগা সামনে। সায়ানের পাহাড়তলীর কালো, গম্ভীর দেয়াল স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিশাল, ফাঁকা মালভূমির একটি গাঁয়ে স্লেজ থামলে সিল্‌ভিন মুসড়ে পড়লেন। এখানেই থাকতে হবে। এমন ভয়ঙ্কর, বিষণ্ণ নিসর্গে।

'ওল্‌গা, প্রিয়তমা...'

॥ ৮ ॥

'প্রিয়তমা ওল্‌গা আমার! চিঠিটা আমার নতুন আস্তানা, ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়ে থেকে লিখছি। গাঁটি বড়সড়ো, বিষণ্ণ। তাইগার কাছেই। হয়ত পুরো তাইগা নয়, তবু কাছাকাছি তো বটে। বন্দুক ছাড়া বনের গভীরে যাওয়া উচিত নয়। ভালুক মামার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। শুনেছি শীতের সময় নেকেড়ের পাল ঘুরেফিরে কখন সখন এই গাঁ অবধি পেঁাছয়। স্তব্ধ রাতে নেকড়ের ডাক শোনা যায়। ওরা তখন ফাঁকা মাঠে এসে ডাক ছাড়ে।

'ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়েতে আসার পরই তুষারঝড় হল। সন্দেহ নেই, আমারই সম্মানে। সকালে ঘুম থেকে উঠে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখি সাদা, মেঘের মতো কুয়াশায় সবকিছু ঢাকা আর তুষারের তোলপাড়, ঘূর্ণি, গর্জন আর তীব্র শিস। বাড়িটি বরফে চাপা পড়ে যাচ্ছিল। আমি ভেতর থেকে দরজা খুলতে পারি নি। তবু তুষারপাতের শেষ ছিল না! দরজার সামনে ক্রমেই ঢিপি জমছিল। আমার মনে তখন শবযাত্রার ঘণ্টা বাজছে: চিরদিনের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি, সারা দুনিয়া থেকে, যাদের ভালবাসি তাদের কাছ থেকে, তোমার কাছ থেকে। নালিশ, অনুযোগের জন্যে রাগ করো না। তুমি তো জান আমি আশাবাদী স্বভাবের মানুষ। সংযমীও। কিন্তু কখন কখন আমিও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ি। আমি নিরুপায়, লক্ষ্মীটি। দুঃখের কথা আমাকে বলতেই হয়। কিন্তু কাকে? তোমাকে, কেবল তোমাকেই। তুমি আমার শ্রোতা, স্নেহময়ী শ্রোতা। আমি তোমার প্রজ্ঞাদীপ্ত চোখদুটি দেখতে পাচ্ছি, ঘন কালো ভুরুতে বাঁধাই, অরণ্যহ্রদের মতো গভীর নীল।

'ওল্‌গা, আমি প্রস্তাব করছি: আমাকে বিয়ে কর, দয়া করে 'হ্যাঁ' বল, আমাকে ফিরিয়ে দিও না। ওল্‌গা, প্রিয়তমা আমার! ওল্‌গা পাপেরেক, আমার স্ত্রী হও, বন্ধু হও, জীবনের সাথী হও। আমি এক ভবঘুরে, প্রিয় ওল্‌গা। বাড়িঘর বলতে আমার নিজের কিছুই নেই। কিন্তু এখানে, ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়েতে আপাতত একটি ভাল বাড়ি পেয়েছি। এখানে আরসুলা নেই, ধপধপে কাঠের মেঝে, তুষারের মতো সাদা, আমার (আমাদের) নতুন বাড়িটির সেরা সজ্জা। বাসনপত্র বলতে, সত্যিই বলছি, আছে শুধু একটি, ছাইদানি। জিনিসটি চমৎকার, টেবিলের মাঝখানে রাখলে সারা বাড়িতে

বুদ্ধিজীবীসুলভ পরিবেশের আঁচ লাগে। তাই দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। সিগারেটের টুকরোগুলো রাখার মতো একটা পাত্র জুটেছে আমার। আমি ওগুলো আর চায়ের প্লেট বা জানালার তাকের কোণায় রাখব না। শপথ করছি, আমি ফিটফাট থাকব। বধূ আমার, তামাকের গন্ধ পছন্দ না করলে আমি ঘেরা বারান্দায় চলে যাব। একটি চুক্তি করছি: বারান্দা ছাড়া আর কোথাও সিগারেট খাব না। আরও কঠিন শর্ত মানছি: কেবল ঘরের বাইরে।

'এসব মোটেই তামাশা নয়। ওল্‌গা, তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমার আদর্শের কথা, আমার জীবনের লক্ষ্য, পরিকল্পনা সবই জান। তুমি একমত? আমার জীবনের সঙ্গে তোমার তরুণ, মধুর জীবনটি যোগ করতে, ঝুঁকি নিয়ে লড়াইয়ে নামতে, দুঃখ-দারিদ্র্য সইতে ভয় পাও না বলে তুমি কি নিশ্চিত হয়েছ?

'আবার আমি ভুল বকছি। তুমি সাহসী। তুমি সুশীলা। সৎসাহস হার মানে না। যা তোমাকে বলতে চাই: তুমি আমাকে ভালবাস? এটাই জিজ্ঞাস্য, কারণ, আমি আজও নিশ্চিত নই। ভালবাস? তুমি কি...

'প্রিয়তমা, ইয়েরমাকভ্‌স্কয়ে গাঁ হিসেবে মোটেই আহামরি কিছু নয়। এখানে কোন বাগবাগিচা নেই, নেই একটিও আপেল বা চেরি গাছ। লাইলাক ফুলে ডুবে থাকা তোমার ছোট্ট রুশী শহর ইয়েগরিয়েভ্‌স্কের তুলনায় এটা অসহ্য বৈকি। আর তোমাদের নদী গুসেলিন্‌কা। নামটা কী অপূর্ব। ওকে ছেড়ে আসতে তোমার কষ্টই হবে।

'তবে সব মিলিয়ে ইয়েরমাকভ্‌স্কয়েতে থাকা যায় বৈকি। এখানে একজন ডাক্তার আছেন: সেমিয়ন মিখেয়েভিচ আর্‌কানভ। তাঁর বারো বছরের ছেলেটিকে আমি গ্রামার স্কুলের জন্যে তৈরি হতে সাহায্য করছি। বেতনটা খারাপ নয়, ভালই স্থানীয়ভাবে। তুমিও ওকে পড়াতে পারবে...'

ওল্‌গা এখানেই পড়া থামিয়ে হাসতে লাগলেন। নীরবে হাসতে হাসতে শেষে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন, রুমাল বের করে তার কিনারা চিবাতে লাগলেন।

'আর্‌কানভ ডাক্তারের কেবল একটি ছেলের জন্যে এত শিক্ষক?'

চিঠির ঠিক ওই জায়গাটায় এলেই তিনি একটু থামেন। সিল্‌ভিন তার জন্য শিক্ষিকার কাজের স্বপ্ন দেখছেন। সান্ত্বনা বটে। এটাও সম্ভব যে খোদ ডাক্তার আর্‌কানভ তাঁর কল্পনা। সবই বানান ব্যাপার — প্রিয় সিল্‌ভিন, স্নেহময় সিল্‌ভিন। ইয়েরমাকভ্‌স্কয়েতে তুমি একা! তিনি নিজেও জানেন না, ওই পড়ানোর প্রসঙ্গ এলেই তাঁর মন ভেঙ্গে যায়, দুঃখের ভার অসহ্য হয়ে ওঠে। সবকিছুই অন্যরকম হতে পারত। একটি সাধারণ সুখী জীবন। তিনি কোন বীরাঙ্গনা নন। একটি সাধারণ মেয়ে।

তবু তিনি 'হ্যাঁ' বলেছেন। রাজি হয়েছেন। বেশ কিছুদিন হল তিনি চিঠি

পেয়েছেন। নিজের মত জানিয়েছেন। গুসলিন্‌কা ছেড়ে যেতে তাঁর কোনই কষ্ট হবে না। প্রিয় সিল্‌ভিন! গুসলিন্‌কা আসলে কী যদি জানতে? একটি অতি সাধারণ নদী। একটুও সুন্দর নয়। দু'পারে অঢেল কারখানা। ওগুলোর জন্য নদীতে স্নান করা যায় না। যেতে হয় শহর ছাড়িয়ে দূরে! গুসলিন্‌কা মনে রাখার মতো কিছু নয়। তবে বনগুলো ইয়েগারিয়েভ্‌স্কের কাছেই। চমৎকার বন। তবু ওগুলো এখানেই থাকুক। ওর জন্যও কোন দুঃখ নেই। বাগানের লাইলাক ঝোপগুলোও ভুলতে পারব। কেবল আমার ছাত্রীদের ছেড়ে যেতেই যা কষ্ট।

ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না চিঠিটা ড্রয়ারে তালা আটকে রাখলেন। ছাত্রীদের ছেড়ে যেতে তাঁর বড় কষ্ট...

বাড়িওয়ালীর ঘরে ঘড়িতে ন'টা বাজল: মৃদু মূর্ছনা।

'বিদায় বাগান, বিদায়,' খোলা জানালায় ফিরে এসে ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না বললেন। 'আর দেরি নেই!'

জানালার নিচের ল্যাইলাক ঝোপ ফুলে ফুলে ভরে গেছে; শিশির-ভেজা ফুলের গুচ্ছগুলি জানালার তাক ছুঁয়ে আছে। সারা ঘরে মধুগন্ধ। ফুলের কাছে মৌমাছিদের ভিড়; গাছে, ঝোপেঝাড়ে পাখির ঝাঁক — বসছে, উড়ছে। কাকলীমুখর বাগান, বীথিকা। মে মাসের অনুপম এক সকাল।

মনে মনে সবকিছুকে তিনি বিদায় জানালেন।

বাড়িওয়ালির চিরকালীন উঁকিঝুঁকি আর বকবকানি এড়ানোর জন্য তিনি আগেভাগেই বেরিয়ে পড়লেন। সব সময় তাঁকে শুনতে হয়:

'কত বড় পরিবারের মেয়ে তুমি। তোমার বাবা সারাতভের নামী অফিসার, ভাই গেওর্গি আলেক্‌সান্দ্রভিচ...'

সবই সত্য। ওল্‌গা পাপেরেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান।

'প্রিয়তমা আমার, সম্পদ, আরাম, এমন কি নিরাপদে রাখার নিশ্চয়তাও তোমাকে আমি দিতে পারি না। আমি যা দিতে পারি সে ভালবাসা।'

সিল্‌ভিনের চিঠিটি তাঁর মুখস্থ। মনে মনে সর্বক্ষণই তা পড়ছেন।

গুসলিন্‌কা পারের স্কুলটি কাছেই। মেয়েরা যাতে দুপুরের ছুটির সময় নদীতে না নামে সেজন্য উঁচু বেড়া দিয়ে বাড়িটি ঘেরা। এটির প্রথম তলা সাদা পাথরের আর দোতলা কাঠের তৈরি, হলুদ রঙ করা। উঁচু বারান্দার সামনে মৌটুসি আর লাইলাকের ঝোপ। তাছাড়া আছে পপলার গাছ, ডালে কাকের বাসা। এই পাখিগুলি বেজায় হুল্লোড়ে। নদীর ওপারে খুলুদভের সুতাকল থেকে সারা দিন গুম্‌গুম শব্দ আসে। সময়মতো মিনারের ঘড়ির ঘণ্টি শোনা যায়।

'স্কুলশিক্ষিকা ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না, এটাও কি তোমার কাছে কিছু নয়?' তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেন। 'জেলখানার লাগোয়া এই স্কুলটিকে কি তুমি ভালবাস

না?' ইয়েগরিয়েভ্স্কের মেয়েদের একমাত্র স্কুলটি। পৌরসভার কর্তারাই স্কুলের জায়গাটা বাছেন। জেলখানার পাশে।

স্কুলের খুব কাছেই স্কুলবাড়ির দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে একজন তাঁর পথ আটকাল। খ্লুদভ কারখানার সহকারী মেকানিক ফিলিপ ইয়োহানভিচ। চৌকশ না হলেও মানানসই বটে। রুশী বনে যাওয়া এই ইংরেজটির পিতামহ মানচেস্টার থেকে এখানে ফোরম্যানের চাকুরিতে আসেন।

'অপেক্ষা কর, ছেলেটি চীফ ইঞ্জিনিয়র হবে,' ফিলিপ ইয়োহানভিচকে মনে মনে ভাবী জামাতা নির্বাচন করে ওল্গার বাবা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। 'পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে ও বিরাট বাড়ি আর মোটা টাকার মালিক হবে। ওর বুদ্ধিসুদ্ধি সততা — সবই আছে। চমৎকার ছেলে।'

'নমস্কার,' এগিয়ে এসে ফিলিপ ইয়োহানভিচ ওল্গাকে বলল এবং একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলতে লাগল: 'দেরি হওয়ার আগেই তোমাকে অনুরোধ করছি। মিনতি করছি, সাইবেরিয়ায় যেও না! তোমার পায়ে পড়ি। আমাকে ফেলে যেও না। তোমার জীবনটা এভাবে ভেঙ্গে দিও না...'

'পায়ে পড়ার দরকার নেই ফিলিপ ইয়োহানভিচ অনেক ধুলোবালি, প্যান্টটা নোংরা হবে।'

'তুমি সব সময়ই আমার সঙ্গে তামাশা কর, আর আমি মরছি মনের জ্বালায়...'

'এর কোনই দরকার নেই, ফিলিপ ইয়োহানভিচ।'

ওল্গা আলেক্সান্দ্রভ্না তাড়াতাড়ি পা চালাতে চাইলেন। কিন্তু সাদা খাটো এপ্রন পরা এক দঙ্গল মেয়ে তাঁর সামনে এসে পড়ল। পেছনে ফিরে তাকিয়ে কথা বলতে বলতে তারা স্কুলের দিকে চৌমাথা বরাবর এগিয়ে চলছিল।

'ওই তো উনি। দেখ, দেখ!' ওদের কথা ওল্গা আলেক্সান্দ্রভ্না শুনতে পাচ্ছিলেন।

'ওরা আঙুল দিয়ে আসলে তোমাকেই দেখাচ্ছে,' কাঁপা কাঁপা গলায় ফিলিপ ইয়োহানভিচ বলল। 'তাছাড়া তোমার বাবার কথাও ভেবে দেখ। তাঁর মানসম্মান। আর তোমার ভাই, গ্রামার স্কুলের শিক্ষক। তুমি নিজে...'

'আমাদের পক্ষে একে অন্যকে বোঝা একেবারেই অসম্ভব, ফিলিপ ইয়োহানভিচ!' ওল্গা আলেক্সান্দ্রভ্না জবাব দিলেন এবং তড়িঘড়ি চৌমাথা পেরিয়ে স্কুলে ঢুকলেন।

বারান্দায় কেউ নেই। ছাত্রীরা ক্লাসে কর্ম-শিক্ষিকাদের জন্য অপেক্ষা করছে। ওরা তাদের উপাসনায় আর মিলনায়তনে নিয়ে যাবেন।

ওল্গা আলেক্সান্দ্রভ্না তাঁর ক্লাসে গেলেন না। ওরা কী করবে বলা মুশকিল...

স্টাফরুমে যাওয়া মাত্র হঠাৎ সকলেই চুপ করে গেলেন। সবাই তখন বিব্রত।

জনৈকা বয়স্কা শিক্ষিকা যিনি ওল্‌গাকে ভালবাসেন, তিনি মুখ ফিরিয়ে তাঁর পাশ দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেলেন। মেঝের ওপর জুতোর খটখট আওয়াজ আর পেছনে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল।

'অন্যদের মতো উনিও আরেকটি আহাম্মক,' ওল্‌গা ভাবলেন। কিন্তু মনে হল কী যেন হারিয়ে গেছে। কিছু একটা ব্যথার মতো বুকে বাজল। 'তুমি বলেছ আমি সাহসী। মোটেই না। ওদের মধ্যে একা আমার অসহ্য লাগছে।'

'খবরটা সত্যি?' জনৈকা শিক্ষিকা জিজ্ঞেস করলেন।

'কী সত্যি?'

'শুনেছি, তুমি নাকি সাইবেরিয়া যাচ্ছ? আর তোমার হবু বর নাকি নির্বাসিত রাজনৈতিক কর্মী।'

'তাতে কী?'

'ও!'

উনি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। শিগগিরই ঘরটি শূন্য হয়ে এল। রইলেন শুধু ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না আর বৃদ্ধ চিত্রাঙ্কন-শিক্ষক — হাঁপগ্রস্ত, মাথায় টাক। ঘোঁতঘোঁত করে তিনি সোফার গভীর থেকে নিজেকে তুললেন এবং যথেষ্ট কষ্টসহকারে ওল্‌গার কাছে পৌঁছলেন। নিঃশ্বাস ফেলার সময় তাঁর বিশাল দেহে ঢেউ উঠছিল।

'সোনামণি, বলি কী জন্যে? বার্দিগিন নিজেই আসছেন, তুমি জান। তোমাকে ইঙ্গিতে জানিয়েছিলাম, নয় কি? মারিয়া পেত্রভ্‌নাই বলেছিলেন। তোমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হয়েছিল... হয়েছিল তো...'

'ইঙ্গিত আমার অপছন্দ।'

'বলি মেয়ে, ব্যাপারটা আরও খারাপ করা কেন? মারিয়া পেত্রভ্‌না বুদ্ধিমতী...'

করুণা করে তিনি পিট্‌পিট্‌ চোখে তাকালেন। ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না জানেন পেনসনের বয়স অবধি পৌঁছনোই ওঁর আশা। ওঁর স্বপ্ন। 'আমাকে দয়া কর!' দৃষ্টিতে এমনটিই যেন ছিল। 'আমার মোটা পেটটার দিকে তাকাও!'

'আপনি যা বললেন সেজন্যে ধন্যবাদ। আমি সবই বুঝি। এজন্যে কারও দোষ নেই। আমি এখানে, কারণ আমি নিজে...'

চিত্রাঙ্কন-শিক্ষককে এড়ানোর জন্য তিনি ঘর ছেড়ে বাইরে গেলেন।

তাহলে বার্দিগিন আসছেন। কোটিপতি, কারখানা মালিক, সর্বশক্তিমান নিকিফর মিখাইলভিচ বার্দিগিন। উর্দি পরা, বুক জোড়া মেয়রের চেইন, পাশে তলোয়ার, হাতে সাদা দস্তানা — আনুষ্ঠানিক সজ্জায়।

কিন্তু বার্দিগিন এলেন না। বদলে এলেন তাঁর স্ত্রী — আঁটোসাঁটো পোশাক, গলায় মুক্তোর হার। তিনি হলের সামনের দিকে এগুলেন। ওখানেই তাঁর ও স্কুলের পরিচালিকার জন্য আরামকেদারা পাতা।

হলে ইতিমধ্যেই মেয়েরা সারিতে দাঁড়িয়ে গেছে: সব মিলিয়ে চারটি সারি। প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ। ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌নার ছাত্রীরা। প্রতি সারির শেষে কর্ম-শিক্ষিকা দাঁড়িয়ে, নিশ্চল ভঙ্গিতে। কেউ ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌নার সঙ্গে কথা বলল না। মাঝে মাঝে তিনি অদ্ভুত ও ভীষণ দৃষ্টিতে বিদ্ধ হচ্ছিলেন।

তাঁর আসাটা হয়ত সত্যি উচিত হয় নি। বেশ স্পষ্টভাবেই তাঁকে এটি ইঙ্গিতে জানানো হয়েছিল। কিন্তু নিজের ছাত্রীদের শেষবারের মতো না দেখে তিনি যান কিভাবে? এদের সঙ্গে তাঁর কেটেছে কত স্মরণীয় দিন। তারা শরিক হয়েছে কত গুরুতর ভাবনাচিন্তায়। আরও কত! ওদের চোখের দেখা না দেখে চলে যাবেন কিভাবে?

বরফ-সাদা ছোট ছোট এপ্রনে সারা হল ভরে গেল। সোনার কাজ-করা বুটিদার রেশমি চাদর-গায়ে পাদ্রি কঠোর-গম্ভীর স্তোত্র পাঠ করলেন, ধুনুচি ঘোরালেন। এইসঙ্গে অনুরণিত হল কচি মেয়েলী গলার সমবেত ধর্মসঙ্গীত। জানালা দিয়ে আসা তপ্ত রোদ গন্ধবিধুর নীল ধূপের সঙ্গে মিশে নতশির মেয়েদের চারিদিকে একটি জ্যোতির্বলয় তৈরি করেছে।

ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না হলের একেবারে পেছনে দাঁড়ালেন। একা। দুঃখে, হতাশায় তিনি ভেঙ্গে পড়ছিলেন। মনে হল কেউ তাঁকে চেনে না, যেন তিনি এই মেয়েদের সঙ্গে বহুদিন, বহুমাস কাটান নি, যেন স্টাফরুমে শিক্ষিকাদের সঙ্গে প্রতিদিন তাঁর দেখা হয় নি।

পুরনো ঘটনাগুলি তাঁর মনে পড়ল।

'...শুনেছ? খবর রটেছে, সবিনভ* নাকি মস্কো থেকে আবার এখানে আসছেন।'

'সত্যি? ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না, আবার সারা শহরে তোমার প্রশংসা উথলে উঠবে।'

'মানে?'

'আরে, গতবার তো ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌নাই সবিনভের সঙ্গে মঞ্চে পিয়ানো বাজাল। আর তারপর থেকেই তো ওল্‌গার পেছনে ভক্তদের লাইন পড়ল।'

'নাদ্‌সনের বইটি দেখেছেন? সবে আমাদের দোকানে এসেছে।'

'নাদ্‌সন বা অন্য কাউকে নিয়ে ভাববার মতো সময় আমার নেই, মাথাটা আমার দশমিক ভগ্নাঙ্কে ঠাসা।'

'লজ্জার কথা, পাভেল মাক্সিমভিচ। এতটা সীমাবদ্ধ...'

'বার্দিগিনের মিল-ম্যানেজারের স্ত্রীর কাছে শুনলাম তারা পিটার্সবুর্গ থেকে এইমাত্র একটা গাউন পেয়েছেন, সম্ভবত প্যারিসের মডেল, কী সুন্দর...'

সমবেত সঙ্গীত শেষ হতে চলেছে। ওরা গাইছে 'দীর্ঘজীবী হোন'।

প্রার্থনার পালা শেষ। এবার স্কুলের পরিচালিকা মারিয়া পেত্রভ্‌নার বক্তৃতা।

* ল. ভ. সবিনভ (১৮৭২-১৯৩৪) বিখ্যাত রুশ অপেরা গায়ক।

দুটি মেয়ে দু'হাত ধরে তাঁকে মঞ্চে নিয়ে এল। মঞ্চটি নতুন। এই ধরনের অনিয়মিত অনুষ্ঠানে প্রতিবারই এটি নতুনভাবে তৈরি করা হয়। ছোটখাটো মানুষ, পাংশু মুখে অস্বাস্থ্যের ছাপ, পরনে নীল রেশমি পোশাক। মেয়রের স্ত্রীকে সম্বোধন করে তাঁর বক্তৃতা শুরু হল। মহিলাটি নিজের গুরুত্ব দেখানোর জন্য মাঝে মাঝেই মাথা হেলাচ্ছিলেন।

বক্তৃতার মাঝখানে স্কুলের পরিচালিকা চোখে চশমা দিলেন। হা ঈশ্বর, একি! পেছনে কে দাঁড়িয়ে? প্রাক্তন শিক্ষিকা ওল্‌গা পাপেরেক! কী সাহস! মুহূর্তকালের অসহ্য নৈঃশব্দ্য। ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না বুঝতে পারলেন — তাঁর আসাটা মেয়েরা জেনে গেছে। স্কুলের পরিচালিকা নিজেকে সংযত করলেন। চশমার ভেতর দিয়ে তাঁর দিকে বারেক শীতল দৃষ্টি হেনে আবার বক্তৃতা দিতে লাগলেন।

এবার বক্তৃতার বিষয়বস্তু বদলাল। স্কুলের প্রতি পৌরকর্তাদের ঢালাও ঔদার্যের প্রশস্তির বদলে বলতে লাগলেন সমাজচ্যুতদের বিরুদ্ধে, যারা আইন মানে না তাদের বিরুদ্ধে, যাদের অবাধ্যতা রাষ্ট্রবিরোধিতার সামিল তাদের অনিবার্য শাস্তির পক্ষে।

সাদা এপ্রনের ভিড়ে সামান্য আলোড়ল উঠল। কিন্তু একটি মেয়েও পেছনে তাকাল না। কর্ম-শিক্ষিকারা পাহারায় থাকলেন।

বক্তৃতার সিদ্ধান্ত টেনে স্কুলের পরিচালিকা বিরক্তিঝরা কণ্ঠে ঘোষণা করলেন: 'শ্রীমতীরা, এখনই একটি ছোট কনসার্ট অনুষ্ঠান হবে। তাছাড়া বিকেলে আমাদের ঐতিহ্যবাহী বলনৃত্য, গ্রাজুয়েটদের জন্যে।'

'ধন্যবাদ!' গ্রাজুয়েটরা সাড়া দিল। কর্ম-শিক্ষিকাদের ইঙ্গিতে সবগুলি সাদা এপ্রন শোভন সৌজন্যে অবনত হল।

ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না দূর থেকে হয়ত সবই দেখলেন। এসব ছেড়ে তিনি চলে যাচ্ছেন। তাঁর মনে আর কোন দুঃখ নেই। অথচ এদের তিনি তাঁর সবটুকু শক্তি, সবটুকু অনুভূতি উজাড় করে দিয়েছেন। এ কি অযথা? আজকের বলনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গেই কি সবকিছু শেষ?

শোপাঁর একটি ওয়াল্‌জ দিয়ে কনসার্ট শুরু হল। মোটাসোটা গোলাপী একটি মেয়ে পিয়ানোয় বসল। সুতাকলের এক বড়কর্তার মেয়ে। ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না অনেককেই পিয়ানো শিখিয়েছেন। এরা স্থানীয় গণ্যমান্যদের মেয়ে, এই মেয়েটিও। প্রশংসাহীন কাজ।

'ঈশ্বর, শোপাঁকে নিয়ে মেয়েটি কী করছে! এবার বোধ হয় আমার চলে যাওয়াই উচিত!'

কিন্তু ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় অনুষ্ঠানের ঘোষণা শোনা গেল: 'ইশকাপনের বিবি' থেকে দ্বৈতসঙ্গীত। বার্দিগিন সুতাকলের দারোয়ানের মেয়েদুটি মঞ্চে এল। অছি পরিষদের তহবিল থেকে এদের লেখাপড়ার খরচ যোগান হয়।

'সোনামণিরা আমার,' তাদের গানে মুগ্ধ ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না মনে মনে বললেন। 'তোমাদের স্বচ্ছ কণ্ঠস্বরের মতোই স্পষ্ট তোমাদের ভবিষ্যৎ। তোমরা গাঁয়ের স্কুলে পড়াবে। আমাদের শিক্ষা, আমাদের প্রতিজ্ঞা তোমরা ভুলবে না।'

একটি বখাটে চেহারার মেয়ে মঞ্চে এল। তার কোঁকড়ান চুল চুড়ো করে বাঁধা। সে ঘোষণা করল: 'এবার আফানাসি ফেত্‌-এর কবিতা — 'ওকে ভোরে জাগিও না'।'

'তোমার ভবিষ্যৎও আমি জানি', ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ভাবলেন। 'কিছুদিনের মধ্যেই তুমি ফিলিপ ইয়োহানভিচ বা অন্য কোন সহকারী মেকানিকের বাগদত্তা হবে...'

যে-মেয়েটি ফেত্‌-এর কবিতা আবৃত্তি করবে সে মঞ্চে দাঁড়াল। কালো চুল, ফ্যাকাশে চেহারার একটি মেয়ে। সে স্থাণুর মতো দাঁড়াল, হাতদুটি পাশে ঝুলছে, অসাড়। চোখদুটিতে এক ধরনের দীপ্ত গভীরতা। সাদা এপ্রনের ভিড়ে সামান্য আলোড়ন দেখা দিল। ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌নাকে এক নজর দেখার জন্য তারা আড়চোখে তাকাচ্ছিল। তিনি ওদের চোখে সহানুভূতি ও লজ্জা আঁচ করলেন। আরও দেখলেন পবিত্র, অনমনীয় কিছু, যা তিনি ভালবাসতেন, যা তাদের মধ্যে লালন করেছিলেন।

'আমি আফানাসি ফেত্‌ আবৃত্তি করছি না,' মঞ্চের মেয়েটি স্পষ্ট, উচ্চ কণ্ঠে বলল। 'আমি আমাদের প্রিয় শিক্ষিকা ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না সম্পর্কে একটা কবিতা শোনাব।'

'চুপ!' চিৎকার করে স্কুলের পরিচালিকা লাফিয়ে উঠলেন। চশমাসহ অঙ্গভঙ্গি করে, মেঝেতে পা ঠুকে আবার বললেন: 'চুপ, বন্ধ কর এটা! মঞ্চ থেকে নাম! আর তুমি, তুমিও এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও!' তিনি ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌নার দিকে চশমাটি তুললেন। 'এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও, আমার স্কুলের সীমানা ছেড়ে। তুমি!' চশমাটি বাতাসে ঠুকতে ঠুকতে তাঁর চিৎকার আর্তনাদে পৌঁছল। মনে হল তিনি তখনো মঞ্চে দাঁড়ান মেয়েটিকে যেন আঘাত করছেন। 'হতচ্ছাড়ি, কে তোকে এমন কাজ করতে বলল, কে?' আর মেয়রের স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন: 'মাপ করবেন, এসব মনে রাখবেন না!'

মেয়েদের মধ্যে হৈচৈ পড়ে গেল। চিৎকার উঠল। শৃঙ্খলা ফেরানোর জন্য কর্ম-শিক্ষিকারা সারিগুলির মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

'চুপ! থামাও এসব! চুপ! দুজন দুজন করে দাঁড়াও!'

কে একজন দারোয়ানকে ডেকে পাঠাল। সে স্কুলের ঘণ্টি বাজিয়ে দিল। মনে হল যেন বিপদসঙ্কেত জানাচ্ছে।

পাংশু, বিবর্ণ মেয়েটি তখনো মঞ্চে দাঁড়িয়ে। তার মুখ অতিশয় শুকনো, অসাড় হাতদুটি পাশেই ঝুলছে।

ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না হল থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। স্টাফরুমে পৌঁছে

কোটটি কাঁধে ফেলে দৌড়ে পথে নামলেন। সুখে তাঁর শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা, মেয়েদের জন্য ভালবাসায় মন ভরে গেছে।

'সোনামণি মেয়েরা আমার, ধন্যবাদ! বুঝতে পারছি, এখানে সময়টা অপব্যয় করি নি। আমি সুখী। আমি কিছুই ভয় করি না। আমার বয়স কম। মঙ্গলে আমার বিশ্বাস আছে। এটা বৃথা যায় নি। সহজ মনে এখন বিদায় নিতে পারব পথে আর দেরি নয়!'

॥ ৯ ॥

শেষাবধি জুলাই মাসের মাঝামাঝি মিখাইল আলেক্‌সান্দ্রভিচ সিল্‌ভিনের বাগদত্তা মিনুসিন্‌স্কে পেঁছিলেন। সিল্‌ভিন ওখানেই তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তারপর তাঁরা গেলেন ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়ের বাড়ি।

সাইবেরিয়ায় যেতে ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌নার দেরি হয়েছে। প্রথমত, তাঁকে পদল্‌স্কে যেতে হয়। ওখানে মিখাইলের পিটার্সবুর্গবাসী জনৈক বন্ধুর মা রয়েছেন। মিখাইলের ওই বন্ধুটিও নির্বাসিত, থাকেন ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়ের কাছেই। বন্ধুটি কে আর তাঁর মা কেনই বা পদল্‌স্কে থাকেন, তিনি কিছুই জানতেন না। হয়ত ওখানেই তাঁর বাড়ি, কিংবা ওখানে আছেন পরিস্থিতির চাপে। প্রত্যেক চিঠিতেই সিল্‌ভিন ওই মহিলার সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে লিখতেন। অবশ্য, অবশ্য যাবে! পদল্‌স্ক যেতে হয় মস্কো পেরিয়ে।

সেই সময় ইয়েগরিয়েভ্‌স্ক-মস্কো যাত্রীদের পঁচিশ মাইল দূরের ভস্‌ক্রেসেন্‌স্ক স্টেশনে ট্রেন বদলাতে হত। তারপর ওখান থেকে কলম্‌না হয়ে মস্কো। ইঞ্জিন বাঁশি বাজাল, সাদা বাষ্পের মেঘ ছড়াল, শক্তির পুরোটাই সাধ্যমতো কাজে লাগাল। তবু মনে হল, বগিগুলি যেন অতিকষ্টে শরীর টেনে টেনে চলছে। তিনি ইয়েগরিয়েভ্‌স্ক ছেড়ে চলেছেন। চিরদিনের জন্য। ছোট্ট শহর ইয়েগরিয়েভ্‌স্ক আর শহরতলীর গাঁ — লাপ্‌তেভো, কমারিখা, ওগ্রিজ্‌কভো আর গ্লুখভ্‌স্কয়ে। এসব গাঁয়ের কুঁড়েঘরে থাকে ইয়েগরিয়েভ্‌স্কের সুতাকলের তাঁতিরা।

রেলসড়ক গেছে বনের ভেতর দিয়ে। এইসব পরিচিত জায়গাগুলি দেখে দেখে, বিদায় নিতে নিতে এভাবে চলে যাওয়ায় এক ধরনের সুখ আছে। এই যে এলোমেলো বার্চ গাছ, নিশ্চয়ই তাঁকে বিদায় জানাচ্ছে। তিনি ওদের বললেন: 'আমি চলে যাচ্ছি, তবু আমাকে ছাড়াই তোমরা সুখে থেকো।' কোথাও কোথাও প্রাচীন ফার গাছ সরাসরি রেলসড়কের কাছে এসে উপরে চাঁদোয়া ছড়িয়েছে আর বনের অন্ধকার থেকে সোঁদা গন্ধ বয়ে আনছে। তারপরই আচমকা চোখে পড়ে মাঠ: হেজেল-ঝোপে ঘেরা, ডেইজি

ফুলে রঙিন। মনে পড়ে শরতে বাদাম কুড়ানোর আনন্দঘন দিনগুলি — সরাসরি ঘন ঝোপে গিয়ে সবুজ, কচি, তখনো নরম বাদামের শাঁসে কামড় বসানো!

আবার মনে পড়ল স্কুলের কনসার্ট আর মঞ্চে দাঁড়ান মেয়েটির কথা — চোখে গভীর উজ্জ্বলতা। মেয়েটি অমিশুক ছিল। দৈবাৎ মনের ভাব প্রকাশ করত। হয়ত তার মনের ভেতরে কোন গোপন আগুন জ্বলছিল। কে জানে কোন নাটকীয়, ব্যতিক্রমী ভবিতব্য তার! আবেগপ্রবণ, মুখচোরা স্বভাবের মানুষ আদর্শের জন্য নির্দ্বিধায় জেলে যায়, এমন কি ফাঁসিমঞ্চেও।

ওল্‌গা আলেকসান্দ্রভ্‌নার মনে হল মেয়েটি তার নিজের কথাই বলেছে, বলেছে নিজের ভাগ্যের কথা। 'আর আমি তো সাধারণ মানুষ। আমি সাইবেরিয়া যাচ্ছি কেবল ওকে ভালবাসি বলে। আর কিছু না।'

তিনি মনে মনে তাইগার ছবি আঁকলেন। কিছুক্ষণ আগে পেরিয়ে আসা ঘনঝোপের বনবাদাড়ের চেয়ে নিশ্চয়ই আরও অনেক নিবিড়, আরও ঘনঘোর। তিনি সায়ান পর্বতমালা আর অজানা ইয়েরমাকভ্‌স্কয়ে গ্রামটির চেহারা আঁচ করারও চেষ্টা করলেন, যেখানে মিখাইলের সঙ্গে সংসার পাতবেন, যে-বাড়ি থেকে দেখবেন কঠিন শৈল-শাখা।

'শুধু আমার কাছ থেকে অসম্ভব কিছু আশা কর না, প্রিয়তম আমার। আমি সাধারণ মেয়ে। আমি তোমাকে ভালবাসি। আর এটুকুই সব...'

প্রকৃতির দৃশ্য দেখে দেখে গ্রীষ্মে ট্রেনে বেড়ানোর আনন্দই আলাদা। কখনো গভীর ঘন বনানী, কখনো বুনো ফুল ছড়ান রাই খেত। এসব দেখে দেখে আপন মনে হাসা, স্বপ্ন দেখা আর কল্পিত সমারোহপূর্ণ পুনর্মিলনের ভাবনা।

মস্কো পৌঁছনোর পরদিন সকালেই ওল্‌গা পদল্‌স্ক রওয়ানা হলেন। মিখাইল বসন্তে তাঁকে একটি ঠিকানা জানান। আর এখন গ্রীষ্ম। ঠিকানাটা বদলে গেছে। এখন তাঁর ঠিকানা: 'সিটি পার্ক, ৩ নং বাড়ি।' ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না মনে মনে ঠিকানাটা আওড়ালেন।

নতুন লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না ভালবাসেন। কিন্তু এখন তিনি আগামী জীবনের স্বপ্নে, অস্বাভাবিক পরিবর্তনের চিন্তায় এখন বিভোর। যাঁদের কাছে যাচ্ছেন তাঁদের কথা ভাবনার যথেষ্ট সময় তাঁর নেই। এখন কেবল একটিই ভাবনা: নিজের আর সাইবেরিয়ার। আর মাত্র তিন দিন। তিন দিন পরই সাইবেরিয়ায় যাত্রা শুরু।

ট্রেন থামল। পদল্‌স্ক স্টেশন। দিবাস্বপ্নে তিনি সময়ের খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। স্টেশনঘরটি লম্বা, নীচু, ইট-লাল, সড়কের দিকে অর্ধবৃত্তাকার অসংখ্য জানালার ফোকর, তারপর বন। মূল পদল্‌স্ক হল স্টেশনের ওপর দিকে। শুরুতেই তরুবীথি-ঘেরা সরু পথ। স্টেশনের লাগোয়া ছোট স্কোয়ারটায় ছিল যাত্রীদের

জন্য তিনটি ঘোড়ার গাড়ি। নবাগতা জনৈকা মহিলাকে দেখা মাত্র তিনটি গাড়িই ঘোড়া চালিয়ে তড়িঘড়ি ফটকের দিকে ছুটল। ওল্‌গা সবচেয়ে কাছের গাড়িতেই চাপলেন। গাড়িটা প্রথমে পাথুরে ইট বাঁধানো স্কোয়ারের ওপর দিয়ে গেল, তারপর কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। শহরটি যে ইয়েগোরিয়েভ্‌স্ক থেকে আলাদা, প্রথম দৃষ্টিতেই তা তাঁর চোখে পড়ল। এখানে কোন কারখানা নেই, ধোঁয়ার কুণ্ডলী নেই, শোনা যায় না কারখানার একটানা শব্দ, বাঁশির আর্তস্বর, দেখা যায় না ফটকে মজুরদের ভিড়।

রাস্তার দু'পাশে সারবাঁধা একতলা কাঠের বাড়ি, জানালায় মিস্ত্রিদের কারুকার্য। বাড়িগুলির পেছনে সবজি খেত, তারপর আদিগন্ত মাঠে ওট আর রাই, শেষে গোচারণ ভূমির নিবিড় সবুজ। তাহলে শহরের চত্বরটা কোথায়? আরও দূরে। বলশায়া সেরপুখভস্কায়া সড়কে। দিনরাত ঘোড়ার গাড়ির স্রোত বইছে। মস্কো থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে মস্কোর দিকে। তিনঘোড়ার গাড়িতে যায় বণিকরা, গাড়োয়ানের পাশে বসে শিঙ্গা বাজিয়ে, শিঙ্গা ফুঁকে রাস্তা পরিষ্কার করে। বলশায়া সেরপুখভস্কায়ায় আছে বহু সরাইখানা, শত শত ঘোড়া বদলির ব্যবস্থা, সুঁড়িখানা, চা-খানা, মনিহারী দোকান আর বাজার — এই হল শহরের চত্বর! কিন্তু ওটা তাঁর গন্তব্য নয়। তিনি যাবেন 'সিটি পার্ক', ৩ নং বাড়ি।'

'ভাববেন না, আপনাকে ঠিক ওখানেই নিয়ে যাব!' উল্লসিত গাড়োয়ান বলল। গ্রীষ্মকাল হলেও তার মাথায় গরম টুপি।

গাড়িটা মোড় ঘুরে ধুলিভরা, সরু এক আঁকাবাঁকা রাস্তায় ঢুকল। জাঁকাল নাম তার: 'মহাজন সরণী'। তারপর পার হল এক গভীর উতরাই, পাড়ে অঢেল বুনো ঝোপ। শেষে আঁকাবাঁকা পাথরা নদীর খাড়া তীর বরাবর কিছুটা এগিয়ে পৌঁছল এক বনে: ছায়াঘন, কাকলীমুখর। অঢেল পাখি, কাঠবিড়ালী, ফড়িং, উইঢিপি আর নীলঘণ্টা ফুল।

'সিটি পার্ক', ৩ নং বাড়ি। অপেক্ষা করব?'

দেখা গেল গাড়োয়ানটি রীতিমতো বাচাল। জানেশোনে বেশ। উলিয়ানভদের কথাও শুনেছে।

'জায়গাটা লুকনোর মতো নয়। শহরটা খুবই ছোট, সবাই আপনার সবকিছু জানবে। তাছাড়া পুলিশরা হামেশাই উলিয়ানভদের বাড়ি আসে। যত দেখছি ততই মনে হচ্ছে যে ব্যাটারা আসলে ভাল লোকেরই পিছনে লাগে।'

ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না বুঝতে শুরু করলেন — কেন মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না উলিয়ানভা পদল্‌স্কে থাকেন। তাঁর ছোট ছেলে দ্‌মিত্রি, ছাত্রজীবনেই এখানে নির্বাসিত। এটাই কারণ।

'ওঁদের মা,' গাড়োয়ান তাঁকে জ্ঞান দিতে দিতে বলে চলল, 'চমৎকার, শান্ত স্বভাবের

মহিলা। কিন্তু লোকে বলে তাঁর সবকটি ছেলেই জেলে, নয়ত নির্বাসনে। মায়ের পক্ষে বড়ই কষ্টের। অথচ ব্যাপারটা সত্যি।'

ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না চুপ করে থাকাই সঠিক ভাবলেন। তিনি ওর ভাড়া চুকিয়ে দিলেন। লোকটি যাতে মস্কোগামী ট্রেনে তাঁকে তুলে দেয় ওর সঙ্গে তেমন একটা ব্যবস্থা পাকা করলেন। ৩ নং বাড়ির সামনের বাগানে এলেন শেষে। বাগানের বুক চিরে গেছে হলুদ বালু ছড়ান একটি সরু রাস্তা। ওখানে একটি ফুলের কেয়ারি আর কয়েকটি যুঁই ঝোপ। তিনি বারান্দা পর্যন্ত গেলেন। কোন সাড়াশব্দ নেই। বাড়িটি যেন খালি। সামনের দরজাটা খোলাই ছিল। তিনি ঘরে ঢুকলেন। উলিয়ানভদের বাড়ির সবকিছু সম্পর্কেই এখন তাঁর গভীর কৌতূহল: একটি বিশেষ, ব্যক্তিগত কৌতূহল। তাঁর একটি ছেলে সাইবেরিয়ায় আর অন্যটি...

ঘরটির সাজসজ্জা সাধারণ, অসম্ভব পরিচ্ছন্ন, কোথাও বাড়তি কিছু নেই। ঝুলান বাতির নিচে খাবার টেবিল, টেবিল-ঢাকনি নিভাঁজ, ধবধবে সাদা। একটি দেয়ালে ঘড়ি, পেণ্ডুলামের মন্থর শব্দে উচ্চকিত গাম্ভীর্য। অন্য দেয়ালে একটি ছবি: উত্তর সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়ছে ভিন দেশের উপকূলে। আর আছে একটি পিয়ানো। সাধারণ পিয়ানো। ইয়েগরিয়েভ্‌স্কে তাঁর নিজের পিয়ানোর মতোই। না, ঠিক পুরোপুরি নয়। এটির উপর মোৎসার্টের একটি পার্শ্বছবির হালকা উচ্চাবচ আঁকা: মোৎসার্ট তাকিয়ে আছেন দূর দিগন্তে।

'চমৎকার!' ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না আপনমনে বললেন।

ঠিক তখনই জনৈকা বয়স্কা মহিলা ঘরে এলেন: পরনে কালো পোশাক, মাথায় লেসের সাজ।

'আমরা টেলিগ্রাম পেয়েছিলাম। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। কেমন আছেন ওল্‌গা!'

'আপনি কেমন,' — ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না জবাব দিলেন। গৃহকর্ত্রীর মুখ থেকে তিনি চোখ সরাতে পারছিলেন না। ছোটখাটো, শীর্ণ এই মহিলার এমন কী বৈশিষ্ট্য ছিল যা প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁকে মুগ্ধ করল? তিনি বৃদ্ধা। তাই কি? না, তেমন বয়স্কা নন। কিংবা হতে পারে বয়স্কাই। সুশ্রী? নিশ্চয়ই, খুবই সুন্দরী ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ান, একটুও ঝুঁকে পড়েন নি। চমৎকার লাবণ্যময়ী। মুখটা বড়ই সুন্দর। প্রতিটি অঙ্গই অপরূপ। না, যা এতটা আকর্ষণ করে, সেটা তাঁর সৌন্দর্য নয়। তাহলে? হঠাৎ সেটা ওল্‌গার চোখে পড়ল। তাঁর চুল। বরফ-সাদা চুল। আর দুটি শান্ত চোখ — গভীরে লুকানো নিবিড় বেদনা। তাঁর চেহারায় এমন কিছু আছে যা ব্যতিক্রমী, যা আলোড়ন জাগায়।

'বসুন, বসুন,' মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না বললেন। 'আন্না এখনই আসছে। ভলোদিয়ার জন্যে সে একটা পুটলি গুছোচ্ছে। আমারটা হয়ে গেছে। ক'টা বইও ওকে

পাঠাচ্ছে। প্রায় তিনটে বাজে। আমরা এখন খেতে বসব। মিতিয়া হাসপাতাল থেকে এখনই ফিরবে। মিতিয়া আমার ছেলে, দ্‌মিত্রি ইলিচ। বসুন।'

পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা টেবিলে বসলেন। মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না তাঁর সরু হাতে নিভাঁজ টেবিল-ঢাকনিটা টানটান করে বললেন:

'ভ্লাদিমির ইলিচ চিঠিতে লিখেছে যে আপনি সিল্‌ভিনের কাছে যাচ্ছেন। ওকে আমরা জানি। ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বরে ভলোদিয়া পিটার্সবুর্গে গ্রেপ্তার হওয়ার সময় আমরা মস্কো ছিলাম। সিল্‌ভিন খবরটা জানাতে আসে। প্রথমে নাদিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে আসে। খারাপ খবর নিয়ে আসা সহজ কাজ তো নয়। উল্টোটা হলে আলাদা কথা। যা-জরুরি সেটাই সে বলল। ও খুবই সাহসী। দয়ামায়াও খুব ওর। ওকে দেখবেন।'

ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌নার মনে হল তাঁর গলায় কী একটা যেন আটকে যাচ্ছে। রুমালে মুখ চেপে তিনি কাশলেন। কী চমৎকার সাদা চুল, যেন নতুন তুষার। আর চোখগুলি: শান্ত, হাসিমাখা, তবু এখনো দুশ্চিন্তার আঁচ-লাগা...

'তারপরই সিল্‌ভিন ধরা পড়ল,' একটানা গলায় মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না বললেন। 'তার সঙ্গে অনেক কর্মী। আমাদের নাদিয়াও, নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না।'

'ওকে আপনি ভালবাসেন?' কথাটা হঠাৎ বলে ফেলে ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না নিজেই লজ্জিত হলেন। 'কী বোকা, কী আহাম্মক আমি! অথচ শিক্ষিকা ছিলাম!'

কিন্তু মনে হল না মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না বিব্রত হয়েছেন।

'আমরা সবাই,' তিনি বললেন, 'নিজের চোখেই দেখবেন, কেমন মিলেমিশে আছি। নাদিয়া সম্পর্কে আপনাকে কী বলব... সে খুব সাধারণ মেয়ে নয়। সে যে খুব সুন্দরী, দেখলে চোখ ঝলসে যায় — এসব কিছু নয়। মোটেই নয়। চোখে পড়ার মতো নয়। প্রথমে তাই মনে হয়। কিন্তু তার মধ্যে গতানুগতিক, ছোট কিছু নেই... বুঝলেন তো?'

'বুঝেছি, নিশ্চয়ই...'

'ভলোদিয়ার উপযুক্ত স্ত্রী। আমার ছেলেটি তো সাধারণ নয়, নিশ্চয়ই জানেন। ওরা চমৎকার জুটি। নাদিয়া হল ওর বন্ধু, স্ত্রী, সহকর্মী। তার শিক্ষাদীক্ষা ভলোদিয়ার কাছে খুবই মূল্যবান। খুবই বুদ্ধিমতী, কাজের মেয়ে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও এক। ভলোদিয়ার সঙ্গে যে সে গেছে এজন্যে আমি খুবই খুশি।'

মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না চুপ করলেন। আনমনে টেবিল-ঢাকনির ওপর হাত বুলাতে লাগলেন। ওল্‌গাও নিশ্চুপ। 'কী তার ভবিতব্য? তার কি সইবে এসব?'

'ভাববেন না, ওর মা আসবেন, আপনাকে ভালবাসবেন,' মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না বললেন।

'ও, আপনি কী করে জানলেন?' বিব্রত ওল্‌গার মুখ লাল হয়ে উঠল।

'মামণি, ওখানে তো যাচ্ছেন, অবশ্যই ভলোদিয়া আর নাদিয়ার সঙ্গে দেখা হবে। আমার মন বলছে আপনিও আমার আপনজন, আত্মীয়। আর মন সবই জানে। জানি, আপনার মন এখন ওখানে চলে গেছে, ওর কাছে... আমার স্পষ্ট মনে আছে সিল্‌ভিন যখন খারাপ খবরটা জানাতে এল: দরজায় দাঁড়িয়ে সে লোমের টুপিটা মোচড়াচ্ছিল। ঘাবড়ে গিয়েছিল খুব। কথা বলতে পারছিল না। এত বড় শরীর অথচ মনটা কত নরম! তেমন চালাক-চতুর না হলেও মনের দিক থেকে সে খুবই ভাল, দরাজ...'

মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না হাত দিয়ে টেবিল-ঢাকনিটা সমান করতে করতে নিজের ছেলের বদলে সিল্‌ভিনের কথা বলে চললেন: তার মহৎ উৎফুল্ল স্বভাব ইত্যাদি। ওল্‌গার ইচ্ছে হচ্ছিল মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভ্‌নাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, লম্বা, সরু আঙুল সহ তাঁর ছোট হাতে চুমু খান। ওঁর চোখদুটো কী করে এমন সুন্দর হল?

'প্রায় তিনটে বাজতে চলল,' মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন। 'ওরা দুজনেই খাবার খেতে আসবে। জানি না, আন্না এতক্ষণ ধরে কী করছে।'

• • •

আন্না ইলিনিচ্‌না তখন কাজটা শেষ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। ভ্লাদিমির ইলিচের জন্য অনেক আগেই বই আর সাময়িকীর পুটলি তৈরি হয়ে গেছে। তাঁর দেরি হচ্ছিল অন্য কারণে। শুশেনস্কয়ের জন্য তিনি চিঠি লিখছিলেন সাঙ্কেতিক ভাষায়। খুবই কষ্টকর কসরৎ। ভাই জেলে থাকার সময় কাজটি তিনি ভালভাবে শেখেন। তবু এতেও যথেষ্ট সময় ও চেষ্টার প্রয়োজন হয়। তিনি লিখছিলেন কুস্‌কভার চক্রের খসড়া কর্মসূচি নিয়ে। এটা তিনি জেনেছিলেন কালমিকভার কাছ থেকে, পিটার্সবুর্গে 'রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ' বইটির প্রুফ পড়তে গিয়ে। প্রখোরের কথাও মনে পড়েছিল আন্না ইলিনিচ্‌নার — সেই তরুণ মুদ্রক যে প্রুফ নিয়ে এসেছিল। একবারই শুধু তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। জিজ্ঞাসু, নিরীহ ছেলে ছিল। মজুর হবার পক্ষে একটু বেশি ছেলেমানুষী ভাব। তবে বয়স খুবই কম। আকর্ষণ করার মতো কিছু একটা ওর আছে। স্টেশনে ওকে অনাদরে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য তাঁর দুঃখ হল। ওর সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ যে ভুল, এতে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন। ক্ষতি যা হবার হয়েই গেছে। এখন আর সারানো যাবে না।

বাড়ি ফিরে তিনি মনোযোগের সঙ্গে কুস্‌কভার 'ধর্মমত' (এটাই তাঁর খসড়া কর্মসূচির নাম) আরেকবার পড়েন। যতই পড়েছেন ততই বিব্রত, বিভ্রান্ত হয়েছেন। কী ক্ষুদ্রমনা, কী ভীরু! বস্তুত, এটা এক ষড়যন্ত্র। জঘন্য!

একদা তিনি কুস্‌কভাকে বুদ্ধিমতী ও সৎ মহিলাই ভাবতেন। 'কিন্তু সে তো একদা... ইতিমধ্যে সে এসব গুণাবলী হারিয়েছে। কিন্তু হারাবার কিছু ছিল কি?

সম্ভবত কোনকালেই তার কোন আদর্শ বা সততা ছিল না। এটাই বেশি সত্যি। তার সবই ছিল চাল, খেলা মাত্র।'

সাঙ্কেতিক চিঠিতে আন্না ইলিনিচ্‌না লিখলেন: 'প্রিয় ভলোদিয়া, কুস্‌কভার 'ধর্মমত'-এর প্রাপ্তিসংবাদ জানাবে। এটা পাঠাচ্ছি এজন্য যে তুমি নিজে পড়বে এবং দেখবে ব্যাপারটা শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শের পক্ষে ক্ষতিকর কি না। অবশ্য, আমার কাছে ক্ষতিকরই মনে হয়েছে। শুনেছি, তরুণদের মধ্যে এটা প্রচার করা হচ্ছে। এর বক্তব্য হল — সংগ্রামের প্রয়োজন নেই। অথচ এর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলছে না। জানি না, কারও কিছু করা উচিত কি না। আমাদের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে যথাসম্ভব বিস্তারিত জানাতে চাই বলেই পুস্তিকাটি তোমাকে দিলাম...'

ভ্লাদিমির ইলিচের পক্ষে ব্যাপারটা জানার প্রয়োজন ছিল। ছোটবড় যাবতীয় রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকাটা তাঁর জন্য খুবই জরুরি!

চিঠির সাঙ্কেতিক ভাষা বাছাইয়ের জন্য আন্না ইলিনিচ্‌না ভাইকে পাঠান বইগুলি থেকে সবচেয়ে কম সন্দেহজনক বইটি বেছেছিলেন। অর্থনীতি সংক্রান্ত কিছু প্রবন্ধ ইত্যাদি। এগুলি সবই সেন্‌সর অনুমোদিত। পথে বইটা পুলিশের হাতে পড়লেও কে আরেকবার দেখতে যাবে? তবু যে-কোন কিছুই তো ঘটা সম্ভব? বিশেষত এক তরুণী যখন সাইবেরিয়ায় যাচ্ছে জনৈক নির্বাসিত রাজনৈতিক কর্মীকে বিয়ে করতে। সম্ভাবনা কম থাকলেও হয়ত তার সবকিছু তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করা হবে: বাক্সের প্রত্যেকটি শেমিজ, ব্লাউজ, বইয়ের প্রতিটি পাতা। ওটা কী? অর্থনীতির ওপর কিছু প্রবন্ধ? সেন্‌সরের অনুমতি আছে? রেখে দিন তাহলে। প্রথম পাতায় একটা সরু দাগ — এর তাৎপর্য যার জানা নেই, তার চোখে পড়বে না। একটা সরু দাগ। কিন্তু ভ্লাদিমির ইলিচ সবই বুঝবেন। বইটিতে কিছু একটা খুঁজে দেখার কথা অবশ্যই তাঁর মনে হবে। দ্বিতীয় দাগটি হল একটা পৃষ্ঠার ইঙ্গিত। ছোট ছোট যতিচিহ্ন আর বিন্দু। এগুলির সাহায্যে বুঝন শব্দগুলি বেছে নিয়ে তিনি বোনের চিঠিটা পড়তে পারবেন।

'ঈশ্বর, কী বিশ্রী কাজ!' আন্না ইলিনিচ্‌না বললেন। যতিচিহ্ন আর বিন্দুগুলি শেষ বারের মতো পরখ করে তিনি আরামে শরীরটা টানটান করলেন। এই ঘরটা বেজায় গরম। ছাদটা খুবই নিচু। ভুলে গেলে মাঝারি লম্বা একটি মানুষের মাথাও ছাদে ঠুকে যায়।

* * *

দ্‌মিত্রি ইলিচ মাঝারির চেয়ে সামান্য লম্বা। পড়ার ঘরে ঢুকে তিনি যথাসম্ভব নিজেকে গুটিয়ে, বলতে গেলে হামাগুড়ি দিয়ে একটি কোচে বসে পড়লেন। ওখানে

আছে একটা চেয়ার ও ডেস্ক, একটা কোচ। এর বেশি তিল ধরনের স্থান নেই। তিনি সুপুরুষ। বাড়ির অন্যান্যদের তুলনায় মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্নার সঙ্গে চেহারার মিলটা চোখে পড়ার মতো। বয়স পঁচিশ। চোখমুখ কেমন স্বপ্নমাখা, বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। মস্কোর 'সংগ্রামী লীগের' সদস্য হিসেবে গ্রেপ্তার হওয়ার পর মা তা বিশ্বাস করতে পারেন নি। 'এত অল্প বয়স ওর!'

আলেক্সান্দরের বয়স আরও কম। তিনি অল্প বয়সে ঘরছাড়া। থাকেন পিটার্সবুর্গে, স্বাধীনভাবে। কিন্তু দ্মিত্রি কখনই মায়ের কাছছাড়া হন নি। খুবই বিবেচক, ঘরকুনো মানুষ। তারপরই সরাসরি তাগানস্কায়া জেলখানায়। সেলের দরজায় লেখা: 'রাষ্ট্রের শত্রু'।

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্নাকে আরেকবার যেতে হল জেলের দরজায় ছেলের জিনিসপত্র পৌঁছাতে। কাজটি তিনি কয়েক বারই করছেন। আলেক্সান্দর, আন্না, ভলোদিয়ার জন্য। আর এখন দ্মিত্রিও... জেল থেকে সরাসরি পদল্স্কে। সরকারী আদেশ: ওখানেই থাকতে হবে পুলিশের নজরে। অগত্যা মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্নাকেও আসতে হল পদল্স্কে। ১৮৯৮ সালের সেই বিষণ্ণ শীতের বছর। ভলোদিয়া আর নাদিয়া সাইবেরিয়ায়। আন্নার স্বামী মার্ক, যাঁকে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না সন্তানের মতো ভালবাসেন, যিনি ছিলেন পরিবারের খুঁটি, তিনি রইলেন মস্কোয় কাজের মধ্যে ডুবে, আর তিনি দ্মিত্রির সঙ্গে এলেন পদল্স্কে। পদল্স্কের সবই তাঁদের কাছে অচেনা: সরাইখানা, শুঁড়িখানা, দিনরাত বেনিয়াদের ঘোড়ার গাড়ির অবিরাম ঘরঘর আওয়াজ, বাজার, সবকিছু। এসব এখনো তাঁদের গা-সওয়া হয় নি। মা ও ছেলে, দুজনেরই। এবং আন্নারও। মায়ের প্রয়োজন হলেই আন্না এখানে আসেন।

* * *

'কাজ শেষ। মিতিয়া, সবকিছু গুছাস এবার। তারপর নিচে আয়,' মেঝের উপর বইয়ের বেশ বড়সড় একটি স্তূপ দেখিয়ে আন্না ইলিনিচ্না ভাইকে বললেন। কথায় তৃপ্তির আভাস।

'চিঠি দিয়েছ?' মিতিয়া জিজ্ঞেস করলেন। এতে অবশ্য তাঁর কোনই সন্দেহ ছিল না, কারণ পুঁটলিটা নির্ভরযোগ্য লোক মারফত যাচ্ছে।

'খুঁজে দেখ্,' বোন তামাশা করলেন।

'দেখছি!'

'দরকার নেই, এতে পুরো দিনটাই লেগে যাবে,' অর্থনীতির প্রবন্ধ সঙ্কলনটি ওঁর হাতে দিয়ে আন্না বললেন।

তিনি অনেকক্ষণ ধরে পাতাগুলি দেখলেন।

'এটা কি বাইরের লোকের চোখে পড়ার মতো? আন্না ইলিনিচ্‌না জিজ্ঞেস করলেন।

'দোহাই ঈশ্বর, তা নয়। নিখুঁত করে লুকনো।'

দ্‌মিত্রি হাঁটু গেড়ে বইগুলি বাঁধতে লাগলেন আর আন্না উবু হয়ে বসলেন পাশে।

'সকাল থেকেই মা অস্থির হয়ে আছেন। মনে হয় না রাতে ঘুম হয়েছে,' আন্না বললেন।

'ভলোদিয়ার জন্যে কষ্ট পাচ্ছেন।'

'বিস্কুট, কিশমিশ, যত রকমের সম্ভব মিঠাই ওদের জন্যে জোগাড় করছেন। অথচ তাঁর কষ্ট তো স্পষ্টই মুখে ফুটে উঠেছে। আমরা ধরেই নিয়েছি যে মায়ের মন খুবই শক্ত। কিন্তু এই শক্ত হওয়ার জন্যে কী খেসারতই তাঁকে দিতে হচ্ছে। যদি তাঁর কষ্টের ভাগ নিতে পারতাম, অন্তত অর্ধেকটাও...'

'আন্না, এসব রাখ,' বোনের স্বরে কান্না আঁচ করে কঠিন স্বরে দ্‌মিত্রি বললেন।

'যাকগে, এসব নিয়ে ভেবে আর কী হবে!'

তিনি উঠে ঝুল-বারান্দায় গেলেন। জায়গাটা খুবই ছোট, একটার বেশি চেয়ার রাখার মতো নয়। ওখানে দাঁড়িয়ে ঘরের কাছের ম্যাপ্‌ল্‌ গাছের ডাল ছোঁয়া যায়। আন্না ইলিনিচ্‌না হাত বাড়িয়ে একটা ডাল টেনে তা দিয়ে মুখে বাতাস করতে লাগলেন। ডালটা ছিঁড়ে আনার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। বেচারী মা। পুঁটলি বেঁধে জেলের দরজায় দাঁড়াও, পুঁটলি বেঁধে সাইবেরিয়ায় পাঠাও... সারা জীবন এই তো চলছে।

ভাইবোন মিলে পুঁটলিটা খাড়া সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে রান্নাঘরে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িতে ঢংঢং করে তিনটা বাজল। টেবিল তখন সাজান হয়ে গেছে। চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না ছেলেমেয়ের জন্য অপেক্ষা করছেন।

'আমার মেয়ে আন্না ইলিনিচ্‌না আর ছেলে দ্‌মিত্রি ইলিচ,' ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌নার সঙ্গে ওঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

তিনি বসলেন। অন্যদেরও বসতে বললেন।

হঠাৎ ওল্‌গার মনে হল: 'বাড়িটা পরিচ্ছন্নতা, নিয়মানুবর্তিতা আর শৃঙ্খলার এক আকার বিশেষ।' এবং পরমুহূর্তে: 'লোকজন সব উদার, বুদ্ধিমান আর আকর্ষণীয়।'

তারপর আলোচনা চলল। সাইবেরিয়া আর ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌নার আসন্ন দীর্ঘ পথযাত্রাই মূল প্রসঙ্গ। সাইবেরিয়ায় গিয়ে প্রেমিককে বিয়ে করার ব্যাপারে উলিয়ানভদের কেউ আশ্চর্য হলেন না। তাঁরা এটা স্বাভাবিক ভাবলেন। ভাইবোন

একে অন্যকে বাধা দিয়ে ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌নাকে বলতে লাগলেন ভ্লাদিমির ইলিচ সম্পর্কে যাঁর সঙ্গে সাইবেরিয়ায় তাঁর ঘনিষ্ঠতা হবে।

'মনে আছে, আন্না?'

'মনে আছে মিতিয়া, তুই জেলে থাকার সময় ভলোদিয়া শুশেনস্কয়ে থেকে প্রত্যেকটি চিঠিতে লিখত কীভাবে জেলে থাকতে হয়...'

'আছে, সবই মনে আছে। আমাকে লিখতেন কাজ করতে, পড়াশোনা করতে, নিয়মিতভাবে, কেবল চোখ বুলিয়ে যাওয়া নয়, মনোযোগ দিয়ে।'

'ঠিক বলেছে। আর মা, তোমার মনে আছে, লিখত: মিতিয়া জেলে ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করছে? সকালের ব্যায়াম করছে? মিতিয়া তোর মনে আছে সেই বলে পাঠিয়েছিল? হাঁটু না ভেঙ্গে শরীর নুইয়ে অন্তত পঞ্চাশ বার হাত দিয়ে মাটি ছুতে হবে... ভলোদিয়া নিজে চমৎকার এসব অভ্যেস রপ্ত করেছিল: মন, শরীর, বসবাস, কাজকর্ম সবকিছুর শৃঙ্খলা! সে এসব তোমার কাছ থেকেই পেয়েছে, মা।'

মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না কথা বললেন না। খাবার পর তিনি দোলনা-চেয়ারে বসলেন, হাতদুটি হাঁটুর ওপর, ঠোঁট বন্ধ এবং নিশ্চুপ। যাবার সময় এল। তিনি ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌নাকে বুকে চেপে ধরলেন।

'যান, আমার হয়ে ওদের বুকে জড়িয়ে ধরবেন।'

গাড়ি এসে গেছে। দ্‌মিত্রি ইলিচ গেলেন ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌নাকে ট্রেনে তুলে দিতে। স্টেশন থেকে তিনি আবার নিজের কাজে যাবেন। পল্লীস্বাস্থ্য পরিদর্শকের অফিসের হিসাবরক্ষক তিনি।

গাড়ি চলতে শুরু করল। ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না শেষবারের মতো একবার দেখে নেওয়ার জন্য মুখ ফিরালেন। মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না ফটকে দাঁড়িয়ে। পেছনে দিগন্তগামী সূর্য। তাঁর মুখে বিদায়ের বিষণ্ণ হাসির রেশ।

॥ ১০ ॥

পয়লা আগস্ট। শিগগিরই উত্তুরে হাওয়া শুরু হবে। সোয়ানের উপর তার ক্রুদ্ধ হুঙ্কার শোনা যাবে। সকালে বরফ পড়বে। শরৎ তার প্রথম হিমশ্বাস ফেলবে। এখনো গ্রীষ্ম। গ্রীষ্মের শেষ কয়েকটা দিন। বনের ভেতরে খোলা ভুঁইতে যেখানে ঘাস কাটা হয় নি সেখানে আজও বুনো টিউলিপ, লাইলাক বা লালচে রঙ জংলী তিসি ফুল ফোটে। কিন্তু পিওনি আর নেই। চমৎকার সাইবেরীয় পিওনি, দু-ফুটের মতো উঁচু, ফুল কালচে-লাল, সূর্যের মতো হলুদ তার মধ্যভাগ। ইয়েনিসেই এলাকায় প্রথম বন্যা আসে বসন্তে। গ্রীষ্মে পাহাড়ে বরফ গলার পর ইয়েনিসেই আর

শাখানদীগুলিতে প্রচণ্ড ঢল নামে। বসন্তের বন্যাকেও ছাপিয়ে। আর তখন, দ্বিতীয় বন্যার সময় হল সাইবেরিয়ায় পিওনি ফোটার দিন। গ্রীষ্মের শেষ নাগাদও পিওনির ঝোপে ফুল থাকে। কিন্তু আগস্টেই পিওনির দিন শেষ।

আসন্ন আগস্টের লক্ষণ এখন স্পষ্ট। বনের চেহারা বদলে গেছে। অনেকটা হালকা হয়ে এসেছে। ঝরে পড়া পাতাগুলি পায়ের নিচে মর্‌মর্‌ করে। খাড়া লেজে হাল ধরে বাচ্চা কাঠবিড়ালীরা বিদ্যুতের বেগে এক ডাল থেকে অন্য ডালে ছুটছে। শুশারে ওপরকার সকালের কুয়াসা এখন আরও ঠাণ্ডা। ফুলের উচ্ছ্রয় কমে আসছে। বার্চ পাতার নিবিড় সবুজে হঠাৎ হলুদের আঁচ চোখে পড়ে...

বসন্তের শুরু থেকে বরফ পড়া অবধি সবজি বাগানের কাজে প্রমিন্‌স্কিরা ব্যস্ত থাকেন। বলতে গেলে বাগানটা তাঁদের এক বড় আশ্রয়। এতে ফলে সারা বছরের বাঁধাকপি, আলু, শশা আর পেঁয়াজ। গ্রীষ্মে তাঁরা বন থেকে ব্যাঙের ছাতা কুড়ন, শুকিয়ে, জারিয়ে রাখেন। শীতের সময়টা এতেই চলে যায়। লেওপোল্ড আর তার বাবাকে শিকারও করতে হয়। সব মিলিয়ে আটটি মুখের খাবার যোগাড় করা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। লেওপোল্ডের বাবা জাঁ প্রমিন্‌স্কি খাঁটি শহুরে মানুষ। সবজি চাষে প্রায় অজ্ঞ। কিন্তু শুশেনস্কয়েতে এসে চাহিদার তাগিদে কাজটিতে মনোযোগ দিতে হয়েছে। ভ্লাদিমির ইলিচের ফরমাশে কালমিকভার বইঘর থেকে আসা সবজি-চাষ প্রণালী বইটি তিনি পড়েছেন, এর নিয়মগুলি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছেন। যেমন, এটা পেঁয়াজ খেতে জল দেয়া আর মাটি আলগা করার সময়। সেই সাত সকাল থেকেই লেওপোল্ড জল টানছে। কমপক্ষে চল্লিশ বালতি। কপালের ঘাম মুখে গড়াচ্ছে। বাপ-বেটা এখন মাটি আলগা করতে লাগলেন। লেওপোল্ডের মাথায় বার্ডক ঝোপের পাতা আর উইলো গাছের ডাল দিয়ে সেলাই করে তৈরি টুপি— কাজটা কঠিন, টুপি-কারিগরের ছেলের পক্ষে মানানসই বটে!

লেওপোল্ডের বাবার মনমেজাজ গতকালের মতো আজও ভাল নেই। ভেতর থেকে কী একটা তাঁকে কুরে খাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা লেওপোল্ডের চোখে পড়েছে। উনি অসুস্থ? ঈশ্বর, যেন এটি না হয়। সে যত বড় হচ্ছে, ভ্লাদিমির ইলিচের কাছ থেকে আনা বই যত পড়ছে ততই বাবা সম্পর্কে আরও দুশ্চিন্তা বাড়ছে।

'আমরা লদ্‌জে গেলেই তো পারি! যা হোক নিজেদের বাড়ি তো! দেখলে, ধর্মঘট করে কী ফল হল? গোটা পরিবার এখন নির্বাসনে!' স্বামীর উদ্দেশ্যে লেওপোল্ডের মা বললেন। নিত্যদিনের ধোয়ামোছা, রান্নাবান্না, বাগানের কাজে তিনি তিতবিরক্ত।

'সাইবেরিয়ায় এলে তো তোমারই ইচ্ছায়। নিজের ঈর্ষাকেই দোষ দাও!'

'কী বললে? ঈশ্বর, লোকটা কী বলছে? হায় যিশু! অথচ সে ছিল লদ্‌জের সেরা টুপি-কারিগর।'

এসব অনুযোগ সত্ত্বেও ওঁর সম্পর্কে লেওপোল্ডের মার অশেষ গর্ব ছিল। আর নিশ্চয়ই কেবল সেরা টুপি-কারিগর বলে নয়।

ওয়ারশর জেল থেকে বন্দীদের মস্কো হয়ে পাঠান হত দেশের উত্তরের নানা জায়গায় মেয়াদ খাটার জন্য। মস্কোয় এসব নির্বাসিতদের জন্য নির্দিষ্ট বুতির্স্কায়া জেলে লেওপোল্ডের বাবা পিটার্সবুর্গ 'সংগ্রামী লীগের' জনৈক সদস্যের সঙ্গে একই সেলে ছিলেন। সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত এই গ্লেব ক্র্জিজানভ্স্কি ছিলেন অর্ধেক পোল অর্ধেক রুশী — সুপুরুষ, বুদ্ধিদীপ্ত, উচ্ছল। তাঁর চুটকি শুনে জেল-সঙ্গীরা হাসিতে ফেটে পড়তেন। কিন্তু জাঁ প্রমিন্স্কি পোলিশ গান ধরলেই তিনি গম্ভীর হয়ে যেতেন, বিছানায় বসে দু'হাতে হাঁটু জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে মাথা দোলাতেন। একবার তিনি কাগজ পেন্সিল নিয়ে বলেছিলেন:

'জাঁ, গান করুন!'

জাঁ গান গাইলেন। গান তাঁকে নিয়ে গেল মাতৃভূমি পোল্যাণ্ডে। শুনতে শুনতে গ্লেব তা রুশ ভাষায় অনুবাদে মগ্ন হয়ে আনমনে ভুরু কুঁচকালেন, মুচকি হেসে ঠোঁট বাঁকালেন, কালো বাবরি চুল এলোমেলো করলেন।

> শত্রুতার ঘূর্ণিবাত্যা মোদের ঘিরেছে হন্যে,
> অশুভ শক্তি হানিছে বজ্রবাণ,
> আমরা লড়িব মৃত্যু অবধি সত্য ন্যায়ের জন্যে,
> অজানা ভাগ্য, তবু চির অম্লান...

লেওপোল্ডের বাবা পোলিশ ভাষায় এসব গান গেয়েছিলেন জেলে। আর এখন এগুলি মুক্ত রুশ বিপ্লবীদের মুখে মুখে:

> মুক্তির সংগ্রামে চল
> মেহনতি বন্ধু...

প্রভু যিশুর কাছে অনুযোগ সত্ত্বেও স্ত্রী অবশ্যই তাঁকে ভালবাসেন। ভালবাসেন তিনি এই ধরনের মানুষ জেনেই।

'লেওপোল্ড, তুমি দেখছি ভাবনায় ডুবে আছ, নাকি কানে কিছু শুনতে পাও না?' নিড়ানি মাটিতে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে তার বাবা বললেন। লেওপোল্ডও তাই করল।

'দেখ বাবা, কী চমৎকার কাজটাই না হল। পেঁয়াজগুলো এখন আরও বড়সড় হবে।'

'তা হবে, ভালই হয়েছে...'

লেওপোল্ড বাবার রোদ-পোড়া সরু মুখের দিকে তাকাল। লম্বা গোঁফটুকু ছাড়া মসৃণভাবে কামান। পরিচ্ছন্ন গালে গভীর বলিরেখা।

'কাজটা ভালই হয়েছে,' তিনি পুনরুক্তি করলেন। তারপর একটু থেমে বললেন: 'খুব ভাল...'

'কী খুব ভাল, বাবা?..'

'শরতের মধ্যেই আমার মেয়াদটা শেষ হয়ে যাবে। আমরা আবার ঘরে ফিরব। পেঁয়াজগুলোর ছড়া বানিয়ে দেশে নিয়ে যাব। কাজে লাগবে।'

বাড়ি ফেরা নিয়ে তাঁরা দৈবাৎ কথা বলেন। আগামী শরতের মধ্যেই মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে এ কথা বিশ্বাস করতে তাঁরা ভয় পান।

'কী নিয়ে তুমি এত ভাবছ বাবা? আজকাল তোমাকে খুবই মনমরা দেখায়। আর তো দেরি নেই।'

বাবা কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর হাতে থুথু ছিটিয়ে নিঃশব্দে আবার নিড়ানি তুলে নিলেন। তিনি এতটা ভেঙ্গে পড়েছেন কেন? কীসের এত চাপ তাঁর?

জাঁ কাকা, তেক্‌লা কাকী! লেওপোল্ড, লেওপোল্ড!'

পাশার চেঁচামেচি তাঁরা শুনতে পেলেন। পাশার পরনে নীল ঘাগরা। মাথায় নীলপাড় রুমাল। গলি দিয়ে সে যেন উড়ে আসছিল। পা প্রায় মাটিতে লাগছে না, খড়রঙের বিনুনি বুকে চেপে ধরেছে।

'জাঁ কাকা, বলুন তো কে এসেছে?'

তার নীল ঘাগরা পায়ের কাছের ঘাসগুলিকে ঝেঁটিয়ে দিচ্ছিল। তার ভরা যৌবনের অস্পষ্ট দেহরেখার দিকে লেওপোল্ড তাকিয়ে রইল। সে রোজই পাশাকে দেখে। তবু নীলাক্ষী, রোদে পোড়া, খড়রঙের মোটা বিনুনি মাথায় এই মেয়েটিকে দেখলেই তার বুকে প্রতিদিন তুমুল ঢেউ ওঠে।

'রাণীমা যে...' লেওপোল্ডের বাবা হাসলেন। সোহাগ কাড়ার মতো মানুষ তিনি নন। তার বাবা সৎ, দয়ালু মানুষ।

'আপনি আমাকে রাণী বলেন জাঁ কাকা!' পাশা আস্তিনে মুখ লুকিয়ে হাসল। 'আর আলুর দাগলাগা নোংরা হাত আমার, কখনই পরিষ্কার করতে পারি না। এবার শুনুন, কারা এসেছেন। কল্পনাও করতে পারবেন না। তাঁরা ভ্যাদিমির ইলিচের জন্যে একটা পুঁটলি এনেছেন আর উনি ওটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে পড়ার ঘরে দরজা দেন। তাঁর চিঠিতে এমন কী খবর থাকতে পারে জানি না। তারপর যখন ঘর থেকে বেরুলেন তখন খুশিই দেখাচ্ছিল। হাত ঘষতে লাগলেন। মনে হল খুশি হয়েছেন, আবার রেগেও আছেন। নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভনাকে যেন ইঙ্গিতে বুঝালেন — রাশিয়া থেকে বড় কোন খবর পেয়েছেন। ও, বলতে ভুলেই গেছি, এসেছেন দুজন। ভদ্রলোকটি ভ্যাদিমির ইলিচের বন্ধু। মহিলাটি দেখতে ভালই, ছিমছাম। কিন্তু আমাদের গিন্নিমা আরও সুন্দরী তাকালে মনে হয় যেন ভেতরটাই দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর মতো কাউকে আর হাসতে দেখি না। এই পুঁটলিতে জিনিসপত্রও ছিল। পদলুস্ক থেকে ঠাকুমা

পাঠিয়েছেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন ওখানে আমাদের এক ঠাকুমা আছেন। ওঁর মা। বড় ভাল মানুষ। সবার কথাই মনে রাখেন। কাউকে ভোলেন না, আপনার কাচ্চাবাচ্চাদেরও। আপনার কাছে আমাকে ওরাই পাঠালেন। নিমন্ত্রণ। আরেকটা কথা। ভ্লাদিমির ইলিচ বলেছেন আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

'কথা? কী কথা? অদ্ভুত তো! মামুলী, নাকি... আর দেরি নয়!'

মাটিতে নিড়ানি ফেলে তিনি বাড়ির দিকে ছুটলেন। হাতমুখ ধোবেন।

'কিছুটা অস্থির ধরনের মানুষ,' পাশা বলল।

নিশ্চয়ই তিনি আগামী শরতের কথা ভাবছিলেন। সেজন্যই। শরতেই যে মেয়াদ শেষ তা পাশা জানত না। 'পাশা, আর দেরি নেই, হয়ত...' এই প্রথম ব্যাপারটার এদিকটা লেওপোল্ডের কাছে ধরা পড়ল। ভাবনাটা তাকে অসাড় করে দিল।

'এভাবেই চলে এসো, লেওপোল্ড। তুমি ঠিকই আছ। হাতের কাদাটা নদীতে ধুয়ে নিলেই চলবে,' পাশা বলছিল। 'না, বরং বাড়িই যাও। হাতমুখ পরিষ্কার করে ওই শার্টটা পর, অতিথিরা আছেন।'

সেই শার্ট আসলে খাড়া কলারওয়ালা একটি রুশী লিনেন সার্ট। শীতের সন্ধ্যাগুলিতে অবসর সময় লাল-কালো সুতো দিয়ে তাতে পাশা আড়াআড়ি নক্শা দিয়েছিল। শার্টটা পরলে লেওপোল্ডকে সবচেয়ে ভাল দেখাত, কপাল উজ্জ্বল হয়ে উঠত আর মুখের ভাব ততটা রূঢ় মনে হত না।

'আমি তো এরই মধ্যে বাড়ি গিয়েছিলাম,' পাশা বলে চলল। 'পদল্স্ক থেকে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্নার পাঠান মিষ্টি পৌঁছে দিয়ে এসেছি। আমাদের আবার মাঝপথে অস্কার কাকার ওখানে একটু যেতে হবে। তাঁরও নিমন্ত্রণ। আর উনি যদি শিকারে চলে যান, তাহলে? দুঃখের ব্যাপারই একটা হবে তখন! উনি যেতে পারেন বটে। বাড়িতে তাঁর কী আছে? বিয়ে থা হয় নি এখনো। আর এমন মানুষের বেশি কিছুর তো দরকারও নেই। শীতের জন্যে ভাঁড়ারে কিছু আলু থাকলেই হল!'

পাশার বকবকানিতে লেওপোল্ডের দুশ্চিন্তা কেটে গেল। মনটা হালকা হল। দুনিয়ার সবকিছুই সহজ, স্বচ্ছ হয়ে উঠল। অবশ্য ওকে সে এখনো কিছুই বলবে না। কিন্তু ওঁদের মতো এত বড় পরিবারে আরেক জন! তার বাবা হয়ত...

রাস্তার মোড়ে একটি লোক দেখা গেল। গায়ে ডোরাকাটা কোট, হাঁটছে পা টেনে টেনে। দেখে মনে হয় না লোকটা তেমন নিরীহ।

'সেই মাস্টার!' লেওপোল্ড চিনতে পারল। মুহূর্তে মনের হালকা ভাবটা উবে গেল। তারা পরস্পরকে পছন্দ করে না। লেওপোল্ড ওর দুচক্ষের বিষ। সে ওই মাস্টারটিকে ভয় করে, ঘৃণা করে। তার মনে হয় ওর মুখোমুখি হয়ে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মারাত্মক কিছু করে বসবে। তাই নীল শিরা-আঁকা মোটা নাকওয়ালা ওই বাজে ফুলবাবুটিকে সে যথাসাধ্য এড়িয়ে চলে। রাস্তা থেকে সরে পড়ার কোন

পথ ছিল না। লোকটি আসছিল সোজা লেওপোল্ড আর পাশার দিকেই। সে চলছিল রাস্তার মাঝ বরাবর। বুটে অঢেল ধুলো উড়ছে।

'বড়দের দেখলে নমস্কার করিস না কেন?' মাস্টার বলল।

'হ্যালো স-স্যর, কেমন আছেন?' ওর প্রতি ঘৃণা আড়াল না করে লেওপোল্ড বিদ্রূপ মেশান স্বরে বলল।

'সম্বোধনটা ভালই করলি রে! তোর মতো শেয়ালছানার পক্ষে মানানসই বটে। ভালমানুষ চাষাভূষারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে। অথচ তোরা... তোরা কী যেন বলিস নিজেদের, সমাজতন্ত্রী, তাই না? তোরা ঈশ্বর মানিস না। তোরা নাস্তিক! তোরা বলিস সবকিছু চলবে একজনের হুকুমে। সবাই থাকবে এক ছাদের তলায় আর এভাবে আসবে সাম্য। তাই। অথচ মানুষ আলাদা করেই তৈরি। তারা মোটেই সমান নয়...'

'আপনি সমাজতন্ত্রের কিছুই জানেন না। আপনার সঙ্গে তর্ক করতে আমার লজ্জা হয়!'

'লজ্জা হওয়া উচিত তো সমাজতন্ত্রীদের জন্যে। ওরাই তো মানুষকে নষ্ট করছে। আর পোলরাই হল সব নষ্টের গোড়া। তুই নিজেও তো ওই পাঁচড়া-ধরা পোল। মুখ সামলে কথা বলিস। তোদের বাড় বেড়েছে এখানটায়।'

লেওপোল্ডের মুখ মারাত্মক ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। 'এখন সে হয়ত ভয়ঙ্কর কিছু করে ফেলবে!' ভয় পেয়ে পাশা ভাবল।

'চল, চল, লেওপোল্ড!' ওর হাত ধরে টানতে টানতে পাশা বলল। মাস্টারকে একটি কথাও বলার সুযোগ না দিয়ে সে অনর্গল বকবক করে চলল। ভোদ্‌কার প্রতিক্রিয়ায় মাস্টার টাল খেল। লেওপোল্ড হঠাৎ সামনে এগিয়ে যেতেই পাশা চেঁচিয়ে উঠল: 'দেখছ না ও মাতাল, চেয়েই দেখ!'

বাগানের কাজে শক্ত হয়ে ওঠা ওর হাতটা পাশার হাতে অসাড় হয়ে গেল।

'মন খারাপ করো না, লক্ষ্মীটি। ওর কথা ভুলে যাও!'

লেওপোল্ড তার হাতটা ছাড়িয়ে নিল।

'নিজেই পারব। এখনই নিজেকে সামলে নেব,' আপনমনে সে বলল। অপমানের মুখে মাথা ঠিক রাখার অভ্যাসটি সে নিজে নিজেই রপ্ত করেছে। তাকে 'পাঁচড়া-ধরা পোল' বলেছে। কথাটা ভোলার নয়। কিন্তু এসব একা সে-ই সহ্য করবে। বাবাকে বাঁচানো চাই। তাঁর মর্যাদা অটুট রাখতে হবে। ওই মাস্টার আর সার্জেণ্টের কাছ থেকে লেওপোল্ড কী পেয়েছে সেটা তার বাবা জানেন না। তাদের উৎকট বিদ্রূপের সামনে সে ঠোঁট কোঁচকাতে বাধ্য হয়েছিল। এটা সে আটকাতে পারে নি...

'পাশা, এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্‌নার স্বামী কে জান?'

সে আতঙ্কে ওর দিকে তাকাল। ওর কি মাথা খারাপ? হঠাৎ এসব প্রশ্ন কেন?

এই মুহূর্তে এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্‌নার প্রয়াত স্বামী লেফ্‌টেনাণ্ট ক্রুপ্‌স্কির কথা স্মরণ করা লেওপোল্ডের জন্য খুবই জরুরি ছিল। তাঁর একটি জীবন্ত ছবি এখন ওর বড় প্রয়োজন। সে ছবি আঁকল: কন্‌স্তান্‌তিন ক্রুপ্‌স্কি স্বেচ্ছায় পোল্যাণ্ডে সেনাবাহিনীতে কাজ করতে আসছেন। সামরিক আইন আকাদমি থেকে স্নাতক হওয়ার পর তিনি ওখানকার চাকুরিতে যেতে চান। সেদিন কোন রুশ অফিসারের পক্ষে পোল্যাণ্ডে চাকুরিতে উন্নতি করা খুব সহজ ছিল: এর কিছুদিন আগেই জারের বিরুদ্ধে পোলদের বিদ্রোহ রক্তবন্যায় ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। এর পরই পোল্যাণ্ডের ওপর চাপানো হয় দুর্ভার জোয়াল। অনেকে ভেবেছিল লেফ্‌টেনাণ্ট কন্‌স্তান্‌তিন ইগ্‌নাতিয়েভিচ ক্রুপ্‌স্কি চাকুরির উন্নতির জন্যই পোল্যাণ্ডে এসেছেন এবং শেষ পর্যন্ত জেনারেল অবধি পেঁছবেন।

উলিয়ানভদের গোটা পরিবারই চমৎকার। কিন্তু লেওপোল্ড কেবল ভ্লাদিমির ইলিচকেই বিশেষ শ্রদ্ধা করত। এমন কি উনি অতি সামান্য কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেও সে প্রতিবারই অস্থির হয়ে উঠত। ভ্লাদিমির ইলিচকে খুশি করার জন্য প্রাণপণ করত। সে শুনতে চাইত তিনি বলছেন: 'এই হল গিয়ে সত্যিকার লেওপোল্ড প্রমিন্‌স্কি!' নিজের বিশ্বস্ততা প্রমাণের লক্ষ্যে ভ্লাদিমির ইলিচকে বাঁচানোর জন্য কোন অসমসাহসী কাজ করার সে স্বপ্ন দেখত। ধরা যাক, শহর থেকে ওঁর জন্য পুলিশ এসেছে। ওরা তো গত মার্চ মাসে তদন্তের জন্য এসেও ছিল। হয়ত আবারও আসবে। খোলা বইগুলি তখন শেল্‌ফ থেকে মেঝেতে গড়াবে...

শুশা নদীর পারে উইলো গাছের মর্মর শব্দে অন্য সব আওয়াজ চাপা পড়ে গেছে। ভ্লাদিমির ইলিচের দেয়া পাণ্ডুলিপিগুলি গোপনে কোথাও মাটি-চাপা দিতে হবে। লেওপোল্ড ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে। তার মাথার ভেতর তখন কে যেন প্রচণ্ড জোরে হাতুড়ি পেটাচ্ছে — কোন উন্মত্ত পেণ্ডুলাম কপালে অবিরাম ঘা দিয়ে চলেছে। আসলে এসবই রক্তের দাপাদাপি। তারপর জুতোর মচমচ আওয়াজ। কী? কে যেন ঝোপঝাড় ভেঙ্গে এগিয়ে আসছে। মাথার ওপর একটি তলোয়ার ঝলসে উঠল। কোপ নামছে। 'মেরো না আমাকে! আমি মরতে চাই না!' — 'মুখ খোল তাহলে!' — 'না, বলব না, কখনো!'

এক সময় লেওপোল্ডের স্বপ্নে, কল্পনায় কেবল ভ্লাদিমির ইলিচই অনুক্ষণ মূর্ত হতেন। কিন্তু ইদানীং তার ভাবনায় আরেকজনের ছায়া পড়েছে: এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্‌না। কিছুদিন আগেও সে ওঁর অভ্যস্ত বিদ্রূপ-মেশান কথা শুনতে ভয় পেত, তাঁর ঠাট্টায় আহত হত। এসব খুব বেশি দিনের কথা নয়। আর এখন... একদিন সে তাঁর মুখে নিজের জীবনের কথা, অল্প বয়সের কথা, স্বামী কন্‌স্তান্‌তিন ক্রুপ্‌স্কির কথা শুনল। এবং তখন থেকেই...

* * *

পোল্যাণ্ডের কোন এক মহকুমার ভার পেয়ে কন্‌স্তান্‌তিন ক্রুপ্‌স্কি যখন কর্মস্থলে আসেন তাঁদের মেয়ে নাদিয়া তখন খুবই ছোট। চাকুরির খবর শোনার পর এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্‌না স্বামীর কাঁধে হাত রেখে সরাসরি মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিলেন: 'শোন, আমি কিন্তু সবকিছুতে সব সময় তোমার কাছেই থাকব।'

তিনি স্ত্রীর হাত সরিয়ে ওতে চুমু খেয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মাথা নুইয়ে জানালেন তথাস্তু।

'বীর বটে। জানতাম না যে সেনকেভিচের উপন্যাসের কোন নাইটকে বিয়ে করেছি।'

'তোমার নাইটের মতামত অবশ্য কিছুটা আলাদা,' উনি বললেন।

জারের আমলারা পোল্যাণ্ডের ওই শহরটিতে নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাত। শহর-চত্বরে অবিরাম কানফাটা শব্দে ঢাক পিটিয়ে ইচ্ছেমতো ভোরবেলায় লোকজনকে জাগানো হত। কী হচ্ছে জানার জন্য সবাই ওখানে ছুটত। নারী, পুরুষ, শিশু, দোকানী, পাদ্রি সবাই। দেখা যেত, বুড়ো ইহুদিদের চত্বরে তাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। কেউ বাধা দিলে পিঠমোড়া অবস্থায় তাকে হেঁচড়ে নিচ্ছে আর ঢাক পিটানোর সঙ্গে ওদের জুলফি কাটা চলছে।

একদিন এই ধরনের অনুষ্ঠানের মাঝখানে ঘোড়া ছুটিয়ে এলেন লেফ্‌টেনাণ্ট ক্রুপ্‌স্কি। রিভলবার থেকে শূন্যে গুলি ছুঁড়ে হাঁকলেন:

'ঢুলীরা থাম! ঘুরে দাঁড়াও! মার্চ, জলদি চল! আর কোনদিন যেন এসব না দেখি!'

হয়ত ঘটনাটা হুবহু এমনটি নয়। হতে পারে তিনি গুলি ছোঁড়েন নি। কিন্তু লেওপোল্ড ঘটনাটিকে এভাবে ভাবতেই ভালবাসে। তাঁকে সে গৌরবের চুড়োয় রাখতে চায়। ঘোড়া ছুটিয়ে শহর-চত্বরে তাঁর আসাটা লেওপোল্ডের পছন্দসই। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পায় তাঁর ঘোড়া পেছনের পায়ে ভর দিয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠছে। লম্বা লেজের ঘায়ে পথের নুড়ি ছিটোচ্ছে।

জারশাসিত পোল্যাণ্ডে এই ধরনের ভালমানুষ অফিসার খুব বেশি ছিল না। ঘুসখোর অফিসারদের ক্রুপ্‌স্কি নির্বিচারে বরখাস্ত করতেন। পোলদের উপর কোন অপমানসূচক আচরণ তাঁর সহ্য হত না। একবার পোলিশ কবরখানাগুলির বেড়া তুলে দেয়ার হুকুম দেয়া হয় এবং ফলত শুয়োরের পাল কবরগুলি খুঁড়ে সবকিছু তচনচ করে দেয়। বুড়োরা এই কুকর্মীদের অভিশাপ দিত। মেয়েরা চোখের জল ফেলত। সরকার উদাসীন থাকত। ঠিক তখনই ব্যাপারটা লেফ্‌টেনাণ্ট ক্রুপ্‌স্কির নজরে আসে। কবরখানাগুলি আবার ঘিরে দেয়ার তিনি হুকুম দেন।

ক্রুপ্‌স্কি সম্পর্কে পোলরা বলাবলি শুরু করে: 'উনি অন্য সব রুশ অফিসারদের

মতো নন। তিনি পোলদের মানুষের মতোই দেখেন। আমাদের মানসম্মান বাঁচাতে চান।'

কিন্তু রুশ সরকার ক্রুপ্‌স্কি ও তাঁর তথাকথিত নিন্দনীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করত।

তৎকালীন প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল: পোলদের ভাষা জানার কোন দরকার আমাদের নেই, পোলরাই রুশ ভাষা শিখুক। কিন্তু ক্রুপ্‌স্কির মত হল: পোল্যান্ডে কর্মরত বেসামরিক ও সামরিক রুশ কর্মচারীদের জন্য পোল ভাষা শিক্ষা আবশ্যকীয়!

তিনি নিজে স্থানীয় বাসিন্দাদের মতো পোল ভাষা বলতেন। এবং তাঁর মেয়েটিও। তিনি কী চমৎকারই না মাজুরকা নাচতেন। পোলদের চেয়েও ভাল।

স্মৃতিকথার এই পর্যায়ে ভ্লাদিমির ইলিচ আপত্তি জানাতেন:

'এটা বাড়াবাড়ি, এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্‌না। সত্যি! পোলদের মতো হলেই তো তাঁকে সেরা নাচিয়ে বলা যায়!'

কিন্তু এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্‌না অনড়।

'মাজুরকার ব্যাপারে রায় দেয়ার লোক কে, আমি তো? তাঁর সঙ্গে কে নাচত মনে কর?'

স্বভাবতই এখানে ভ্লাদিমির ইলিচকে হার মানতে হত। এমন যুক্তি অকাট্য বৈকি।

অচিরেই পোল্যান্ডে ক্রুপ্‌স্কির চাকুরির মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। অভিযোগ: তাঁর কার্যকলাপ রুশ সরকারের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। তিনি অভিযুক্ত হলেন। দশ বছর ধরে তাঁর অপরাধের তদন্ত চলে। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে শেষ পর্যন্ত সিনেট তাঁকে নির্দোষ ঘোষণা করে...

* * *

এঙবার্গের কাছে পাশা গিয়েছিল একা, ফিরল লেওপোল্ডকে নিয়ে। তাঁর মুখ থেকে অবিরাম কথার ফুলঝুরি ছুটছে:

'অস্‌কার কাকা দাড়ি কামাচ্ছেন, তারপর টাই পরবেন। আমাদের অপেক্ষা না করতে বলেছেন। প্রস্তুত হলেই এসে পড়বেন। ভাগ্য ভাল যে, তাঁকে পাওয়া গেল। জান, সকালে শিকারে গিয়ে ঝুড়ি-ভর্তি বুনো হাঁস নিয়ে ফিরেছেন। আর হাঁস নিয়ে কী হৈচৈ! কিন্তু আমার কাছে বুনো হাঁস কিছুই না। আমি তো রাজহাঁসই কত দেখেছি। লেওপোল্ড, তুমি আমাকে অতিথিদের কথা জিজ্ঞেস করছ না কেন? সত্যি বলছি, তুমি বড় দেমাকী। জানতে চাও না কেন? থাকগে, আমিই বলছি। সিল্‌ভিন, সেই সিল্‌ভিন।'

'সিল্‌ভিন? আর খবরটা সারাক্ষণ চেপে রেখেছ!'

কোণাকুণি পথে যথাসম্ভব দ্রুত তারা উলিয়ানভদের বাড়ির দিকে ছুটল। রোজকার মতো জেনি বারান্দায় সানন্দ চিৎকারে তাদের অভ্যর্থনা জানাল। বারান্দার সিঁড়িতে বসেছিল মিৎকা, উলিয়ানভদের প্রতিবেশী আরেক নির্বাসিতের ছেলে। বছর ছয়েক বয়স। ছেলেটি ফ্যাকাশে, রুগ্‌ণ — ঝড়ের মুখে শীর্ণ বোঁটার ওপর কোনক্রমে টিকে থাকা একটি বিবর্ণ ফুল। হাতের পিঠেটা কামড়াতে তার সারা হচ্ছিল, তাই চুষে চুষে সে রস খাচ্ছিল।

'তোমাদের দেরি হয়ে গেছে!' পাশা ও লেওপোল্ডকে সে বলল। 'ওঁরা উপহারগুলোর সবকটিই বিলি করে দিয়েছেন। আমি পেয়েছি এই পিঠে আর একবাক্স রঙপেন্সিল। তোমাদের জন্যে কিছুই আর নেই।'

'তুই ব্যাটা ক্ষুদে মিথ্যুক,' পাশা জবাব দিল।

তারা প্রথমে রান্নাঘরে ছুটে গেল। শেষে এল খাবার ঘরে। তারপরই লেওপোল্ড নিজেকে সঁপে দিল সিল্‌ভিনের ভাল্লুকী আলিঙ্গনে।

'হ্যালো, হ্যালো! হা ঈশ্বর, কত বড় হয়ে গেছ দেখছি! প্রায় এক মাথা লম্বা। হাতের বাইসেপ্‌স্‌ দেখি তো। এঙ্গেলস পড়া শেষ হল? গতবার আমি থাকার সময় ভ্লাদিমির ইলিচ তোমাকে তাঁর একটা বই দিয়েছিলেন। শেষ করেছ সেটা? তবে তোমার পেশীগুলো তেমন বাড়ছে না। একটু বাড়ানো দরকার।'

তিনি তাঁর রূপসী স্ত্রীর দিকে ফিরলেন। স্বাভাবিক কৌতূহলের কাছে ওঁর লজ্জা তখন হার মানছে।

'ছেলেটিকে ভাল করে দেখ। আমাদের প্রথম সাক্ষাতেই ও সবার সামনে ঘোষণা করেছিল যে তুমি আমার কাছে আসছ। তার অন্তর্জ্ঞানই তাকে একথা বলেছিল। আমার আর কী করার ছিল? তাড়াতাড়ি তোমার কাছে প্রস্তাব দেয়া, আর ঠিক তাই করলাম।'

'আমার জন্যে আপনি এত বড় একটা কাজ করেছেন অথচ আপনাকে চিনিই না,' লেওপোল্ডের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না বললেন।

'এই যে জাঁ লুকিচ এসেছেন!' ভ্লাদিমির ইলিচ ঘোষণা করলেন।

লেওপোল্ডের বাবা ঘরে এলেন। অদ্ভুত, তিনি অন্য কারও দিকে প্রায় না তাকিয়েই সরাসরি ভ্লাদিমির ইলিচের কাছে গেলেন।

'উত্তর এসে গেছে, তাই না?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

তাঁর চোখে ভয় ও আশার আভাস। ভ্লাদিমির ইলিচ যেন কিছুটা বিব্রত হলেন।

'ডাকের ব্যাপার-স্যাপার ঢিমে-তেতালায় চলছে!' তিনি বললেন। 'আবার এমনও হতে পারে যে কর্তৃপক্ষই দেরি করছে। তবে যেমনই হোক একটা ফয়সলা হবেই। একটু ধৈর্য ধরে থাকুন। যতটা পারেন। তাই করুন, জাঁ লুকিচ। কোন অবস্থাতেই

আপনার চিঠির জবাব ওরা না দিয়ে পারবে না। এতে আমার কোন সন্দেহ নেই।'

বাবা মলিন হাসি হাসলেন। মনে হল তিনি হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছেন। এবার তিনি সিল্‌ভিনদের দিকে ফিরলেন, মাথা নোয়ালেন।

'ব্যাপারটা কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ভ্লাদিমির ইলিচ?'

'খুবই গুরুত্বপূর্ণ! খুবই। কিন্তু আপনার ব্যাপারে আরও একটু অপেক্ষা করা যাক। কী বলেন জাঁ লুকিচ...'

ভ্লাদিমির ইলিচ, সিল্‌ভিন, লেওপোল্ডের বাবা, নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না আলোচনার জন্য পড়ার ঘরে গেলেন।

'আর আমরা, পার্টির বাইরের সবাই যাব বাইরে, প্রকৃতি দেখতে,' ওলগা আলেক্‌সান্দ্রভনাকে লক্ষ্য করে এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্‌না বললেন। উনি তাঁকে সবজি বাগান দেখাতে নিয়ে গেলেন।

লেওপোল্ড জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সামনে ছোট্ট লনটি দেখতে লাগল। এখানে গাড়ি ঘোড়ার ঝামেলা খুবই কম। লনের ঘাস পায়ের চাপে ধামসে যায় নি, লনটি এখনো চমৎকার সবুজ। কী চিঠি নিয়ে ওঁরা কথা বলছিলেন? কার কাছে লেখা? তার বাবা কী শোনার অপেক্ষায় আছেন? কী জন্য তিনি ভয় পাচ্ছেন? চিঠিটা সম্পর্কে বাড়িতে উনি নীরব কেন? ব্যাপারটা নিজের বড় ছেলের কাছেও গোপন রাখা কেন? তাঁর এত দুশ্চিন্তা কেন?

॥ ১১ ॥

অস্‌কার এঙবার্গ আসাতেই লেওপোল্ডের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। দেরি হওয়ার জন্য তিনি মাপ চাইলেন। তাঁর পক্ষে দাড়ি না কামিয়ে, ইস্ত্রি-ছাড়া শার্ট পরে আসা অসম্ভব। এসব কাজেই তাঁর দেরি হয়ে গেছে। সুন্দর চুলে সিঁথি কেটেছেন যেন স্কেল দিয়ে। গোঁফও চমৎকার ছাঁটা। শক্ত চোয়াল নিটোল পরিচ্ছন্ন।

ঠিক তখনই ভ্লাদিমির ইলিচ পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

'দেরি কেন, অস্‌কার? সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'সকালে কী চমৎকার শিকারই না জমেছিল ভ্লাদিমির ইলিচ! পেরোভ হ্রদ বলতে গেলে হাঁসে বোঝাই...' এঙ্‌বার্গ শিকারের দীর্ঘ বিবরণী দিতে দিতে শেষে ভ্লাদিমির ইলিচের অনাগ্রহ লক্ষ্য করে থামলেন — মনে হল এই মুহূর্তে তাঁর মন বুনো হাঁস থেকে বহুদূরে। অস্‌কার প্রায় নিঃশব্দে পড়ার ঘরের দিকে এগিয়ে চললেন।

ভ্লাদিমির ইলিচ গভীর মনোযোগে লেওপোল্ডের দিকে তাকিয়ে শেষে বললেন:

'ব্যাপারটা তোমারও জানা দরকার। খুবই কাজে লাগবে। বন্ধুরা, হেলাফেলায় আর সময় নষ্ট নয়!'

প্রতিদিনের দেখা লনের দিকে গুম হয়ে তাকিয়ে লেওপোল্ড কেবল যে চিঠির কথাই ভাবছিল তা সত্য নয়। যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও সে কিছুতেই আঘাতটা হজম করতে পারছিল না: 'তাঁরা ওর মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। সে পার্টি-সদস্য নয় বলেই? ইদানীং কে 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার' এমন তন্নতন্ন করে পড়েছে? প্রথম থেকে শেষ পাতা অবধি। বইটা তার মুখস্থ। কে ওটা প্রথম পড়েছে? সে, না এঙ্‌বার্গ? ধরা গেল এঙ্‌বার্গ পিটার্সবুর্গের পুতিলভ কারখানায় মজুর। কিন্তু সে তো বয়সে অনেক বড়। আর কম বয়সের জন্যই তো লেওপোল্ডের এই সুযোগ জোটে নি। কিন্তু সেও মজুর হবে। অবশ্যই। একমাত্র এঙবার্গই কি বিপ্লবী হতে চায়? আর কেউ না? লেওপোল্ডও চায়। ওঁরা যেন না ভাবেন যে অল্পবয়সী বলে সে নিজের মন বোঝে না।'

ভ্লাদিমির ইলিচ তাকে বৈঠকে আসতে বলার সঙ্গে সঙ্গে সে দেশলাই কাঠির মতো জ্বলে উঠল। সারা সকাল হাঁস শিকারে কাটানোর জন্য অনুশোচনার ভাব দেখিয়ে অস্‌কার এঙবার্গ যেভাবে নিঃশব্দে পড়ার ঘরে ঢুকেছিলেন সেভাবে লেওপোল্ড গেল না। সে সশব্দে এমনভাবে ছুটে গেল যেন শত্রু তাকে তাড়া করেছে। তারপর তড়িঘড়ি বইয়ের শেল্‌ফের আড়ালে দাঁড়াল এই ভয়ে যে শেষকালে ভ্লাদিমির ইলিচ তাকে ওখানে না রাখাই ভাল — এমন কিছু বলে বসেন।

লেওপোল্ডের মুখের খেপাটে ভাব দেখে নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না হেসে বললেন:

'লেওপোল্ডকে ডেকে ভালই করেছ। পিটার্সবুর্গে মজুর চক্রে ওর চেয়ে কমবয়সী কর্মীও আমাদের ছিল।'

'যখন আমি পুতিলভ কারখানায় কাজ করতাম...' এঙবার্গ শুরু করলেন। যে কাহিনীটি বলার সুযোগ এঙবার্গ কখনই হারাতেন না তা হল এই যে তিনি পিটার্সবুর্গের পুতিলভ কারখানায় কাজ করার সময় ভ্লাদিমির ইলিচ ওখানে নিকোলাই পেত্রভিচ ছদ্মনামে শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতেন আর শ্রমিকরা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করত। শেষে ভাগ্য তাঁদের আবার শুশেনস্কয়েতে মিলিয়েছে। ভ্লাদিমির ইলিচ আসার কিছুদিন পর এঙ্‌বার্গ এখানে নির্বাসিত হন। তার এক বছর পর আসেন নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না। এঙবার্গ তাঁদের বিয়ের আঙটি তৈরি করেছিলেন তামার পাঁচ কোপেক দুটি গলিয়ে। এই অন্তহীন কাহিনী তিনি অনর্গল বলে যেতেন। তবে আজ আর তেমন সুযোগ মিলল না।

'বন্ধুগণ, কাজ শুরু হোক!' তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁর উঁচু টেবিলটির কাছে গেলেন। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি লেখেন। টেবিলটি সামান্য
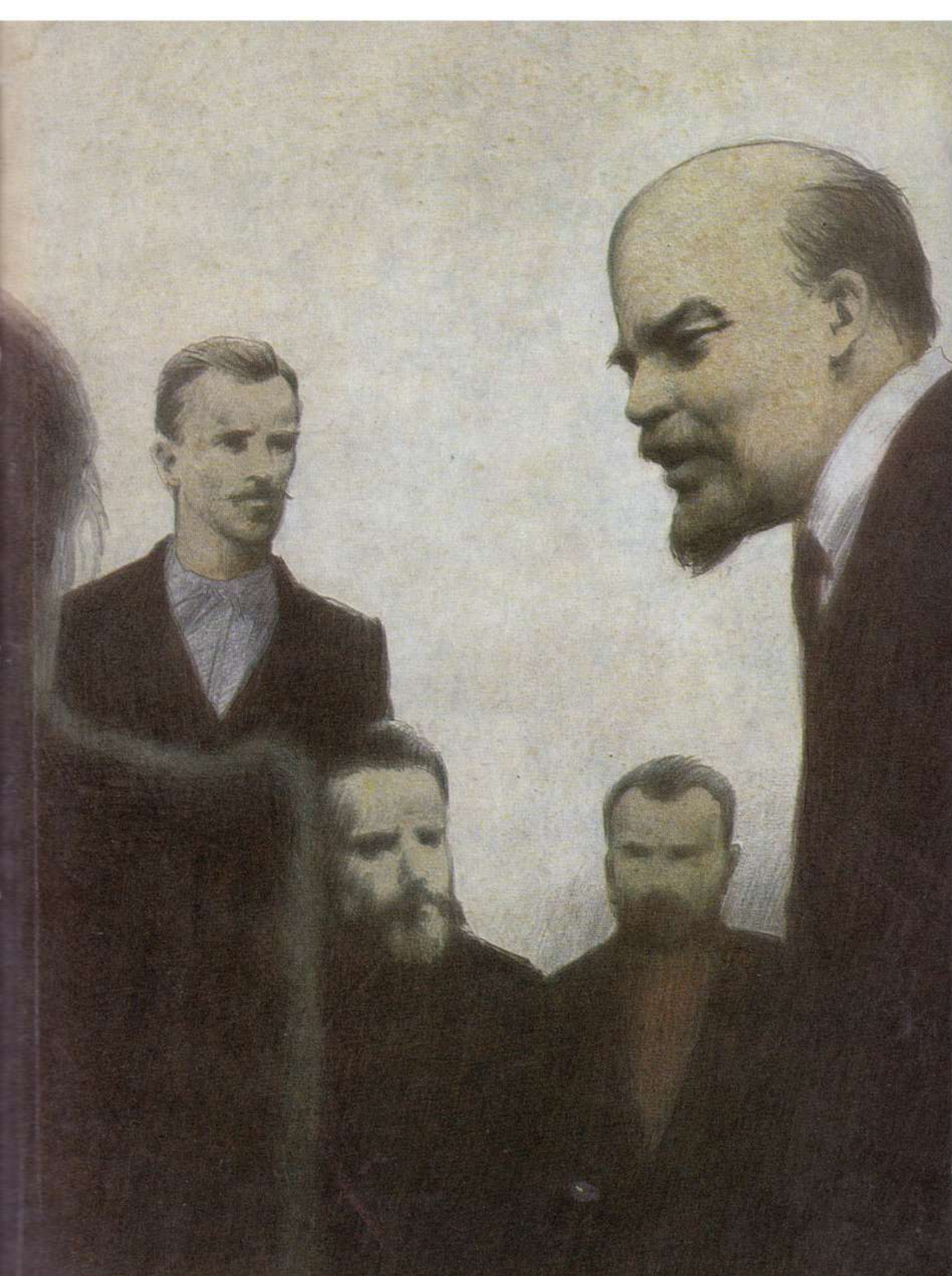
ঢালু, পেছনে এক ধরনের রেলিং। লেওপোল্ড এমন টেবিল আগে আর দেখে নি। সবুজ শেড-ওয়ালা একটি বাতি রেলিং-ঘেঁষে রাখা — ভ্লাদিমির ইলিচের জন্য নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্নার উপহার। এনেছিলেন সেই দূর মস্কো থেকে। তিনি এখানে পৌঁছন গোড়ায় ট্রেনে, তারপর জাহাজে আর শেষ পঞ্চাশ মাইল মিনুসিন্স্ক থেকে শুশেনস্কয়ে অবধি, ঘোড়ার গ্যাড়িতে দোল খেতে খেতে, বাতিটি হাতে নিয়ে। অটুট অবস্থায়ই এনেছিলেন। শীতের দিন, লোকজন আগেভাগেই ঘুমিয়ে পড়ে। কেবল ব্যতিক্রম উলিয়ানভদের বাড়ি: সেখানে সবুজ শেডের বাতি জ্বলে শেষ রাত অবধি।

ভ্লাদিমির ইলিচের ঘরে লেওপোল্ডের সবচেয়ে পছন্দ হল বইয়ের শেল্ফ। আসলে ওখানে সে ইচ্ছেমতো যেতে পারত না। অবশ্য কোন বই খুঁজতে এলে ভিন্ন কথা। কোন কোন সময় ভ্লাদিমির ইলিচ নিজেই তার জন্য বই পছন্দ করে বলতেন: 'এটা তোমাকে পড়তেই হবে। আমার মতে...'

জানালা থেকে শুশা নদী চোখে পড়ে। বাঁক ঘুরে নদীটি বাড়ির পাশ কেটে গেছে। ওপারের মাঠগুলিতে অনেক দিন আগেই লাঙ্গল দেয়া হয়েছে। এখন সেগুলি আবার শরতের সবুজ ঘাসে ঢাকা পড়েছে। ওইসব মাঠের শেষে ইয়েনিসেই আর ফিতের মতো ছড়ান তার খালগুলি। আরও দূরে সায়ান পর্বতমালা। চাঁদোয়ার মতো ধূসর-বেগুনি মেঘ শৈলশিরার উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে, ছড়িয়ে পড়ছে পাহাড়ের গা বেয়ে, যেন ছেঁড়া পোশাক, সবকিছু অন্ধকারে ঢাকা পড়ছে। তারপর হঠাৎ আসা দমকা হাওয়া মেঘগুলিকে পাহাড়ের ওপারে তাড়িয়ে নিয়ে যায় আর তখন দেখা দেয় তুষার-ধবল গিরিচূড়া, আলোকোজ্জ্বল এবং সবকিছু কী আশ্চর্য, উচ্ছল...

'বাড়ি ফেরার পরও আমি কোন দিন ভুলব না এই ঘর, ওই উঁচু টেবিল, বইগুলি, আর এই জানালা, যেখান থেকে দেখা যায় পাহাড়, শুশা আর চরগুলি... কী হল আমার? আহাম্মকের মতো দিবাস্বপ্নের জাল বুনছি? ভ্লাদিমির ইলিচের কথাগুলির একটিও কানে যাচ্ছে না!'

কিন্তু সে কিছুই হারায় নি। ভ্লাদিমির ইলিচ সবে একটি বই হাতে নিয়ে কেবল পাতা ওল্টাচ্ছেন।

'বন্ধুগণ, আমরা যে এখানে মিলেছি এটা খুবই চমৎকার। মিখাইল আলেক্সান্দ্রভিচের আগমনের কল্যাণেই আপনাদের একটি বিষয় আলোচনার জন্য ডাকা সম্ভব হয়েছে। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ! এই চিঠিতে আমাদের জন্য খুবই কৌতূহলজনক কিছু বিবৃতি ও সংবাদ রয়েছে।'

লেওপোল্ড ভাবল: 'চিঠিটা কোথায়?' কিন্তু কিছুই সে জিজ্ঞেস করল না, কেবল ভুরু কোঁচকাল।

'ওটার একটা সারমর্ম লেখার মতো সময় আমি পাই নি। তাই এর মূল বক্তব্যটাই আপনাদের বলছি,' ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন।

লেওপোল্ড রোমাঞ্চিত হল। নিশ্চয়ই অতি গোপনীয় কিছু। সাঙ্কেতিক ভাষায় পদলস্ক থেকে বইখানার ভেতরে লেখা বোনের বক্তব্য সম্পর্কেই ভ্যাদিমির ইলিচ বলছিলেন, বলছিলেন পিটার্সবুর্গে কুসকভা চক্র ভাবাদর্শ সম্বন্ধে।

'সংক্ষেপে, তারা হল মজুরদের রাজনৈতিক পার্টির বিরুদ্ধে। বিপ্লবে ওদের আস্থা নেই। প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা দখলের সামর্থ্য সম্পর্কে তারা অবিশ্বাসী। সমাজতান্ত্রিক সমাজেও তাদের অনাস্থা। অতএব?'

ভ্যাদিমির ইলিচ ঝট করে বই বন্ধ করে টেবিলে রাখলেন। ওটাই তাঁর উল্লিখিত 'ধর্মমত'-এর সারমর্ম। তিনি কাঁধ ঝাঁকালেন। হাতদুটো পকেটে রাখলেন। চোখে তীক্ষ্ম, শীতল দীপ্তি ফুটল। এমনটি লেওপোল্ড কখনো দেখে নি: দুরধিগম্য, তুষারশীতল, ক্রুদ্ধ।

লেওপোল্ডের উত্তেজনা বাড়ছিল। কিন্তু যথাকর্তব্য সম্পর্কে তার কোনই ধারণা ছিল না। কিভাবে 'ওদের' জবাব দেয়া যায় তাও জানত না। উপস্থিতদের কথা শোনার জন্য সে অধীর হয়ে উঠছিল। সে চায় তার বাবাই আগে বলুন। না, তিনি চুপচাপ থাকতেই ভালবাসেন। হতে পারে, এতে তাঁর বলার মতো কিছু নেই।

অথচ কী অদ্ভুত! তিনিই বললেন। খুবই সংক্ষেপে। সংক্ষেপে, স্পষ্টভাবে বলাই তাঁর অভ্যাস।

'ওরা শ্রমিক আন্দোলনকে শূন্যের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে চায়।'

'ঠিক তাই!' কণ্ঠস্বরের ব্যগ্রতায় মনে হল ভ্যাদিমির ইলিচ এমন কিছু শোনারই অপেক্ষায় ছিলেন। 'ঠিক তাই! ওরা কী চায়? শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী লক্ষ্য নস্যাৎ করাই ওদের উদ্দেশ্য।'

'জাহান্নমে যাক ব্যাটারা!' বললেন এঙবার্গ। 'মাপ করবেন আমাকে।'

এঙবার্গ ফিনল্যাণ্ডের মানুষ। রুশ ভাষা তিনি ভাল জানেন না। তবে দিব্যি দেয়ার জন্য রুশ ও ফিন্ ভাষায় তাঁর সমান দখল।

পুতিলভ কারখানায় গোপন বৈঠক ভাঙ্গতে আসা পুলিশ আর রাজনীতি নিয়ে আলাপরত মজুরদের শাপশাপান্তকারী ফোরম্যানের উদ্দেশ্যে হামেশাই এই শব্দাবলী ব্যবহার করে বলে এঙবার্গকে বারবারই ক্ষমা চাইতে হয়। এই ধরনের জনৈক স্বেচ্ছাসেবী-গোয়েন্দাকে মারাত্মক রকমের ঠাণ্ডা জলে চোবানোর কাজে শরিকানার জন্যই তাঁকে সাইবেরিয়ায় চালান দেয়া হয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বৈপ্লবিক লক্ষ্য থেকে কেউ মজুরদের সামান্যও হটাতে পারে নি। জাহান্নমে যাক!

'ঠিক এই চেষ্টাই ওরা করছে,' বললেন ভ্যাদিমির ইলিচ। 'যাতে মজুররা ওই পথ চিরদিনের জন্যে ছেড়ে দেয়। যাতে ওর কোন চিহ্ন, ছিটেফোঁটামাত্র না থাকে। ওরা চায় মজুররা বুর্জোয়াদের গোলাম হয়ে ওঠে। পুঁজিপতি মহাশয়রা! আমাদের দয়া করুন, সম্ভব হলে শ্রমিক শ্রেণীকে একটু করুণা করুন প্রভু! তারা চায় মজুররা

রাজনীতি, বৈপ্লবিক লড়াই বেমালুম ভুলে যাক। এটাই ওদের উদ্দেশ্য। আমরা চুপ করে থাকব না! অবশ্যই না! নির্বাসনে থাকলেও না।'

ঘরে পায়চারি করতে করতে ক্রুদ্ধ স্বরে তিনি বলতে লাগলেন।

'যথাকর্তব্য এখনই জানা যাবে,' লেওপোল্ড ভাবল। 'পায়চারি শুরুর অর্থই হল নতুন কিছু উদ্ভাবনের আর দেরি নেই।'

বৈঠকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কেউ লেওপোল্ডকে শপথ করায় নি। কিন্তু এই গোপনীয়তার ব্যাপারটা তাকে বলা নিষ্প্রয়োজন। তার ইচ্ছে ছিল পাশাকে এর ভাগ দেবে, বলবে সেই 'ধর্মমত'-এর সামান্য কিছুটা — যাতে 'ওরা' ('ওরা' কারা সে সঠিক বোঝে নি) শ্রমিকদের লড়াইয়ের বদলে পুঁজিপতিদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে বলছে। লড়াই করা তো দূরের কথা, এমন কি তার ইঙ্গিত দেয়াও নিষেধ।

বৈঠকের পর সবাই ভোজে শরিক হলেন। খাবারের মধ্যে ছিল মিল্ক-নুড্‌ল স্যুপ, নতুন আলু আর শক্ত, অল্প নুনে-জারান সুস্বাদু খুদে শসা। মুহূর্তে খাবার সব উবে গেল আর এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্‌না বললেন:

'বাছারা, মনে হচ্ছে সারা দিন মাঠে চাষ দিয়েছ! সবাইকে আরেকবার করে, কী বল?'

'জয়, এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্‌নার জয়! সেই আতিথেয়তা পিটার্সবুর্গ থেকেই তো জানি...' সিল্‌ভিন চেঁচিয়ে উঠলেন।

'ওখানেও তোমাদের বাছারা মাঝেমাঝে খিদেয় পাগলা হয়ে বকবক করতে দেখেছি।'

'প্রিয় অতিথি বন্ধুরা,' ভ্লাদিমির ইলিচ চোখের পলক ফেলে বললেন। 'খাবার পর মাঠে বেড়ানোর জন্যে আমি প্রস্তাব করছি।'

'আপনারা বেড়াতে যান, আমাকে কিন্তু বাসন ধুতে হবে,' টেবিলের ওপর থেকে বাসনের ডাঁই রান্নাঘরে নিয়ে আসতে আসতে বলল পাশা।

'আরে না না, তা হয় নাকি!' সমস্বরে বলে উঠলেন নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না ও ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না। বাসনপত্র ধোয়ার জন্য তাঁরা পাশাকে সাহায্য করবেন বললেন। শুনে লেওপোল্ড কোমরে এপ্রন জড়াল। এঙবার্গ তাঁর সেরা শার্টটির আস্তিন গুটালেন। মুহূর্তে বাসন ধোয়া ও শুকানোর কাজটি শেষ হল।

এখন পুরো দলটি চলল শুশার ওপারের মাঠে সারি বেঁধে ছোট্ট পুল পেরিয়ে।

বাড়িতে একা রইলেন এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্‌না চেখভের গল্পসংকলন নিয়ে। বইটি পড়ছিলেন তিনি খুব ধীরে, পুরো রসটুকু নিংড়ে, প্রতিটি শব্দ উপভোগ করে।

'দিদিমা, আজ আর তোমার সঙ্গে থাকছি না। যাব ওদের সঙ্গে মাঠে,' মিৎকা বলল। হাতে ধরা ওর পিঠেটির সবটুকু রস ইতিমধ্যে গড়িয়ে পড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

'বাছা, তাই যাও।'

'আমি কিন্তু কালই আবার আসব।'

'নিশ্চয়ই, আসবে বৈকি।'

ওর ফ্যাকাশে ছোট্ট মুখ আর ফোলান, রিকেট-ধরা পেটটির দিকে বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

* * *

অন্তহীন সবুজ মাঠ।

'এখানে, এখানে আসুন।' সবার আগে খড়-গাদার কাছে পৌঁছে ভ্লাদিমির ইলিচ ডেকে বললেন। ঝড়ো হাওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য গাদাটা গাছের ডালে ঢাকা। টাটকা খড়ের গন্ধ কড়া, মাথা ঘুরিয়ে দেয়। এখান থেকে বিস্তৃত নীলাকাশের সেঁটে থাকা উজ্জ্বল তুষারচূড়া সহ সায়ানকে খুবই কাছে মনে হয়।

খোশমেজাজে থাকলে ভ্লাদিমির ইলিচ নিজেকে এমন নিঃশেষে এতে বিলিয়ে দিতেন যে সবাই ফুর্তিতে, হাসি-হল্লায় আক্রান্ত হত। উলিয়ানভরা জড়সড়, রসকষশূন্য আড্ডা ভালবাসেন না। অতিথি এলে তাঁরা ওদের সঙ্গে বনে কিম্বা মাঠে নিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ান। সবাই তখন অঢেল ফুল কুড়ান, কখনো ফাঁকা জায়গায় 'গরদ্কি' খেলেন, নৌকায় চড়েন বা গান গান। সকলকেই হাসি-তামাশায় জড়ান হয়, কেউই দূরে থাকতে পারে না।

ভ্লাদিমির ইলিচের ডাক শুনে পাশা ও লেওপোল্ড ছুটে এল। তাদের পেছনে ছিল অস্কার এঙবার্গ। ছুটছিল সে লম্বা লম্বা পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে। সবশেষে বাচ্চা মিৎকা, দুলকি চালে।

ভ্লাদিমির ইলিচ কোট খুলে ঘাসের উপর ছুঁড়ে দিয়েছেন। মাটি থেকে একটা শুকনো ডাল তুলে নিয়ে তিনি বললেন:

'আমরা গান গাইব। জাঁ, আপনি গায়েন, আমরা দোহার। শুরু হোক, কমরেড জাঁ!'

জাঁ প্রমিন্স্কি গলা পরিষ্কার করলেন, শার্টের কলারের নিচে একটি আঙুল ঢুকিয়ে কলারটা টান করে নিলেন। শেষে নিচু, চাপা গলায় গাইতে লাগলেন:

দুনিয়া ডুবিছে চোখের জলে,
জীবনে নেই তো অবসর কোন,
তবু হারাব না বিশ্বাস মোরা,
সুদিন আসিবে, আসিবেই জেনো।

পাশা এগিয়ে এল। হাতে বেণীটা আঁকড়ে ধরে সে প্রত্যেকটি শব্দ নিবিষ্ট মনে শুনে সেগুলি নিঃশব্দে আবৃত্তি করে গেল। দিগন্তবিসারী মাঠ, পেছনে খড়-গাদার

কালো ছায়া, নীলাকাশের শূন্যতায় বিশাল, আদিম পর্বতের উজ্জ্বলতা — এসবের প্রেক্ষিতে এই গান শুনে লেওপোল্ডের গলায় কী যেন কেবলই আটকে যাচ্ছিল।

আমাদের গান উড়ে যাক আরও দূরে,
ঝান্ডা তুলেছি সারা দুনিয়ার 'পরে...

'আমি বিপ্লবী হব,' লেওপোল্ড ভাবছিল। 'আজ থেকে, সারা জীবনের জন্যে! ভ্লাদিমির ইলিচ, বাবা, শপথ করছি!'

গান শেষ হল। অতঃপর সেই নৈশব্দ্যে ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না স্বামীর আস্তিন ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আবেগাসিক্ত কণ্ঠে বললেন:

'আমাকে এখানটায় আনার জন্যে ধন্যবাদ! আমি এত... এত... আপনারা যে এমন তা ভাবতেই পারি নি...'

'বন্ধুগণ, আরেকটা হোক!' ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন। তিনি আজ উচ্ছল, আনন্দিত। চোখে উজ্জ্বলতা। 'দেখুন, কারা এখানে জড়ো হয়েছে। প্রমিন্‌স্কিরা পোল, অস্‌কার ফিন্‌, আমরা রুশী আর আপনি, ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না, আপনি ইউক্রেনীয়।'

'আর আমি?' মিৎকার গলা।

'তুমি লাতভীয়, খুদে কমরেড মিৎকা। সত্যিকার একটি আন্তর্জাতিক সম্মিলন বটে। আরেকটা গান হোক!'

এবার তিনিই গাইতে লাগলেন। সবাই উৎসাহে যোগ দিল:

কমরেড, কাঁধ মেলাও, সামনে চল
শোন, ডাকে স্বাধীনতা...

মিৎকাও গাইল — গানের তালে তালে পা দাপিয়ে হাত দুলিয়ে।

দেরি করেই সিল্‌ভিনরা রওয়ানা দিলেন। এর অনেক আগেই গোরুগুলি মাঠ থেকে ফিরে রাতের মতো গোয়ালে ঢুকেছিল। দুধ দোহানোর বালতির ঠুনঠুন শব্দ, কুয়োতলায় মেয়েদের আলাপ আর শোনা যাচ্ছিল না। গোধূলির হলুদ আকাশ অন্ধকার হয়ে আসছিল। পাহাড়টিকে এখন ঘনঘোর ও বহুদূরের মনে হয়। খাঁড়ি বেয়ে নেমে আসা নিবিড় কুয়াশায় মাঠঘাট ঢাকা।

বিদায়মুহূর্তে ভ্লাদিমির ইলিচ সিল্‌ভিনকে বললেন:

'তাহলে কথা রইল, আমরা ওল্‌গা লেপেশিন্‌স্কায়ার জন্মদিনে ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়ে আসছি। আর ভুলবেন না, মাংসের পুর-দেয়া পিঠে থাকে যেন।'

গাড়োয়ান লাগামে টান দিতেই ঘোড়া ঘাড় বেঁকিয়ে চলতে শুরু করল। জোয়ালের নিচের ঘণ্টিগুলি দুলে উঠে বাজল একসঙ্গে। ক্রমে ঘণ্টির শব্দ দূর থেকে দূরে সরে অস্পষ্ট হয়ে শেষে গ্রামান্তে মিলিয়ে গেল।

'প্রায় রাতই হয়ে গেল,' নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্না স্বামীকে বললেন। দুজনে তখনো ফটকে দাঁড়িয়ে।

তাঁরা বসলেন গিয়ে নিকুঞ্জে, সামনের বারান্দার কাছেই। ওটা তৈরি করেছেন ভ্লাদিমির ইলিচ গাছের ডালপালা দিয়ে। নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্না আর তাঁর মায়ের লাগান হপ লতাগুলি বেড়ে উঠে এখন নিকুঞ্জ ঢেকে ফেলেছে। দিনে জায়গাটা সাগরতলের মতোই ঠান্ডা, সবুজ। রাতের বেলা ওখান থেকে পাতার কারুময় চাঁদোয়ার ভেতর দিয়ে তারাভরা আকাশ দেখা যায়। আগস্টের রাতে মনে হয় ব্রহ্মাণ্ডের সবগুলি তারাই বুঝি বেরিয়ে পড়েছে।

'ওই দেখ, সপ্তর্ষি,' নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্না বললেন। 'ছোটবেলায় বাবা একবার বলেছিলেন: দেখছিস সপ্তর্ষি? তিনি একটি গল্প জানতেন। সপ্তর্ষি হল মা, ছোট তারাগুলি তার সন্তান। মাঝে মাঝে সে তার এক-একটি সন্তানকে খবরের জন্যে মর্ত্যে পাঠাত — পৃথিবী কী করছে, মানুষরা কেমন আছে, তারা খুব কষ্টে আছে কি না। ওই যে নক্ষত্রপাত দেখ। ওটা আসছে আমাদের খোঁজ নিতে...'

'মানুষের অবস্থা এখনো খুব ভাল নয়,' মুচকি হেসে ভ্লাদিমির ইলিচ স্ত্রীকে বললেন।

'ওই, আরেকটা। আগস্টে কত যে তারা খসে!'

'ছেলেবেলায় এমন এক রাত আমার মনে পড়ে,' ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন। 'বোধ হয় আগস্টই হবে। রাত তখন অনেক। কীজন্যে জানি না অত দেরিতেও আমাদের পুরো পরিবারটিই ভোল্গার পারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সম্ভবত ছোটখাটো এক নৌকাভ্রমণের পর। আমি বাবার কোলে। মা তাঁর পাশে হাঁটছিলেন। বাবার গলা জড়িয়ে আমি ভোল্গা দেখছিলাম। রাতের ভোল্গা কী বিশাল আর কালির মতো ঘনঘোর। হঠাৎ আমার বোন আন্না চেঁচিয়ে উঠল: 'খসে পড়া তারাটা ধর!' আমি ওপরে তাকিয়ে দেখি সবগুলি তারাই খসে পড়ছে, পুরো আকাশটা ঘুরপাক খেয়ে তারাগুলিকে কেবলই খসিয়ে দিচ্ছে। কী অদ্ভুত দৃশ্য! আশ্চর্য, ঘটনাটা আমি ছাড়া আর কারও মনে নেই।'

'নিশ্চয়ই ছেলেমানুষী স্বপ্ন,' নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্না বললেন। 'তুমি জান কি, একসময়, পিটার্সবুর্গের অনেক আগে আমরা কিছুদিন উগ্লিচে ছিলাম। তাহলে দেখ, আমরাও ভোল্গার মানুষ। পোল্যান্ড ছেড়ে আসার পর বাবা উগ্লিচের উলটো দিকে নদীর ওপারে ভাগুনিনের কাগজের কারখানায় কাজ করতেন। একদিন বাবার সঙ্গে ভোল্গার ফেরি পেরিয়ে আমি উগ্লিচে পৌঁছই। আমরা গিয়েছিলাম জার পুত্র দ্মিত্রির গির্জায়। ওখানে একটা ঘণ্টা ছিল। বাবা বলেছিলেন: 'দেখ, ওটার জিভ ছিঁড়ে নিয়েছে, কান ভেঙ্গে গেছে। ঘণ্টাটা এখন অপদস্থ। বেজে উঠে একবার সবাইকে বিদ্রোহে ডেকেছিল। সেই থেকেই জিভ কেটে ফেলে ওকে

সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠান হয়। গল্প শুনে আমি রীতিমতো আঁতকে উঠেছিলাম। ঘণ্টার এই বিদ্রোহে কত প্রাণই না শেষে বলি হয়েছিল! আমি ওকে ভালবেসে ফেলি, যেন প্রাণবন্ত কোন মানুষ। কী হল ভলোদিয়া? কেন আজ এসব ছেলেবেলার কথা?'

'তোমাকে এখানে পেয়ে আমি যে কী সুখী!' তিনি বললেন।

'আমার কী ভাগ্য! যাদের সবচেয়ে ভালবাসি তারাই আমার পাশে — তুমি আর মা। তোমারই যা কষ্ট। যাঁদের ভালবাসে তাঁরা সবাই তো দূরে।'

'হ্যাঁ, অনেক দূরে।'

তাঁরা চুপ করলেন। তারাভরা নিবিড় আকাশ নিকুঞ্জের পাতাখচিত চাঁদোয়ার ভেতর দিয়ে অনিমেষে তাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। নিথর নৈশব্দ্য। শুধু শুশার পার থেকে ভেসে আসছিল ব্যাঙের ডাক।

'হ্যাঁ, আমার সবাই অনেক দূরে,' বিষণ্ণ স্বরে ভ্লাদিমির ইলিচ আবার বললেন। 'জানি না তাঁরা কী করছেন, কোথায় আছেন? হয়ত সবাই পদল্স্কে মা-র পুরনো পিয়ানোটা ঘিরে বসেছেন। আর মার্মাণি বাজাচ্ছেন...'

॥ ১২ ॥

ঠিক তাই। তাঁরা সবাই এখন পদল্স্কে, মায়ের কাছে। আন্না ইলিনিচ্না আজকাল ওখানেই থাকেন। তাঁর স্বামী মার্ক তিমোফেয়েভিচ মারিয়া ইলিনিচ্নাকে নিয়ে মস্কো থেকে এসেছেন। ওঁরা দুজনেই মস্কো-কুর্স্ক রেলপথের প্রশাসন বিভাগের চাকুরে। তাছাড়া আছেন দ্মিত্রি ইলিচের সঙ্গে তাঁর বন্ধু গণস্বাস্থ্য বিভাগের পরিদর্শক — ডাঃ লেভিত্স্কি। তাঁর অফিসেই দ্মিত্রি হিসাবরক্ষকের কাজ করেন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত চায়ের আসর চলল। উচ্ছল, স্বচ্ছন্দ আলাপ। আলোচিত হল নানা বিষয়। ইদানীং প্রকাশিত বই ও সাময়িকী নিয়ে, সাম্প্রতিক ঘটনা প্রসঙ্গে ব্রাসেল্সে মারিয়া ইলিনিচ্নার ছাত্রজীবন সম্পর্কে। লেভিত্স্কি পদল্স্কের বেনিয়াদের সম্পর্কে অনেকগুলি চুটকি শোনালেন। স্বাস্থ্য বিভাগের পরিদর্শক হিসেবে ওদের দোকান ও গুদামগুলি মাঝেমাঝে তাঁকে তদারক করতে হত।

আর বলাই বাহুল্য, শুশেনস্কয়ে নিয়েও আলাপ চলছিল। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না সামোভার থেকে কাপে জল ঢালতে ঢালতে আনমনা হয়ে বারবার শুশেনস্কয়ের কথা, ভলোদিয়া ও নাদিয়ার কথা ভাবছিলেন।

যে-সন্তান যতদূরে, তার প্রতি মায়ের ভালবাসা থাকে তত বেশি। যার জীবন কষ্টের। তারপর বিপন্ন সন্তান। মায়ের আদর থেকে বঞ্চিত সন্তান। 'ভলোদিয়া, তুই কোথায় বাছা! যখন কচি ছিলি তোর চুলগুলো কী নরম, রেশমের মতো ছিল...

বাছারা, যখন তোদের কথা ভাবি... সোনামণিরা... আমার মুখে সুখের হাসি ফোটে...'

কাপে জল ঢালার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কেউ আর চা চাইছেন না।

'না, ধন্যবাদ,' বললেন মার্ক তিমোফেয়েভিচ। 'স্ট্রবেরির জ্যাম দিয়ে গরমের দিনের সত্যিকার চা খেলাম। চমৎকার! মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না, এবার উঠতে পারি?'

উনি দাঁড়ালেন। দাড়িয়ালা, বিশাল চেহারার মানুষটি। বারান্দায় গেলেন ধূমপানের জন্য।

'বাতি জ্বালার সময় হল,' আন্না ইলিনিচ্না বললেন। 'মা, কিছু একটা বাজাও। সামোভারটা সরাও মিতিয়া। মানিয়াশা, এদিকে এসো!'

সবাই মিলে তাড়াতাড়ি টেবিল পরিষ্কার করলেন। সবকিছু পরিপাটি থাকা চাই— টেবিল-ঢাকনিতে এতটুকু ভাঁজ, একটা কাপ বা বই পড়ে থাকা নয়। আর কেবল তখনই মা পিয়ানোয় বসবেন। বাতি জ্বালানোর প্রয়োজন নেই। মোমবাতিও। স্মৃতি থেকেই তিনি বাজান। 'মা, মামণি, পিয়ানোয় এতটা সোজা হয়ে বসেছ। কী চমৎকার দেখাচ্ছে বাজাচ্ছে গ্রিগ।'

আন্নার মনে মুক্তি ও পবিত্রতার জোয়ার এল। তিনি শক্তি ও করুণায় পূর্ণ হয়ে উঠলেন। এটা কেবল সঙ্গীতের জন্যই। মায়ের বাজনা শুনে শুনে তাঁরা বড় হয়েছেন।

তিনি খোলা জানালায় দাঁড়ালেন। বোনকে দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু তিনি জানতেন উনি বারান্দায় — মাথার পেছনে হাত রেখে দোলনা-চেয়ারে বসে মায়ের বাজনা শুনছেন, সামনের বাগান থেকে আসা ফুলের সুগন্ধ শুঁকছেন। ভাই দ্মিত্রি পিয়ানোয় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, সঙ্গীতে তন্ময়। ওখান থেকে মার্ককে দেখা যাচ্ছে: বারান্দার রেলিংয়ে বসে সিগারেট টানছেন। তামাশা করে তিনি ওঁকে 'চাষার ছেলে' ডাকেন। তিনি কিন্তু সত্যিই কৃষকের ছেলে। মার্ক তাঁদের ভাই আলেক্সান্দরের সহপাঠী। খুব সহজেই তিনি পরিবারের আপনজন হয়ে উঠেছেন। সবাই তাঁকে ভালবাসে, কাজে খাটায়। তিনি আজ মায়ের সেরা উপদেষ্টা। 'আমার বিজ্ঞ, হৃদয়বান স্বামী। নামী দাবাড়ুও বটে! ভলোদিয়াও ভাল খেলে, কিন্তু সম্প্রতি লিখেছে যে খোদ লাসকেরকে হারানোর পর মার্ককে চ্যালেঞ্জ করতে সেও দু'বার ভাববে। বিখ্যাত দাবাড়ু চিগোরিনও মার্কের কাছে হেরে গেছেন। খবরটা 'রুস্কিয়ে ভেদোমস্তি' কাগজে বেরিয়েছিল।'

আপনমনে খুশিতে তিনি হাসলেন।

মার্কের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তিনি রেলিং থেকে নেমে নিঃশব্দে সিঁড়ি ভেঙ্গে এগিয়ে ফ্লক্সের গন্ধ-ভরা প্রায়ান্ধকার বাগানের গভীরে তাকিয়ে আছেন।

'মার্ক, ফটকের ওপারে কী দেখছ? কী?' কাছে এগিয়ে তিনি ফিস্ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলেন।

'দেখ। কিছু দেখতে পাচ্ছ কি?'

'না, কিছু না।'

'মন দিয়ে দেখ!'

'কী যেন... না, কিছু না... ওহ্, এবার দেখছি।'

অন্ধকার এখন চোখে সয়ে গেছে। বারান্দার সিঁড়ি থেকে বাগানের ফটক অবধি সরু রাস্তাটার পুরোটা এবার স্পষ্ট চোখে পড়ছে। আর ফটকের ওপারে একটি লোকের অদ্ভুত ছায়া। সে বুনো গোলাপের ঝোপে অর্ধেক ঢাকা বেড়ায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে।

'ওটা তো অনেকক্ষণ থেকেই ওখানে,' রূঢ় স্বরে মার্ক বললেন।

'থাকুক গে। পেছনে ফেউ দেখার অভ্যাস নেই কি তোমার?'

'আছে তবে শিক্ষা দিতে হাতটা কেবলই নিশপিশ করে! তুমি এখানেই থাক।'

সিঁড়ি পেরিয়ে মার্ক আস্তে আস্তে ফটক খুললেন। আন্না তখনো বারান্দায়। কিন্তু কিছু একটা আচমকা তাঁকে ওঁর সঙ্গে যেতে তাড়া দিল। মার্ক বদমেজাজী। তাঁর ঘুসি সেরা লড়ুয়ের মতো।

ফটক খুলে মার্ক চেঁচিয়ে উঠলেন:

'এখানে কী চাও?'

লোকটি লাফিয়ে একপাশে সরে গেল। ছুটে যাওয়ার মুহূর্তে আন্না ইলিনিচ্না ওর চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি আর মুখে ভয়ের ছাপ দেখলেন।

'যেও না! তুমি যেও না! দাঁড়াও, থাম, প্রখোর!' তিনি ওকে ডেকে ডেকে অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে এগুনোর চেষ্টা করলেন।

প্রখোর থামল। সে হাঁপাচ্ছিল। লম্বা স্কার্টের নিচটা তুলে ধরে ছুটতে ছুটতে আন্না ইলিনিচ্না অতি কষ্টে ওর কাছে এলেন। তাঁর স্বামীও ততক্ষণে পৌঁছেছেন।

'কে তুমি? কথা বল!'

'থাম, মার্ক, থাম। ওকে আমি চিনি। প্রখোর, আমি এখানে থাকি। তুমি জানতে? আমার কাছে এসেছিলে?'

'না।'

কীভাবে ও এতটা বদলেছে? রোগা কঙ্কালসার। এমন কুটিল চাহনি। ঠোঁটে কৃত্রিম হাসি। সত্যি প্রখোর তো?

'প্রখোর, আমাকে চিনতে পারছ?'

'নয় কেন? আপনি আ. উলিয়ানভা, লেখিকা!'

'আর কেউ তাঁকে লেখিকা বলত না। ওকে বিশ্বাস করা চলে? কী করে জানবে যে ওকে বিশ্বাস করা যায়?' আন্না ইলিনিচ্না দ্বিধাগ্রস্ত।

প্রখোর গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে রইল। ওর চোখে এমন ভুতুড়ে চাহনি কেন? সত্যি, কী ছেলেমানুষ! বেচারি। ওকে সাহায্য করা উচিত। আন্না ইলিনিচ্না আর ইতস্ততঃ করলেন না। ঝাপটে ওর হাত ধরে অটল স্বরে বললেন: 'চল।'

ঈশ্বর, কী হাত! শুধু হাড়। ওর কী হয়েছে? এখানে ও কেন এল? কী চায় ও?

'কথা না বলে তোমাকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না, প্রখোর। সেদিন স্টেশনে ব্যাপারটা কেন গোলমেলে হয়ে গেল...'

প্রখোর কোন জবাব দিল না। সে নীরবে আন্না ইলিনিচ্‌নার পাশে হেঁটে চলল। ঘর থেকে সঙ্গীতের কোমল, উচ্ছল মূর্ছনা তাঁদের ছুঁয়ে যাচ্ছিল। প্রখোরের কাছে এই সুর বড় করুণ মনে হল। এটি তার বুকে বাজল। ঘরে বাতি জ্বালা হয়েছে। সামনের বারান্দায় এক ফালি আলো পড়েছে নাস্টারসিয়ামের ঝোপে। বাগানে অন্ধকার গাঢ়তর।

মার্ক তিমোফেয়েভিচ তাঁদের পিছু পিছু হাঁটছেন। কিছুই বুঝতে পারছিলেন না তিনি।

ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বাজনা বন্ধ হয়ে গেল। মেয়ের সঙ্গী কিশোরটিকে আপ্যায়নের জন্য মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না এগিয়ে এলেন। ছেলেটির শীর্ণ চেহারা আর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তিনি অবাক হলেন, কিন্তু মেয়ের ওপর আস্থা থাকায় তিনি কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না।

'নমস্কার,' তিনি বললেন।

অতিথি নিরুত্তর। সে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে, তাঁর কালো কাপড় আর সাদা চুলের দিকে।

'বসুন,' মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না স্নেহের স্বরে বললেন।

কী অদ্ভুত, জবুথবু ছেলে বাবা! কিন্তু পছন্দ করার মতো, সহানুভূতি জাগানোর মতো কী একটা যেন তার মধ্যে ছিল।

'মা, আমাদের এই অতিথিটি সম্পর্কে কিছু মজার খবর তুমি এখনই জানতে পারবে,' আন্না বললেন। 'ওর সঙ্গে কিছুদিন আগে পিটার্সবুর্গে আমার দেখা। আর এখন তোমাকে ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।'

তিনি দেয়ালে ঝোলান ছোট তাক থেকে একটা মোটা বই আনলেন।

'ভলোদিয়ার বইটি নিয়ে ও কী করবে?' মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না অবাক হয়ে ভাবলেন।

বইটি তাঁর বিশেষ প্রিয়। ভলোদিয়াকে এটি শুরু করতে তিনি দেখেছেন। তারপরই তিনি গ্রেপ্তার হন। আন্নাকে নিয়ে পিটার্সবুর্গ গিয়ে তিনি জেলখানার পাশে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। দেখা করতে যাওয়ার সময় প্রত্যেক বার আন্না তাঁর জন্য একগাদা বই নিতেন। জেলখানায়ই ভলোদিয়া বইটির জন্য মূল লেখাপড়া শেষ করেন। শেষ হয় নির্বাসনে। চিঠিতে বইটিকে তিনি 'বাজার' নামে উল্লেখ করতেন।

নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না শুশেনস্কয়ে থেকে লিখেছিলেন: 'ভলোদিয়া এখন 'বাজারে' পুরোপুরি ডুব দিয়েছে। অন্য কিছুর জন্যে তার এতটুকু সময়ও নেই...

গত রাতে সে ঘুমেও বিড়বিড় করে মিঃ এন ও আদিম চাষাবাদ সম্পর্কে কী যেন বলেছে।'

এর পরের চিঠিতে তিনি লেখেন যে 'বাজার' শেষ করার জন্য ভলোদিয়া এখন খুবই ব্যস্ত।

১৮৯৮ সালের ডিসেম্বরে আন্না ও মার্কের কাছে ভলোদিয়া একটি চিঠিতে লেখেন: 'আমি চারটি অধ্যায় শেষ করেছি। এগুলির পরিচ্ছন্ন কপি অচিরেই প্রস্তুত হবে। তাই দু'তিন দিনের মধ্যেই তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় তোমাদের পাঠাব।'

তার এক সপ্তাহ পর:

'আজ মায়ের নামে রেজিস্ট্রি করে আমার বাজারের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় পাঠালাম।'

তিন সপ্তাহ পর:

'ষষ্ঠ অধ্যায় শেষ হয়েছে (এখনো পরিচ্ছন্ন কপি তৈরি হয় নি)। আর চার সপ্তাহের মধ্যেই সবকিছু শেষ করতে পারব বলে আশা করছি।'

দু'সপ্তাহ পর:

'রেজিস্ট্রি ডাকে আমার বইয়ের আরও দুটি খাতা (পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের সঙ্গে সূচীপত্রের একটি আলাদা পাতা) পাঠাচ্ছি। এই দুই অধ্যায়ের শব্দসংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। শেষ দুটি অধ্যায়ও এতটাই হবে। গোড়ার দিকটা ছাপা শুরু হয়েছে কি না জানার জন্যে উদ্বিগ্ন আছি...'

আড়াই সপ্তাহ পর:

'প্রিয় মামণি, আজ আমার বাজারের শেষ দুটি খাতা — সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায় আর দুটি পরিশিষ্ট (২ ও ৩) ও শেষ আধ্যায়দুটির সূচীপত্র পাঠাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত কাজটি শেষ করেছি। এক সময় মনে হত যেন আর কোনদিন শেষ হবে না।'

তাঁদের মধ্যে দূরত্ব ছিল হাজার মাইলের। কিন্তু ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্য মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না যেন বইটি লেখার সময় ওঁর পাশেই থাকতেন। প্রত্যেকটি অধ্যায়ই তিনি নিজের হাতে ধরেছেন। সবার আগে তিনিই ছেলের দ্রুত, সূক্ষ্ম লেখাগুলি পড়েছেন।

'চিনতে পার?' আন্না ইলিনিচ্না প্রখোরের দিকে বইটি তুলে ধরলেন। "রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ'। লেখক — ভ্যাদিমির ইলিন।'

তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্য আন্নার সেই আগ্রহী তরুণের পরিচিত মুখটি মনে পড়ল।

'মা, ওই তো লিফার্তের ছাপাখানায় বইটি ছেপেছিল। তখনই আমাদের দেখা। প্রখোর, মনে আছে, আমার জন্যে প্রুফ নিয়ে এসেছিলে? তুমিই বলেছিলে যে এতে পুরো সত্যটাই বলা হয়েছে। আরও বলেছিলে বইটা রাজনৈতিক, মনে নেই?'

হঠাৎ আবার তার মুখটা গোমড়া হয়ে গেল। সে দরজার দিকে এগিয়ে হুড়কো ধরল।

'বিদায়, আমি চললাম।'

সে বলেই যেত, যদি না মার্ক তিমোফেয়েভিচ তাঁর চ্যাপ্টা হাত দিয়ে হুড়কো চেপে ধরতেন।

'দাঁড়াও হে ছোকরা। এমন কিছু দেরি হয় নি।'

মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না একটু এগিয়ে গিয়ে তাঁর জামাইকে বললেন:

'ছেলেটিকে যেতেই দাও, মার্ক তিমোফেয়েভিচ।'

মার্ক হাত সরালেন।

'তুমি অবশ্যই যাবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা কাউকে ধরে রাখি না,' তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন। 'তবে প্রথমেই তোমাকে চা আর ঘরে তৈরি রুটি খেতে হবে। অতিথিকে কিছু একটা খাওয়ানোই আমাদের নিয়ম।'

সাদা কাপড়ে ঢাকা টেবিলের দিকে তিনি ইশারা করলেন। টেবিলের মাঝখানে রাখা কমলা ও লাল অ্যাস্টারে সাজান ফুলদানিটি প্রখোর দেখল। হঠাৎ সেগুলো দুলতে শুরু করল, হেলে পড়ল, প্রবল বেগে ঘুরতে লাগল, শত শত লাল ও কমলা সৌরচাকতি বহুখণ্ডে বিক্ষিপ্ত হয়ে টেবিলে ছড়িয়ে গেল। সময়মতোই মার্ক তিমোফেয়েভিচ তাকে ধরে ফেললেন।

'তোমার কী হল?'

'ওকে চেয়ার দাও। ও বসুক!' কাদের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর প্রখোর শুনতে পেল।

মনে হল ঘরটা মানুষে মানুষে ভরে গেছে। কিন্তু সে কেবল একজনকেই চিনতে পারল: সাদাচুল বৃদ্ধা। সে কেবল তাঁর কথাই শুনতে পেল।

'তুমি মূর্ছা যাচ্ছিলে? কিছুটা কফি আর খাবার খাওয়া তোমার দরকার।'

অসম্ভব সাদা টেবিল-ঢাকনিটি তাকে ভয় পাইয়ে দিল।

'আমি খেতে চাই না। আমার সময় নেই। বিদায়। আমাকে যেতে দিন,' চারদিকে তাকিয়ে ভাঙ্গা গলায় সে বলল। 'এরা কারা? সে কোথায়? এসব স্বপ্ন না সত্যি। অনেকদিন আগে সে একটি স্বপ্ন দেখেছিল: আন্না ইলিনিচ্‌নার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে...' ·

'মা, ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ আমার একা থাকা দরকার,' আন্না ইলিনিচ্‌না বললেন।

'ভয় পেও না প্রখোর!' মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না ওকে আশ্বস্ত করতে চাইলেন।

আন্না ইলিনিচ্‌না তাকে সঙ্গে নিয়ে নিচু ছাদের সরু পথ দিয়ে হলুদ মেঝেওয়ালা অনেকগুলি ছোট ছোট কোঠা পেরিয়ে গেলেন। জানালায় লেসের পর্দা, জানলার তাকে ফুলের টব, দড়িতে ঝুলান বইয়ের তাক। রান্নাঘরে পৌঁছে আন্না বাতি জ্বাললেন।

আলো অতঃপর উনুন, কাঠের বেঞ্চি ও পরিচ্ছন্ন মেঝেতে উজ্জ্বলতা ছড়াল। রান্নাঘরে আর কেউ ছিল না।

'বসো,' আন্না ইলিনিচ্‌না তাকে বললেন। 'তোমাকে কিছু একটা খেতে দেব। কবে শেষবার খেয়েছিলে?'

প্রখোর জবাব দিল না। দু'দিন সে কিছুই খায় নি। খিদেয় তার পেট পুড়ছে। চোখে সে সরষেফুল দেখছে। বইটা আন্না সঙ্গে এনেছেন — ভুলে অথবা ইচ্ছে করেই। ওটা টেবিলে রেখে তিনি খাবার তৈরি শুরু করলেন। শেষে তার সামনে রাখলেন বেশ বড় এক টুকরো ঠান্ডা মাংস, মাখন, বাদামী মচমচে আস্তরওয়ালা চমৎকার গমের নরম রুটি আর দুধ। প্রখোর ক্ষুধার্ত পশুর মতো রুটির দিকে তাকাল। নিজেকে সে সামলাতে পারল না।

'খাও, আমি আসছি,' বলে আন্না ইলিনিচ্‌না ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

প্রখোর চারদিকে তাকিয়ে তখনই পরিস্থিতি আঁচ করতে পারল। জানালাটা নিচু, গরাদেহীন। রুটি আর মাংসের টুকরোটা শার্টের নিচে গুঁজে কেটে পড়লেই তো হয়। রুটিটা ধরে সে হাতে চেপে ধরল। রেখে যাওয়া বইটাও চোখে পড়ল। 'রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ'। লেখক — ভ্লাদিমির ইলিন। প্রখোরের ছোট বেখাপ্পা বিষণ্ণ মুখটি পুরনো নিরস বেঙের ছাতার মতোই শুকনো। না, চোরের মতো লুটের মাল নিয়ে সে পালাবে না। 'আপনাদের খাবার-দাবারে আমার কাজ নেই। বয়েই গেছে আমার।'

কিন্তু পেটের জ্বালা আর বাগ মানল না। অহঙ্কার ছাপিয়ে উঠল খিদে। খাবারের ওপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দাঁত দিয়ে রুটি আর মাংসের টুকরো সে তড়িঘড়ি ছিঁড়তে লাগল। সে আকণ্ঠ খেল। বাকী খাবারগুলি শার্টের নিচে লুকনোর অদম্য ইচ্ছাটা তাকে কষ্টেই দমন করতে হল। 'এবার পালাব,' প্রখোর নিজেকে বুঝাল। জানালার কাছে এগিয়ে সে ফ্রেম ধরল। 'না যাব না। সবই সমান।'

আর তখনই আন্না ইলিনিচ্‌না ফিরে এলেন।

'আলাপ করা যাক, কী বল?'

সে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল। কথা বলার কী আছে?

'পদল্‌স্কে কেমন করে এলে? আমাদের বাগানের ওখানে কী করছিলে?'

সে বিষণ্ণ মুখে তাকিয়ে রইল।

আন্না ইলিনিচ্‌না তার দিকে বইটি ঠেলে দিয়ে বললেন:

'এতে তুমিও হাত লাগিয়েছিলে। ধন্যবাদ, প্রখোর। বইটি আমাদের একত্রে বেঁধেছে।'

হতভম্ব হয়ে সে তাঁর দিকে তাকাল। কোন কথা বলতে পারল না।

'দেখেছ, আমার মা-র চুল কী সাদা?' আন্না ইলিনিচ্‌না বললেন। 'কীজন্যে

জান? তাঁর বড় ছেলে, বিপ্লবী আলেক্‌সান্দর উলিয়ানভকে ফাঁসির হুকুম দিয়েছে জার। সেই এক সকালের মধ্যেই তাঁর চুলগুলো সাদা হয়ে যায়। সেদিন ভোরেই তিনি বুড়ো হয়ে গেলেন। সেদিন ভোরেই... প্রখোর, বল কী হয়েছে তোমার?'

তখন সে তাঁকে সবকিছু বলল।

* * *

সেদিন রেলস্টেশনে শেষপর্যন্ত প্রখোর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থেকে আন্না ইলিনিচ্‌নার ট্রেনটিকে মিলিয়ে যেতে দেখেছিল এবং শেষে বাড়ি ফিরেছিল।

উত্তর থেকে ক্রমে আরও ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। পাথরের বাঁধে নেভার আছড়ে পড়া ঢেউয়ের গর্জন শোনা যাচ্ছিল, বাদামী রঙের অজস্র ফেনা ছিটকে পড়ছিল। এই সময় বাড়ির বাইরে থাকা খুবই কষ্টের। কিন্তু, ফেরার মতো তেমন কোন ইচ্ছে তার ছিল না। তাই সে পাঠাগারে গিয়েছিল। 'স্কুলের বন্ধুরা' বইটিও ফেরত দেবার কথা ছিল। তাহলে এখানেই সব শেষ? কী শেষ? সে নিজেও জানত না। তবে তার জন্য কিছু একটা শেষ হয়ে গেছে বৈকি।

পিওতর বেলোগরুস্কি পাঠাগারেই ছিল। অন্যান্য দিনের মতোই স্বাভাবিক, অবাক হবার কিছু নেই। যথারীতি সে বইয়ের তালিকায় ডুবে ছিল। প্রখোরকে দেখে ও খুশি হল, প্রবলভাবে ঝাঁকড়া চুল নেড়ে সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

'একটু বেড়িয়ে এলে কেমন হয়? কিছু কথা বলা যাক, কী বল। জান তো, তোমার সঙ্গ আমার ভাল লাগে। বলতে গেলে তুমি তো আমার ধর্মপুত্তুর। আমিই তো তোমাকে আমাদের মধ্যে এনেছি... যাকগে ওসব কথা। তুমি খুবই নিষ্পাপ, মন খোলা, আর আমি নিজের মনটা সঁপে দেয়ার জন্যে পাগল হয়ে কাউকে খুঁজছি, তবে যাকে-তাকে নয়, যে আমাকে বোঝে... কী বলছি যদি ধরতে পার!'

তারা পথে বেরুল। হেঁটে বেড়াল পিটার্সবুর্গের কালচে-ধূসর আকাশের নিচে ঠাণ্ডায়, ঝড়ো বাতাসে।

'সত্যি বল তো, ক্রুস্‌কভাকে কেমন লাগল?' বেলোগরুস্কি শুরু করল। 'ওঁকে কী মনে হয় তোমার? কতটা উনি তোমাকে নাড়া দিয়েছেন?'

'জানি না,' অনিচ্ছায় উত্তর দিল প্রখোর।

'কী?' বেলোগরুস্কি রেগে চেঁচিয়ে উঠল। 'তোমার সম্পর্কে এতটা ভুল করে বসলাম? উনি যদি তোমার ওপর মোটেই ছাপ না ফেলে থাকেন তবে বলতেই হয় তোমার মনে কোন রসকষ নেই। তোমার আবেগ, অনুভূতি মোটেই বাড়ে

নি। যদি তাই হত তাহলে অবশ্যই দেখতে পেতে, উনি আমাদের কালের এব মহীয়সী!'

অতঃপর উত্তেজিত হয়ে সে কুস্‌কভা সম্পর্কে বলতে লাগল। উনি এব প্রতিভাময়ী নারী। অসম্ভব বুদ্ধিমতী। শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির পথ তিনি ঠিব জানেন। সারা ইউরোপে তিনি পরিচিত। জর্জ স্যান্ডের মতো তিনিও সব ব্যাপারেই প্রগতিশীল। অবাধ প্রেমের তিনি সমর্থক। তিন-তিন বার বিয়ে করেছেন, অবশ্যই গির্জার বিয়ে নয়। ছেলেটিকে রেখেছেন শাশুড়ির কাছে উনিই ওকে দেখেন, আর তিনি নিজে থাকেন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে। বিপ্লবের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন পুরোপুরি। 'যাকগে, তোমাকে খুব গোপনীয় কিছু দেখাব!' বেলোগর্‌স্কি তখন প্রখোরের হাত তার কোটের পকেটে ঢুকাল ওখানে ছিল এক বাণ্ডিল কাগজ।

'প্রচারপত্র', সতর্কভাবে চারদিকে তাকিয়ে বেলোগর্‌স্কি ফিস্‌ফিস্ করে বলল 'আমাদের নয়। 'ওদের', বুঝলে শ্রেণী-সংগ্রাম ও রাজনীতি সম্পর্কে — যেগুলোর আমরা বিরুদ্ধে। নিজের ঘাড়ে বিরাট এক ঝুঁকি নিয়ে তাঁর জন্যে জোগাড় করেছি। তাঁর জন্যে আমি সবকিছু করতে পারি। তিনিই ওগুলো আনতে বলেছিলেন। নিজের মতো ওদের স্ট্যাণ্ডটাও তাঁর জানা দরকার যাতে যুতসই একটা আঘাত দিতে পারেন! যুতসই, শক্ত আঘাত! পড়তে চাও?'

প্রখোর রাজি। ব্যাপারটা বোঝার জন্য তার আগ্রহের অন্ত ছিল না। পিওতরের কথা থেকে সে কিছুই স্পষ্ট আঁচ করতে পারে নি। রাস্তায় প্রচারপত্র পড়া অসম্ভব। সেজন্য সে বেলোগর্‌স্কির বাড়ি গেল। একটি বড় দালানের দোতলায় বেলোগর্‌স্কিরা থাকে।

'বাড়িতে এসব নিয়ে টু শব্দটি নয়। বাবা মন্ত্রিদফতরের কর্মচারী। একেবারে চুপ!' ঠোঁটে আঙুল চেপে পিওতর নিষেধ করল। 'চুপ, মনে থাকে যেন।'

নিজের চাবি দিয়ে সামনের দরজা খুলে ওরা ভেতরে গেল।

কিন্তু পিছু হটে পিওতর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল: 'এ কী?'

সামনের হলে এক মোটাসোটা পুলিশ দাঁড়িয়ে।

'ভেতরে আসুন, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি,' সে পিওতরকে বলল।

প্রখোর দেখল পিওতরের মুখে কেউ যেন ছাই মাখিয়ে দিল। সে নিজেও ভয় পেল।

'কী হচ্ছে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না... এর কোন অর্থ হয় না... আপনাদের ভুল হয়েছে,' পিওতর অসংলগ্নভাবে বিড়বিড় করতে করতে চুপিসারে পকেটের কাগজগুলি পেছনে দাঁড়ান প্রখোরের কাছে সরিয়ে ফেলল।

প্রখোর যন্ত্রের মতোই ওগুলি নিল, কোটের ভেতর লুকাল।

'ঠিক আছে, যাওয়াই যাক তাহলে,' বলে পিওতর বৈঠকখানায় ঢুকল।

প্রখোর চলে যাবার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু প্রথম পুলিশটি দরজার সামনে দাঁড়াল আর দ্বিতীয় পুলিশটি এসে ওটা পাশ থেকে বন্ধ করে দিল।

'কেউ যেতে পারবেন না!' সে বলল।

'কিন্তু আমাকে কেন? আমি তো এখানে থাকি না, কেবল দেখা করতে এসেছিলাম,' প্রখোর পুলিশের মন ভুলানোর চেষ্টা করল। পুলিশদুজন তাকে আধঘণ্টা কিম্বা আরও বেশি সময় দাঁড় করিয়ে রাখল। সে কেবলই ঘাবড়ে যাচ্ছিল, অস্থির হয়ে উঠছিল।

বৈঠকখানা থেকে পুলিশের বড়কর্তা এসে প্রখোরের উপর চোখ বুলিয়ে ওর দিকে তার লম্বা সাদা আঙুল উঁচিয়ে বলল: 'তল্লাসি চালাও!'

পুলিশদুজন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তল্লাসি চালাতেই নলের মতো মোড়ান প্রচারপত্রের বাণ্ডিলটি বেরিয়ে পড়ল।

'এই তো, এই তো,' বড়কর্তা একটা প্রচারপত্রের ওপর চোখ বুলিয়ে মেঝেতে বুট ঠুকতে ঠুকতে বলল।

'তাই তো...' চিন্তিত ভঙ্গিতে সে আবার বলল।

প্রচারপত্রগুলি রেখে প্রখোরকে নিয়ে যেতে সে হুকুম দিল।

কী ঘটছে প্রখোর কিছুই জানত না। দু'হাত ধরে পুলিশদুটি সিঁড়ি ভেঙ্গে তাকে নিচে নিয়ে যাওয়ার সময়ও সে ভাবতে পারে নি তাকে কোথায় ওরা নিচ্ছে এবং কেন। কেন তারা তাকে গাড়িতে তুলল? এমন কি তাকে জেলের সেলে ঢুকিয়ে বার থেকে দরজা বন্ধ করে ওতে চাবি লাগানোর অশুভ শব্দ শুনেও এসব কিছুই সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। তারপর অস্থির হয়ে দরজায় হাত দিয়ে ঘা মেরে সে চেঁচাতে লাগল। চাবি খুলে পাহারাদার দরজায় মাথা গলিয়ে হাঁক দিল:

'চুপ! পিটুনি-সেলে যাওয়ার মতলব?'

প্রখোর শান্ত হল। সেলে ছিল একটি করে ভাঁজ-করা লোহার চেয়ার, লোহার টেবিল, লোহার খাট। ছাদের নিচে একটি ঘুলঘুলি, গরাদে আটকান। তাকে জেলে আনা হল কেন? কী তার অপরাধ? ওই প্রচারপত্রগুলিকে তেমন কোন গুরুত্ব সে দেয় নি আর সেজন্য নিজেকে যথার্থই নির্দোষ ভেবেছিল। প্রখোর বিছানায় শুয়ে পাতলা কম্বলে সরাসরি মুখ ঢেকে এক নিঃসঙ্গ, আহত কুকুরছানার মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে নিশ্চিত হয়ে ভাবল: সবকিছু অচিরেই পরিষ্কার হবে। সে ছাড়া পাবে। কাজে যেতে না পারাটাই তার বড় দুশ্চিন্তা হয়ে উঠেছিল। যাকগে, ফ্রল ইয়েভ্সেয়েভিচ তাকে মাপ করে দেবে — সে আশা করল।

সারা দিন অপেক্ষার পরও তার ডাক পড়ল না। বসে থাকার এই যন্ত্রণা তার অসহ্য বোধ হল। সে খেতে, ঘুমাতে পরছিল না।

পরদিন সকাল থেকেই সে সমনের অপেক্ষায় রইল। কিন্তু কেউ এল না। আর এক দিন গেল। এক সপ্তাহের মধ্যে তার চোখ থেকে কিশোরের আশাবাদ মিলিয়ে গিয়ে দেখা দিল কুটিল, চোরা চাহনি। মুখ শুকিয়ে গ্যালের হাড় বেরিয়ে পড়ল।

এক সপ্তাহ পরে জনৈক তরুণ তদন্তকারী অফিসার তার জবানবন্দী নিল। সে ছিল অমায়িক আর নাছোড়বান্দা। প্রথম কেস বিধায় সুফল পাওয়ার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল।

'প্রচারপত্রগুলো কোথায় পেলেন? কে আপনাকে এই সংগঠনে এনেছে? সহকর্মীদের নাম বলুন।'

প্রচারপত্রগুলো যে পিওতর বেলোগরস্কির, একথা প্রখোর কিছুতেই বলতে পারল না।

'তাহলে স্বীকার করুন যে আপনি সরকারের বিরুদ্ধে মজুরদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চেয়েছেন!'

'না!'

আরেকবার নির্জন সেলে প্রখোর ভাবতে লাগল ওই প্রচারপত্রগুলিতে কী ছিল। মজুরদের লড়াই। কুস্কভা চক্রের সদস্যদের কথাগুলি তার মনে পড়ল। মজুরদের জন্য লড়াই নিষ্প্রয়োজন। তারা রাজনৈতিক সংগ্রামের উপযুক্ত নয়। বুর্জোয়াদের শিক্ষিত শ্রেণীরই এটা দায়। আর কুস্কভার জন্য বেলোগরস্কির আনা ওই প্রচারপত্রগুলি মজুরদের লড়াই সম্পর্কে। সে অনেকক্ষণ গভীর চিন্তায় ডুবে রইল।

'প্রমাণ আপনার বিরুদ্ধে। তাই একগুঁয়েমি একেবারেই নিরর্থক,' দ্বিতীয় জেরার সময় তদন্তকারী অফিসার বলল আর পিওতর বেলোগরস্কির সাক্ষ্য তাকে পড়তে দিল।

'ডাহা মিথ্যে!' প্রখোর চেঁচিয়ে উঠল। ওরাই মিথ্যে বলছে। এটা পিওতর বেলোগরস্কির পক্ষে অসম্ভব। একেবারেই অসম্ভব... প্রখোর ক্ষেপে উঠে এমন চিৎকার শুরু করল যে তদন্তকারী অফিসার ওকে পিটুনি-সেলে পাঠাতে হুকুম দিল। জায়গাটা ভিজে আর অন্ধকার। দেয়াল ছাতা-ধরা। খাবার বলতে রুটি আর জল। সকাল বিকালে এক টুকরো পাতলা রুটি আর টিনের কাপে সামান্য জল। বিছানাহীন কাঠের খাট। কম্বল নেই। ওখানে সে থাকল একদিন, দুদিন, তিনদিন। শেষপর্যন্ত পিওতর বেলোগরস্কির মোকাবিলার জন্য তার ডাক পড়ল।

'মিছেই একগুঁয়েমি করছেন,' তদন্তকারী অফিসার বলল এবং বিনীতভাবে পিওতর বেলোগরস্কিকে একটি আরামকেদারা এগিয়ে দিল। মনে হল বেলোগরস্কি

ভয় পেয়েছে, তার মুখ কালো হয়ে গেছে, শরীর নুয়ে পড়েছে (বেলোগরুস্কি আগে কখনই এমনটি ছিল না)।

'আপনার সাক্ষ্য আপনি সত্য বলছেন, মিঃ বেলোগরুস্কি?'

'সত্য।'

প্রখোরের মুখের দিকে তাকানোর সাহস তার ছিল না। অস্থিরভাবে সে তার উস্কখুস্ক চুলগুলি নাড়তে নাড়তে (আগে কখনই তার চুল এতটা উস্কখুস্ক ছিল না) আরেকবার বলল যে লিফার্ত ছাপাখানার শিক্ষানবিস প্রখোর সরকার উচ্ছেদের আহ্বান সম্বলিত প্রচারপত্রগুলি দিয়ে তাকে নষ্ট করতে চেয়েছিল...

'নোংরা ইঁদুর!' প্রখোর ঘৃণার সঙ্গে মন্তব্য করল। 'তোমরা সবাই নোংরা ইঁদুর, বেজন্মা।'

আরেকবার সে পিটুনি-সেলে এল।

বেচারি প্রখোর! ছ'মাস পরে জেল থেকে ছাড়া পেল ভেঙ্গে-পড়া মানুষ হয়ে। সারা দুনিয়াকে সে তখন ঘৃণা করে। জীবনের যাবতীয় শ্রেয়বোধ ততদিনে উধাও। ভাল বলে কিছুতেই আর আস্থা নেই। কেউই আর বিশ্বাস্য নয়। সে কারও সাহায্যপ্রার্থী নয়।. কেউ তাকে কোন সাহায্য করবে না।

কিন্তু তাকে সাহায্য করার মতো কেউ একজন ছিল। জেলে আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করার নির্দিষ্ট দিনে একবার তাকে বলা হয়েছিল যে তার খুড়া এসেছে।

'আমার কোন খুড়ো-টুড়ো নেই,' প্রখোর কাটখোট্টা জবাব দিয়েছিল। 'ফাঁদে ফেলতে চাও! যতসব...'

বেচারি প্রখোর। এসেছিল ফ্রল ইয়েভ্সেয়েভিচ। খুড়োর পরিচয় দিয়েছিল। প্রখোর দেখা করলে তার ভালই হত।

সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে রওয়ানা হওয়ার মুখে মস্কোর বুতির্স্কায়া জেলখানায় আটক হওয়ার আগে ফ্রল ইয়েভ্সেয়েভিচের চেষ্টায়ই প্রখোর বাড়ি গিয়ে বাবার কাছ থেকে শেষ বিদায় নেবার জন্য তিনদিনের ছুটি পেয়েছিল। ফ্রল ইয়েভ্সেয়েভিচই তাকে পদল্স্ক অবধি ট্রেনের টিকিট কিনে দিয়েছিল। 'হতভাগা কয়েদীর' জন্য প্রখোরের দিদিমা খাবারের একটি পুঁটলি বানিয়ে দিয়েছিল। সেদিন গির্জায় গিয়ে ওর স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করে, সেখান থেকে আনা পবিত্র মিষ্টি এনে প্রখোরের গায়ে সে ক্রুশচিহ্ন এঁকেছিল, তাকে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ ও প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে বলেছিল। তারপরই প্রখোর পদল্স্কে বাবার সঙ্গে দেখা করতে যায়।

শৈশবের স্মৃতিজড়ান সেই পথে প্য দিয়ে তার মন সুখদুঃখের মিশ্র অনুভূতিতে আলোড়িত হয়েছিল: কাঠের তক্তা-ঢাকা পথ, বাড়ির পেছনে সবুজ সব্জি ভুঁই, দূরে ওট খেত। মনে হল, সবই যেন এখন ছোট ছোট। বাড়িগুলি নিচু, ভাঙ্গাচোরা।

কিন্তু তার বাবার বাড়িটা ছিল নতুন। চালে, জানালার তাকে নতুন রঙ, গোবরাটে জিরানিয়ামের টব।

সেদিন রবিবার। বাবা আর সৎমা চায়ের টেবিলে, আর তখনই প্রখোর বাড়িতে ঢুকল। তাদের চার বছরের মোটাসোটা কালোচুল মেয়েটিও ওদের সঙ্গে বসে কাঠের চামচ দিয়ে কিছু একটা খাচ্ছিল।

প্রখোর দরজায় দাঁড়াল, টুপি খুলল। 'ভিখারীর মতো দেখাচ্ছে,' সে ভাবল। তার মুখ লাল হয়ে উঠল। আনাড়ির মতো সে ইতস্ততঃ করতে লাগল এবং শেষে হেঁড়ে গলায় বলল: 'নমস্কার!'

অদ্ভুত হলেও সৎমাই তাকে প্রথম চিনল।

'দেখ, দেখ, তোমার পুত্তুর এসেছেন!'

তার বাবার যেন দম ফুরিয়ে গেল। সে ছুটির দিনের ভাল শার্টটির আস্তিন দোলাল, মুখ ও গোঁফ মুছল এবং বারবার প্রখোরের গালে অনেকগুলি চুমু খেল। বউ নিঃশব্দে সবই দেখল।

'কিন্তু দাঁড়িয়ে কেন? আমাদের সঙ্গে চা খা। পিঠেগুলো এখনো গরম আছে,' প্রখোরের বাবা বুড়িদের মতো হৈচৈ করে ওকে বসাল। 'হা ভগবান, তুই কতটা বদলে গেছিস, কী রোগা হয়েছিস, চেনাই যাচ্ছে না! জেল থেকেই এলি বুঝি?'

'ওখান থেকেই,' হেঁড়ে গলায় প্রখোর বলল।

তার বাবা আবার কষ্ট করে শ্বাস ফেলল। তার সৎমা ওর কালো করে ভুরু আঁকা দুধসাদা মুখটা স্বামীর দিকে ফিরিয়ে কিছুমাত্র রাগ বা অবাক হওয়ার ভাব না দেখিয়ে কঠিন, স্পষ্ট গলায় বলল:

'আমার বাড়িতে কোন কয়েদীর ঠাঁই হবে না। ও যেখান থেকে এসেছে ওখানেই যাক।'

গরম পিঠে না ছুঁয়েই প্রখোর উঠে দাঁড়াল। মেয়েটি নিঃশব্দে তার মিষ্টান্নটুকু খেয়েই চলল, ওর দিকে তাকালও না। তার বাবা যন্ত্রের মতো ফটক অবধি তার সঙ্গে গেল। সে ফুঁপিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

'ওর কথা মনে রাখিস না বাবা। ও এমনটিই। আপস ছাড়া উপায় থাকে না। রাতের খাবারের সময়টুকু পর্যন্ত তুই এদিক-ওদিক পায়চারি কর। এরই মধ্যে ওকে বুঝানোর চেষ্টা করছি। তোর জেল হল কেন? রাজনীতি? বাপ্‌রে! মনে থাকে যেন, খাওয়ার সময় আসবি। না এলে মরার সময় পর্যন্ত তোকে ক্ষমা করব না। বাবাকে শ্রদ্ধাভক্তি করতে হয়। আসবি কিন্তু, ভুলিস না বাপ।'

প্রখোর ফিরেছিল। কাপড় রাখার কাঠের ছোট বাক্সটি সে তার বাবার ঘরে ভুলে ফেলে গিয়েছিল। ওদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেছে। তার সৎমা তখন জানালায় বসে সূর্যমুখীর বীচি চিবুতে চিবুতে রাস্তার দিকে বিরক্ত চোখে তাকাচ্ছিল। ছোট

মেয়েটি ঘরের কোণে নীরবে তার পুতুলটিকে দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে। প্রখোরের বাবা উনুন থেকে ঝোলের হাঁড়ি নামাতে গিয়ে হাতের বেখাপ্পা কাঁপুনির জন্য আরেকটু হলেই ঝোল প্রায় ফেলে দিয়েছিল। প্রখোরের গলায় কী যেন আটকে গেল। বাবার প্রতি করুণা আর অবজ্ঞা থেকে, জীবনের মুখোমুখি হবার ভয়ে।

ঝোলটুকু শেষ করতেই তার সৎমার গলা শুনল:

'শোন, আর এখানে এস না। এখানে কয়েদীর ঠাঁই হবে না। এলে পুলিশ ডাকব। ভাগ, নিজের পথ দেখ।'

আরেকবার বাবা তাকে ফটকে বিদায় দিতে গেল। সে হাউমাউ করল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নিঃশ্বাসে ভোদ্‌কার গন্ধ। বাইরে এসে পেছনের দরজা বন্ধ করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে শার্টের ভেতর থেকে একজোড়া দস্তানা বের করল: নরম, হাতে-বোনা, ধূসর রঙের জমিতে ছোট ছোট সাদা তারার নক্‌শা তোলা, চমৎকার, পুতুলের মতো সুন্দর।

'এই যে, তোর মায়ের, যে আর নেই, তার। লুকিয়ে রেখেছিলাম। ওকে মনে রাখার জন্যে সঙ্গে নে। ওই হাড়কিপটে মেয়েলোকটি, তুই তো জানিস, সবকিছু সিন্দুকে আটকে রাখে। শুধু এটাই বাঁচাতে পেরেছি বাপ। তোর মা যে কী ছিল, যদি জানতিস! ভাগ্যহীন না হলে কেউ ভাগ্যের মর্ম বোঝে না!'

মাতালের মতো হোঁচট খেতে খেতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে ঘরে ফিরল।

প্রখোর মায়ের দস্তানা বাক্সে রাখল। এবার কোথায় যাবে—সে ভাবতে লাগল। আজ প্রায় তিন বছর হল সে পদল্‌স্কে নেই। পুরনো দিনের বন্ধুরা আজ কোথায়? তাদের কোথায় সে খুঁজে পাবে? নিজেকে সে কেন এমনটি বোঝাল? এর কারণ, রাতে কারও কাছে আশ্রয় চাইতে তার লজ্জা হচ্ছিল। নিজের বাড়িতে জায়গা হল না কেন—এটা যদি জানতে চায়?

বাবার জন্য তার লজ্জা হল। মানুষ যে কতটা স্ত্রৈণ হতে পারে!

তবু সে এক পুরনো বন্ধুর বাড়িতে কড়া নাড়ল। ওর কাছে তার বাক্সটা একদিনের জন্য রাখতে হবে। দিদিমার দেয়া খাবারটুকু শেষ হয়ে গেছে। কেনার মতো পয়সাকড়িও আর নেই। একটি কোপেক পর্যন্ত। প্রথম রাত সে পার্কের বেঞ্চে কাটাল। দ্বিতীয় রাত নদীপারের এক নৌকোর তলায়—ঠিক মাক্সিম গোর্কির কোন গল্পের মতো।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে কাজ খুঁজল যাতে খাবার কেনার মতো সামান্য কিছু পয়সা জোটে। কিন্তু কিছুই পায় নি। কোন বাড়তি কাজ নেই। খিদেয় তখন প্রাণান্তকর অবস্থা। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার দিকে সামান্য একটু খাবারের জন্য সে হন্যে হয়ে উঠল। এক টুকরো রুটি, একটা হেরিং মাছ, সামান্য সসেজ বা যা-কিছু! সে সসেজের স্বপ্ন দেখল। সেই পুরনো সুদিনে বেতন পেলেই সে সসেজ কিনত। দিনটা উপবাসের না হলে সে আর দিদিমা রাতে সসেজ খেত। সেই নানা রঙের দিনগুলি! ছুটির তিনটি দিন শেষ হবার মুখে খিদে এমনই প্রচণ্ড হয়ে উঠল যে খাবার ছাড়া

আর সবই সে ভুলে গেল। সুযোগ পেলেই সে চুরি করতে পারত। কিন্তু প্রখোর ছিল একেবারেই আনাড়ি। তাছাড়া চোরচোর চেহারার জন্য কেউই তাকে দরজার কাছ ঘেঁষতে দিত না।

এখন সে নিরুপায়: সময়ের আগেই তাকে মস্কো পৌঁছতে হবে, বুতির্স্কায়া জেলে নিজেকে সঁপে দিয়ে সাইবেরিয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। না, তার সারা সত্তা প্রতিবাদ করল। আগেভাগে সে কিছুতেই জেলে যাবে না! দুর্ভাগ্যের কাছে এত সহজে নিজেকে সঁপে দেবে না। এখনো সে প্রতিবাদী সামর্থ্য হারায় নি, তার অহঙ্কার নিঃশেষে ফুরিয়ে যায় নি।

কিন্তু তারপর লড়াইয়ের ক্ষমতা আর ছিল না তার। এতে কী লাভ? তাকে আর কার প্রয়োজন? কী হবে আর? সে অন্ধকারের জন্যই অপেক্ষা করবে, যেদিকে ট্রেন শহর ছেড়ে যায় ওখানে যাবে, এক্সপ্রেস যেতে দেখবে আর...

পাথরার পুলটি শেষবারের মতো সে দেখতে গেল। এটি অদ্ভুত ধরনের, ঢাকা পুল: মাঝখানটা গাড়ির জন্য বরাদ্দ, পথিকরা হাঁটে পাশ দিয়ে। এমন কি পিটার্সবুর্গেও এই ধরনের একটি ঢাকা পুল নেই...

পিটার্সবুর্গেও কেউ তার জন্য এতটুকু চোখের জল ফেলবে না। সারা দুনিয়ায় তার আপন কেউ নেই।

আঁকাবাঁকা নদীর পার বরাবর হেঁটে হেঁটে সে সূর্যাস্ত দেখছিল। তারপর অতিকষ্টে পাহাড়ে উঠে পার্কের দিকে তাকিয়েছিল। পাথরার তীরের গ্রীষ্মাবাসগুলি তার চোখে পড়ে—প্রতিটি বাড়ির সামনে বাগান, চারদিকে লাইম আর বার্চের কুঞ্জবন, লাইলাক ঝোপ। এগুলির একটিতেই তখন পিয়ানো বাজছিল...

॥ ১০ ॥

'পান্তেলেইমন, এদিকে এসো। বুদ্ধিসুদ্ধি আমার লোপ পেয়েছে। এবার সব শেষ। ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, সাহায্য আমাকে করতেই হবে,' বললেন ওল্‌গা বরিসভ্‌না লেপেশিন্‌স্কায়া তাঁর স্বামীকে। ওল্‌গা বরিসভ্‌না খুবই কর্মঠ, শক্তমনের মানুষ। মুখটি তাঁর লম্বাটে, চুলে বব-ছাঁট, চোখে পাঁশনে চশমা। এই শিক্ষিতা, অবিচল মেয়েটি পিটার্সবুর্গের বেআইনী মার্কসবাদী চক্রের সক্রিয় সদস্যা। তিনি নিজে নির্বাসিতা নন, সাইবেরিয়ায় এসেছেন নির্বাসিতের স্ত্রী হিসেবে। স্বামীর সঙ্গে পৃথিবীর শেষপ্রান্তে যেতেও তিনি পিছ-পা নন। তাঁর পেশা চিকিৎসা। পিটার্সবুর্গ থেকে পাশ করেছিলেন 'সহকারী ডাক্তারের' কোর্স। স্নেহপ্রবণ এই মানুষটি নিজের ছোট্ট মেয়েটি সম্পর্কে সদা-উদ্বিগ্ন এবং স্বীয় প্রাণচাঞ্চল্যের স্বাভাবিক ধাতেই সংসারের তথা পরিবারের কর্ত্রী।

'পান্তেলেইমন, আমাকে বাঁচাও!'

'আসছি। কী চাই তোমার? খানিকটা জল?'

'কিসের জল! দেখ না, এটা কেবল ফুলছে তো ফুলছেই। থিতচ্ছে না।'

'তাই তো দেখছি,' পান্তেলেইমন নিকোলায়েভিচ একমত হলেন। বিভ্রান্ত স্বামী-স্ত্রী দেখলেন মাটির হাঁড়িতে রাখা ময়দার তাল কেবল ফুলছে, উপচে পড়তে শুরু করেছে।

'ওর কোন খেয়াল নেই!' ওল্‌গা বরিসভ্‌না হেসে তাঁর রাঙা মেয়েটির কথা বললেন। ঝুড়ি দিয়ে তাঁদের তৈরি দোলনায় সে ঘুমাচ্ছিল।

'ভাবো তো, মোটে ছ'মাসের বাচ্চা আর এখনই সে রাজনীতিতে মাথা গলাচ্ছে, যদিও সরাসরি নয়,' লেপেশিন্‌স্কি বললেন।

'আজ আর কোন রাজনীতি নয়! আজ আমাদের মেয়েটির অপালিত জন্মদিন পালন করব। আমাদের প্রথম সন্তান। একেবারে না'র চেয়ে দেরি করে করাও ভাল। আর ওই তো, আমার নামের শ্রীমতী ওল্‌গা সিল্‌ভিনা আসছেন। তোমাকে আর কিছু করতে হবে না, পান্তেলেইমন। আমাদের হাতে পিঠের চেহারা যা দাঁড়াবে আমার আর বুঝতে বাকি নেই।'

ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়ের নির্বাসিত রাজনৈতিক কর্মীদের দলটি তেমন বড় না হলেও ওখানে দুজন ওল্‌গা আছেন। অথচ এঁদের কেউই নির্বাসিতা নন। তাঁরা এসেছেন স্বেচ্ছায়। এক মাসের কিছু বেশি হল ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না সিল্‌ভিনা এসেছেন। কিন্তু এরই মধ্যে সবার সঙ্গেই ভাব জমিয়েছেন। মনে হচ্ছে উনি সুখী, খুবই সুখী এখানে। একবার বিবেচনা করে দেখুন, এটা কী? একে কি সুখ বলে? সুখটা কিসের? কেমন?

ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়ে জায়গাটা খুবই বিষণ্ণ ধরনের। এর বুক চিরে চলে যাওয়া চওড়া রাস্তাটায় প্রাণের চিহ্ন বড় একটা চোখে পড়ে না। লার্চ গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি বাড়ি। কাঠগুলির উপর সময়ের ছাপ পড়েছে, কালো হয়ে গেছে। তবু আরও দু'শ বছর অক্লেশেই টিকবে। জানালার খড়খড়িগুলিতে নিরেট লোহার হুড়কো। বেড়াগুলি উঁচু, শক্ত। ফটকের উপর ছোট ছাদ। এখানকার মানুষ রাতে জানালা, ফটক আটকে রাখে — কিছু দেখা যায় না, কিছু শোনা যায় না। গ্রামটি তাইগার লাগোয়া। এখানকার শরতের রাতগুলি ভয়ঙ্কর: বিষণ্ণ বাতাসের তোড়ে তখন বয়স্ক গাছগুলি গোঙায়, মড়মড় করে। সায়ান পর্বতমালার বিশাল খুঁটির মতো তুষারাচ্ছন্ন আকাশচুম্বী উজ্জ্বল চূড়াগুলি গাঁয়ের উপর সেঁটে থাকে কিংবা মন্থর মেঘে ঢেকে গিয়ে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, দুনিয়া থেকে জায়গাটাকে আলাদা করে ফেলে। নবাগত মাত্রেই একটি নীরব নিঃসঙ্গতায় এখানে পীড়িত হয়।

কিন্তু ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না এর ব্যতিক্রম। তিনি সুখী। প্রথমেই তিনি

সিল্‌ভিনের শূন্য, দারুময় খুপারিটিকে একটি আরামপ্রদ বাড়ি বানিয়ে তুললেন। যৎসামান্য দিয়েই অসাধ্যসাধন হল: জানালায় পর্দা লাগালেন, দেয়ালে তাঁর মা-র একটি ফোটো আর লেভিতানের 'চিরন্তন শান্তি' ছবিটি টানালেন, রান্নাঘরের টুলকে বিছানালগ্ন টেবিল বানিয়ে ওটির উপর নিজের প্রিয় পুশকিনের রচনাবলীটি রাখলেন। তিনি সব সময়ই কাজে ব্যস্ত। বাড়ি ফেরার জন্য ব্যাকুল হওয়ার মতো সময় তাঁর নেই।

লেপেশিন্‌স্কিরা বাড়ির অলিন্দে তাঁর জুতার ঠকঠকানির আওয়াজ শুনতে পেলেন। তারপরই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

'দেরি হয়ে গেল?' ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না বললেন।

'একেবারে ঠিক সময়েই। পান্তেলেইমন, তোমার বরাত ভালই। এবার পড়তে যেতে পার। তোমাকে ছাড়াই আমাদের চলবে।'

দুই ওল্‌গা পিঠে তৈরি করতে বসলেন। শুরু হল সংসারের বহুবিধ ঝঞ্ঝাটের আলাপ। বাচ্চার পেট কেমন? আগস্ট মাসটা খুবই সাবধানে থাকা দরকার। পোকার শেষ ধকল যাচ্ছে। কী জঘন্য। ওগুলো মারার কোন ব্যবস্থা নেই! আর হাসপাতালে কেমন চলছে? পড়াশোনা?

ওল্‌গা লেপেশিন্‌স্কায়া স্থানীয় হাসপাতালে কাজ করেন। ওল্‌গা সিল্‌ভিনা পড়ান ডাক্তারের ছেলেটিকে। ডাঃ আর্‌কানভ তাঁর স্বামীর উদ্ভাবন নয়। তিনি সত্যি সত্যিই ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়ে গাঁয়ে থাকেন। তাঁর একটি ছেলে আছে। তাকে গ্রামার স্কুলের জন্য তৈরি করে দিতে তিনি ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌নাকে অনুরোধ করেন। ওল্‌গা দারুণ খুশি হন। এই দুই মহিলার আলাপ করার মতো বিষয় অঢেল। কিন্তু দুপুরের খাবার তৈরির তাড়া আছে।

অতিথিরা ইতিমধ্যে ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়ের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। তাঁদের দু-চাকার ঘোড়ার গাড়ির ঘণ্টি বাজছিল। তাঁরা ঝুঁকে পড়ে চাকায় কাটাচেরা পথ দেখছিলেন।

অতিথিদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষিত লেপেশিন্‌স্কিদের বাড়িতে তখন আনন্দের বান ডেকেছে।

ভানেয়েভদের ওখানেও তখন ব্যস্ততা বিরাজ করছিল। তবে অন্যতর উদ্বিগ্নতার আঁচ-লাগা। বাড়িওয়ালীর সাহায্যে দমিনিকা ভাসিলিয়েভ্‌না স্বামীর তথাকথিত পাঠকক্ষের ছোট ঘর থেকে তাঁর বিছানাটা বড় ঘরে সরাচ্ছিলেন। বিছানায় নতুন চাদর বিছিয়ে, বালিশগুলি গোলগাল করে, স্বামীকে শুইয়ে দিতে দিতে তাঁর ঘামে ভেজা কপাল মুছে দিচ্ছিলেন।

'ওঃ দুর্বল হয়ে পড়লাম...' ভানেয়েভ ম্লান হাসলেন।

'ওটা কেটে যাবে, ভয় পেও না,' আশা নিরাশার মধ্যে বাস করে দমিনিকা

আত্মসম্বরণ করতে শিখেছিলেন। আচমকা কোন সর্বনাশের চরম আঘাতের মুখোমুখি তিনি পিছু হটতে জানতেন না।

'সোনা আমার,' স্ত্রীর দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভানেয়েভ বললেন।

দশ দিন আগেই সংকটের সূত্রপাত। এর আগ পর্যন্ত তার অবস্থা খুব একটা খারাপ ছিল না। ইয়েনিসেইস্কের মারাত্মক তুষার আর অসহ্য বাতাস থেকে শেষ পর্যন্ত ইয়েরমাকভ্স্কয়েতে এসে অসুখ থেকে কিছুটা ভাল হয়ে উঠেছিলেন। জেলেই অসুখগুলি জেঁকে ধরেছিল। কিছুতেই সারছিল না। তারপর একেবারে হঠাৎ গলা থেকে রক্ত পড়তে লাগল। দুজনেই ভয় পেলেন। কিছুতেই তা ভুলে যেতে পারছিলেন না।

ডাক্তার ডেকে পাঠান হল। ডাক্তার আর্কানভ ভাল মানুষ, নির্বাসিতদের দরদী তখনই এলেন। বরফ আনিয়ে তার টুকরো ক'টি ভানেয়েভকে গিলতে বললেন। রক্ত থামানোর জন্য আর কী করা হল তা দমিনিকার চোখে পড়ল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্ত পড়া থামল। রক্তপাতের জন্য ভানেয়েভ এতটা দুর্বল হয়ে পড়লেন যে হাতটা তোলার মতো শক্তিটুকুও আর রইল না। তাঁর মনে হল, জীবনী শক্তি যেন ফুরিয়ে আসছে।

'আমি কি মরতে চলেছি?'

'নিশ্চয়ই না! অবশ্যই এত জলদি নয়। আপনাকে নাতিদের বিয়েতে নাচতে হবে যে। আর কেবল তারপরই যখন ইচ্ছে তখন চোখ বুজতে পারেন।'

আর্কানভের অটল গাম্ভীর্যের জন্য রোগীরা তাঁর কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত। 'আমি তাহলে মারা যাচ্ছি না,' আশ্বস্ত ভানেয়েভ ভাবলেন। 'আমি বাঁচব। রোগ সেরে যাবে, ভাল হয়ে উঠব।'

পরিষ্কার বিছানায় তিনি শুয়ে রইলেন। ফুলান বালিশে মাথা রাখলেন। নিজেকে অশরীরী, ওজনহীন মনে হল। মনে মনে তিনি তাঁর শৈশবে, ভোল্গা-তীরের নিজনি নভ্গরদে ফিরে গেলেন। চোখ বুজতেই মনে হল নৌকোয় নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে দোল খাচ্ছেন। নৌকো জল কেটে যাচ্ছে, নৌকোর গায়ে জল আছড়ে পড়ছে। ঢেউগুলি ধীরে ধীরে পারের দিকে গড়িয়ে চলেছে, বালিতে শুকিয়ে যাচ্ছে। তিনি ভেসে চলেছেন, কেবলই ভেসে...

...নিজনি নভ্গরদের স্কুলটি। তিনি তরুণ কেরানী। তাঁর বন্ধুরা, ঘনিষ্ঠতম বন্ধু মিখাইল সিল্ভিন। তাঁদের আলাপ, আলোচনা, বিতর্ক, বই আরও বই। কার্ল মার্কস আর নতুন জীবনের সূত্রপাত।

আসলে সত্যিকার নতুন জীবন শুরু হল পিটার্সবুর্গে, উলিয়ানভের সঙ্গে দেখা হওয়ার দিন থেকে। উলিয়ানভ তাঁর উপর গভীর ছাপ ফেললেন। ভানেয়েভের চেয়ে মাত্র দু'বছরের বড়, অথচ তখনই তিনি রীতিমতো পাকা, আর তাঁদের বাকীরা সবাই

কাচিকাঁচা। চলার পথটি, লড়াইয়ের লক্ষ্য উলিয়ানভ ভালই জানতেন। বিপ্লবের অনিবার্যতা, শেষাবধি শ্রমিক শ্রেণীর নিশ্চিত বিজয় সম্পর্কে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। উলিয়ানভের সঙ্গে সাক্ষাতের পরই ভানেয়েভ হলেন মার্কসবাদী, বিপ্লবী আর কেবল স্বপ্নে নয়, কর্মেও। তিনি তাঁর কাজে আকণ্ঠ ডুবে গেলেন। তাঁদের ছিল শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য 'সংগ্রামী লীগ' আর শ্রমিক চক্রে মার্কসবাদ প্রচার, প্রচারপত্র ছাপানো, ধর্মঘট সংগঠন। পিটার্সবুর্গের শ্রমিকরা লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অঢেল কাজ, অশেষ উত্তেজনা। কঠিন অথচ আশ্চর্য জীবন।

'তোল্!' হঠাৎ ভাসমান নৌকার তলা অগভীর জলে বালুর চড়ায় আটকে গেল...

তিনি চোখ খুললেন। সামনে দমিনিকা—কাজল নয়না ইউক্রেনীয় স্ত্রী। তাঁর উদ্ধারকারিণী, হাতে চমৎকার উজ্জ্বল রঙের বনফুল।

'তোল্, তোমার জন্যে। ওঁরা এসে গেছেন। পথ থেকে এতটা ফুল ওঁরা কুড়িয়েছেন। তাইগা থেকে আনা বন্ধুদের উপহার।'

এক কলসি জলে এগুলি রেখে তিনি রুমাল দিয়ে ভানেয়েভের কপাল মুছলেন।

'তুমি এখন কিছুটা ভাল। কম ঘামছ,' ভেজা রুমালটা লুকিয়ে তিনি বললেন।

'সবাই এসে গেছেন?'

'এসে গেছেন। কাল তাঁরা এখানে আসবেন।'

'কাল?'

কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে তিনি উঠলেন। তাঁর নীল চোখে উষ্ণ শুষ্ক উজ্জ্বলতা। দমিনিকা ভয় পেলেন।

'তোল্, শুয়ে পড়।'

'কেন? এই তো বললে কিছুটা ভাল। শরীরে কেমন যেন শক্তির জোয়ার এসেছে। আমার মধ্যে সবকিছু উথলে উঠছে, কাজে নামার জন্য আঁকুপাঁকু করছে। মাথাটা কাজের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। আমি তো বেঁচে আছি, নিকা। আমার যে তর সইছে না, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগতে চাই, এতে আমার ভাগটা...'

তিনি কাশতে লাগলেন। আবার বালিশে মাথা গুঁজলেন। বুকে জমাট কফ আটকে যাচ্ছে দেখে দমিনিকা ভয় পেলেন। বুকের ভেতর কেমন যেন ঘড়ঘড় শব্দ। 'আবার যদি রক্ত পড়ে? দোহাই ঈশ্বর! কেউ আসুক না! বন্ধুরা, কোথায় তোমরা?'

বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে তিনি অনিমিখে চেয়ে রইলেন। কোন সাহায্য করতে না পোরায় তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত কাশির দমক থামল। কেটে যাওয়া কষ্টের চিহ্ন—গালে দুটি রক্তাভ দাগ ফুটে উঠল। তিনি দাঁড়ালেন। আস্তে আস্তে ওঁর মাথাটা তুলে ঘামে ভেজা বালিশ উল্টে দিলেন।

'এবার একটু ঘুমানোর চেষ্টা কর, সোনামণি...'

'আবার বল...'

'সোনা আমার...'

ভানেয়েভ ঘুমিয়ে পড়েছেন ভেবে পা টিপে টিপে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। স্বপ্নিল হাসিতে শূন্য ঘরে তখনো তাঁর কথাগুলি তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন। ভানেয়েভ মাথা ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে তাকালেন। তাঁর ইচ্ছে হল জানালার ধারে হাওয়ায় মর্মরিত একটি বার্চ গাছ যেন থাকে, যেন পাতার সরসর আওয়াজ শুনতে পান।

কিন্তু সারা ইয়েরমাকভস্কয়েতে একটিও বার্চ বা আপেল গাছ ছিল না। গাঁয়ের গোমড়া ভাবটা সরানোর মতো কোথাও ছিল না কোন বাগবাগিচা।

বালিশে মাথা রেখে তিনি মেঘের আনাগোনা দেখতে লাগলেন। এগুলি এখনো গ্রীষ্মেরই মেঘ: ধবধবে সাদা, কিনার সুস্পষ্ট, চলেছে তড়িঘড়ি, মিলেমিশে যাচ্ছে—চিরপথিক। তিনি আর নিকাও তাই...

তাঁদের প্রথম দেখা হওয়ার দিনটি মনে পড়ল।

...সেলের দরজায় চাবির ঝনঝনানি। তালা খোলা হচ্ছে। ওয়ার্ডেন বলল: 'আপনার বান্ধবী এসেছেন দেখা করতে।'

তিনি জানতেন বন্ধুরা কিছু খাবার ও বইপত্র পাঠানোর জন্য অবশ্যই একজন 'বান্ধবী' জোগাড় করবে। নেভজোরেভ বোনেরা এখনো বাইরে। তাই 'বান্ধবীটি' অবশ্যই ওঁদের কোন ছাত্রী-বন্ধু হবে। পার্টির কাজে আসা সম্পূর্ণ অপরিচিতা কেউ। এই পর্যন্তই। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর হয়ত ওর সঙ্গে আর কোন দিনই দেখা হবে না। তবু এই অপরিচিতার সঙ্গে দেখা হওয়ার ভাবনাটা তাকে আচ্ছন্ন করল। চুলটা সামলে কিছুটা অস্থির হয়ে কোট গায়ে দিলেন আর মুখরিত বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে প্রথম সাক্ষাতের জন্য উপযুক্ত কিছু একটা চৌকশ সম্বোধন নিয়ে কেবলই ভাবছিলেন। তবু, তাঁকে দেখার পর বেমালুম সেটি ভুলে গেলেন।

ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটি বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বেশ লম্বা, প্রতিমার মতো গড়ন, কালো চোখ আর কচি মেয়েদের মতো মিষ্টি মুখের আদল। প্রথম দেখেই ভানেয়েভের তাঁকে ভাল লাগল। ভয়ে জড়সড় হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন অসংখ্য ঘটনা দেখে অভ্যস্ত পাশের পুলিশটি কিছুই লক্ষ্য করল না। কিন্তু এটা তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ। পুলিশটির উপস্থিতি তাঁদের কাছে দারুণ অস্বস্তিকর ঠেকল।

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের দ্বিধা। তারপর সাগ্রহে এগিয়ে গেলেন ভানেয়েভের দিকে।

'সোনামণি, তোমাকে ছেড়ে আর বাঁচতে পারি না গো!' বলেই ভানেয়েভের ঠোঁটে চুমু খেলেন।

উত্তরে কী বলেছিলেন, আজ আর মনে নেই। কী ভাবে তাঁরা দুজনে পাশাপাশি বেঞ্চে বসে কথা বলেছিলেন, তাঁর হাত ধরে মুখের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি কে, কার মতো দেখতে—এসব কী ভেবেছিলেন তাও এখন ভুলে গেছেন।

পরে সেলে তালাবন্দী হওয়ার পর তাঁর প্রতিটি কথা তিনি মনে করার চেষ্টা করেন। ওই ধাবমান মুহূর্তগুলির মধ্যেই তাঁরা পরস্পর সম্পর্কে সারা জীবনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা আঁচ করেছিলেন। 'তার উৎসাহ, বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, কাঁচ সাদাসিধে মনের জোর আছে, খুবই শান্ত, সে অপূর্ব। ঈশ্বরই ওকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন...' ভাবছিলেন তিনি।

'তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম!' ভানেয়েভ বললেন। আর দমিনিকা উত্তর দিলেন: 'এখন থেকে কেবল আমিই আসব।'

'তোমাকে ছেড়ে এতদিন যে কীভাবে কাটিয়েছি?'

'আমাকে ছাড়া আর থাকতে হবে না। এখন থেকে কেবল আমিই আসব।'

'বেঁচে যাই তাহলে!'

কী ভেবে দমিনিকা আচমকা ভুরু কোঁচকালেন। তারপর হেসে বললেন: 'জান, ওরা আমাকে প্রথমে আসতে দিতে চায় নি। আর আজ বলল, দমিনিকা ভাসিলিয়েভ্না ব্রুখভ্স্কায়া, এরপর আপনি!'

'আচ্ছা, তুমি তাহলে দমিনিকা ব্রুখভ্স্কায়া,' ভানেয়েভ মনে মনে বললেন। 'অসাধারণ নাম, আমার খুবই পছন্দ! চালাক মেয়ে বটে, কেমন করে নামটাও জানিয়ে দিল! পুলিশটা জানতেও পারল না যে আমরা একে অন্যের অচেনা। দমিনিকা। এই নামের আর কাউকেই আমি চিনি না।'

'নিকা বলেই ডাকলেই খুশি হব।'

'দেখছি, ওর ডাকনাম নিকা। নিকা, প্রিয় নিকা, প্রিয়তমা নিকা, ভাবী বধূ আমার!' আপন মনে বললেন তিনি।

'আর তোমাকে তোল্ বলে?'

এনামে কেউ কোনদিন তাঁকে ডাকে নি। নামটা দমিনিকার আবিষ্কার। তাঁর নিকার মাথাটা চমৎকার সব ভাবনায় ঠাসা। সেলের মধ্যে দরজা থেকে জানালা পর্যন্ত তিনি বারবার পায়চারি করতে লাগলেন: 'নিকা আমার। নিকা আমারই।'

তাঁর জেলজীবন এখন অপেক্ষায় এসে ঠেকল। প্রতিটি সোমবারের জন্য অপেক্ষা। ওটাই দেখাশোনার দিন। সাক্ষাতের সময় ত্রিশ মিনিট। আধ ঘণ্টা। খুব কম। অসম্ভব কম। একটি পলায়মান মুহূর্ত এবং অনন্ত কাল। বৃহস্পতিবারও তিনি অপেক্ষা করতেন। ওই দিন কেবল গরাদের ভেতর থেকে কথা বলা যেত।

দু'হাতে জানালার শিক আঁকড়ে ধরে ফাঁক দিয়ে চেঁচিয়ে নিকা বলেছিলেন: 'কাল বেস্তুজেভের কোর্সে কী চমৎকার বক্তৃতাই না হল!'

তিনি জোরে জোরে মাথা নেড়ে তাঁকে আশ্বস্ত করতে চাইলেন: ওঁর কথা তিনি সবই বুঝেছেন।

'তোমার শহরের মেয়েরা তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে,' দমিনিকা চেঁচিয়ে বলেছিলেন।

ঠিক এটাই তিনি ভেবেছিলেন: 'নিকা তাহলে নেভজোরভ বোনদের বান্ধবী। আমার নিকা আমার বন্ধুদের বান্ধবী। হাসতে, তামাশা করতে, কাউকে চুমু খেতে দারুণ ইচ্ছে হচ্ছে। তোমাকে, তোমাকেই নিকা! আর কাউকে নয়!'

তাঁরা নিজেদের বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী, জেলের বাইরের জীবন, বইপত্র নিয়ে আলাপ করেছিলেন। তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি কথা বলছিলেন। অল্প এই সময়টুকুর মধ্যে পরস্পরকে যথাসম্ভব বেশি খবর দেয়ার জন্য তাঁদের তর সইছিল না।

'পুরো সপ্তাহ ধরেই আমি ব্যলজাক পড়ছি, নিকা। বইটি ছাড়তেই পারছি না। কী মৌলিক, কী রোমান্টিক এই শিল্পী। মনের মধ্যে বিরোধী আবেগগুলির ঝড় তুলতে পারেন!'

'ঠিক বলেছ। আমিও বালজাকের ভক্ত। তাঁর বলিষ্ঠ চরিত্রগুলো আমার খুবই পছন্দ।'

'তুমিও তেমনিই,' গরাদের মধ্য দিয়ে ভানেয়েভ চেঁচিয়ে বললেন।

দমিনিকা উত্তর দেন নি। ভানেয়েভের মনে হয়েছিল উনি যেন নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। সময় শেষ হওয়ার কিছু আগেই দমিনিকা চলে যান।

জেলের মেয়াদ শেষ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দমিনিকার ব্যবহার ক্রমেই সংযত হয়ে আসছিল। তিনি আরও নিরুত্তাপ, নিস্পৃহ হয়ে উঠলেন। তাই, কিন্তু ভানেয়েভ এরই মধ্যেই তাঁদের আলাপ থেকে আঁচ করেছেন—দমিনিকা বিপ্লবী, প্রচারপত্র ছড়িয়েছেন মজুরদের মধ্যে, নেভজোরভ বোন আর ক্রুপ্‌স্কায়ার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ। 'সংগ্রামী লীগের' সদস্যা। দমিনিকার মেজাজ অনেকটা তাঁরই মতো। তাঁদের আদর্শ, লক্ষ্য অভিন্ন, তাহলে কেন তিনি নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন, কেন তাঁকে ছেড়ে যাচ্ছেন?

এবং হঠাৎ তিনি সবই জানলেন। 'ভানেয়েভ, তুমি হন্দ বোকা। এখনো বুঝতে পারছ না? কচি খোকা! আগে কখনো প্রেমে পড় নি। মেয়েদের চেন না। তার 'প্রেমিক' থাকতে পারে, এটা মাথায় আসে নি! তুমি তার কেউ নও। সে তার কর্তব্যটুকুই করছে। জেল থেকে তুমি ছাড়া পেলে সে খোলা মনেই তোমাকে ছেড়ে যাবে। অন্য কোথাও সত্যিই তো সে বাগদত্তা হতে পারে। হয়ত এই অভিনয়ে এতদিনে সে ক্লান্ত, বিরক্ত হয়ে পড়েছে। আর দেখ, তুমি কী সব কল্পনা করেছ! না, সে তোমার তোয়াক্কা করে না। তুমি তার কেউ নও।'

নিজের মাথার রগ টিপে তিনি সেলের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটতে লাগলেন। কখনো বসলেন লোহার চেয়ারে, নিজের ঈর্ষা তাতিয়ে তুললেন। এখন অনেক দূরে অপরিচিত কোন পুরুষ নিকার সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপে মগ্ন, এই চিন্তায় পীড়িত হলেন।

তারপর নিকা নিজেই গ্রেপ্তার হন। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য আর কেউ আসত না। গরাদের মধ্য দিয়ে সেই ডাক আর শোনা যেত না: 'হ্যালো, তোল্!' জেলের বাকি কয়েক মাসের মধ্যেই নিকা তাঁর কতটা, তিনি মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন। নিকা ছিলেন তাঁর কাছে আলো আর বাতাসের মতোই।

সাইবেরিয়ায় যাওয়ার আগে দমিনিকার সঙ্গে শেষ দেখার সময় ভানেয়েভ বলেছিলেন:

'নিকা, আমাকে সত্যি কথাটা বল, কেবল সত্যি, আর কিছু না।'

'তাই তোল্, কেবল সত্যই বলব! তুমি বড় ভাল মানুষ, বোধ হয় দুনিয়ার সেরা। তোমার চেয়ে ভাল কাউকে আমি চিনি না। কিন্তু আমাদের জগৎ আলাদা। আমি যে শত্রুভাবাপন্ন সমাজস্তরের মেয়ে। শত্রুশ্রেণীর একটি মেয়েকে তোমার বিয়ে করা উচিত নয়। আমার শ্রেণীর অশেষ ধনলিপ্সার জগৎ তোমার অচেনা। আমার বাবা ব্যবসায়ী। অর্থই তাঁর লক্ষ্য, জীবন। তোমার যাবতীয় বিশ্বাসের প্রতি তাঁর অপার ঘৃণা। এটা তুমি ভুলতে পারবে না। এটা আমাদের মধ্যে বিশাল ফারাক তৈরি করবে। কিন্তু আমি তো সেই জগতের মেয়ে। আমার মা ওখানে... তাহলে আমরা মিলব কীভাবে, তোল্? না, এটা অসম্ভব।'

তিনি চলে গেলেন।

ভানেয়েভ সারা রাত জেগে তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর যুক্তিগুলি ছিল খুবই ন্যায়সঙ্গত আর বিশ্বাস্য।

'প্রিয়তমা আমার, শ্রেণী-সংস্কার তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রভাবিত করবে তুমি তাই ভাবছ? আমাদের জন্মের জন্যে কি আমরা দায়ী? তোমার অতীতকে কেউ লজ্জাকর ভাবলে আমি তাকে অবশ্যই ঘৃণা করব। আমার মনে হয় জীবনের শিক্ষা তোমাকে এক উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। তুমি জান, যে আদর্শে আমার জীবন উৎসর্গিত সেই লড়াইয়ে তোমার মতো সহকর্মী আমার পক্ষে এক আশাতীত পাওয়া। শৈশবে পায়ে পরান পারিবারিক বেড়ি ভেঙ্গে ফেলার মতো মনের শক্তি যার আছে, সামাজিক দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সে কখনই ভয় পাবে না। ভাবী বধূ আমার, তোমার কাছে এটিই শুধু চাই, আর কিছু নয়...'

এটি সেই তিন বছর আগের ঘটনা। নিকা তখন ভানেয়েভকে বিয়ে করেন। তার পরপরই কোলে সন্তান আসার দিন এগিয়ে আসে। আজও সেই রাতটি ভানেয়েভের মনে পড়ে যখন উত্তর সম্পর্কে পুরোপুরি অনিশ্চিত থেকেই এই চিঠিটি লিখেছিলেন।

* * *

সূর্যের কালচে-লাল বলয়টি ধোঁয়াটে মেঘের আড়ালে ধীরে ধীরে দিগন্তে ডুবল। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা ভানেয়েভকে আচ্ছন্ন করল। অস্থির হয়ে

তিনি উঠে বসার চেষ্টা করলেন। নিকা কোথায়? এই সময়টা একা থাকা তাঁর অসহ্য। দুর্ভার কিছু একটা যেন তাঁর উপর চেপে বসছে, কোন ভয়ঙ্কর যেন নিঃশব্দে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে... জানালায় এখন গোধূলি ছায়া। তিনি নিকাকে ডাকতে চাইলেন আর তখন কানে এল দরজায় টোকা দেবার শব্দ।

পিটার্সবুর্গের দিনগুলি থেকেই চেনা সেই দ্রুত চলার ভঙ্গিতে ভ্লাদিমির ইলিচ এগিয়ে এলেন। হঠাৎ মূর্ছা যাওয়ার মুখোমুখি ভানেয়েভ বালিশে নেতিয়ে পড়লেন। ভ্লাদিমির ইলিচ বিছানার কাছে দাঁড়ালেন। তাঁর উদ্বিগ্ন মুখটি মায়াভরা। ভানেয়েভ তাঁর দিকে তাকালেন, হাসির বদলে মুখে কঠোর গাম্ভীর্য।

'প্রিয়, প্রিয় আনাতোলি!' ভানেয়েভের হাতটি দু'হাতে তুলে জোরে আঁকড়ে ধরে ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন।

'জানতাম, আপনি আসবেন,' ভানেয়েভ বললেন। 'জানি কেবল আমারই জন্যে আপনারা সবাই এতদূরে এই ইয়েরমাকভ্স্কয়েতে ছুটে এসেছেন।'

॥ ১৪ ॥

পরদিন খুব ভোরে নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্না আর জিনাইদা পাভলভ্না নেভজোরভা'ই প্রথমে ভানেয়েভদের বাড়ি পেঁছিন। পিটার্সবুর্গ থেকেই তাঁরা দমিনিকাকে চেনেন। তাঁরা তিনজনই ছিলেন সেখানকার 'সংগ্রামী লীগের' সদস্যা, শ্রমিকদের নৈশ স্কুলের শিক্ষিকা। তাঁরা ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। তাঁদের আলাদা ব্যক্তিগত জীবন সত্ত্বেও সকলেই আজ এক অভিন্ন অদৃষ্টের শরিক। তাঁরা স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছেন সাইবেরিয়ার পথ, যে-পথ দুর্দশা, কয়েদ খাটা, দেশান্তরণ, শ্রম ও সংগ্রামের সম্ভাবনাকীর্ণ। বিপ্লবের দাবী এমনই কঠিন! তিন নারী তাঁদের সেরা সামর্থ্য ও শক্তি নিয়েই এতে শরিক হয়েছেন। শীঘ্রই দুই ওল্গাও এলেন। প্রয়োজনীয় রান্নাবান্না আর অতিথিদের ব্যবস্থাদি শেষ করে এতক্ষণে তাঁরা রাঁধুনির এপ্রন ছাড়তে পেরেছেন। আলাপ চলেছে সাধারণ ব্যাপার-স্যাপার নিয়েই, তবে আবছা উল্লাসের ছোঁয়াচ লেগেছিল।

পুরনো বান্ধবীদের মধ্যে ফিরে এসে আনন্দিতা নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্না দেখলেন তাঁর স্বামী একা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে চিন্তায় ডুবে আছেন, চোখ-কোঁচকান তাঁর চির-পরিচিত সেই চাহনি।

'আমাদের এখানকার মানুষগুলো একে অন্যকে চমৎকার বোঝে বটে,' নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্না ভাবলেন। আর ভ্লাদিমির ইলিচও তাই ভাবছিলেন। কী আশ্চর্য সব মানুষ! বিপ্লবী আদর্শের প্রতি কী অপার নিষ্ঠা! কত সহজেই সবাই এসেছেন

এখানে ইয়ের্মাকভ্স্কয়েতে। তাঁরা সবাই এখন এখানে। তাঁরা কুস্কভার 'ধর্মমত'-এর জবাব দেবার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নেবেন। কিংবা জবাব দেবেন না?

সহকর্মীদের জন্য ভ্লাদিমির ইলিচের প্রবল গভীর এক মমতাবোধ ছিল। এ'দেরই একজন গ্লেব ক্র্জিজানভস্কি। ভানেয়েভকে কী বলে তাঁকে উনি হাসালেন, বেচারা ভানেয়েভ! শেষে জীবনটা এমনই কষ্টের হল। মুহূর্তকাল অন্তত যন্ত্রণা ভুলে সে একটু হাসুক। গ্লেব যে-কাউকে হাসাতে পারেন। ভ্লাদিমির ইলিচ নিজেকে প্রশ্ন করলেন: গ্লেবের কী তাঁর কাছে সবচেয়ে দামী মনে হয়? তাঁর সহজাত গুণ। এটাই তাঁর অনুপম অমূল্য ধন। সবকিছুরই প্রতিভা তাঁর আছে: কাজ, তামাশা, বেঁচে থাকা, সহমর্মিতা—সবকিছু। বিপ্লবের জন্য প্রতিভা প্রয়োজন। ক্ষুদ্রমনা, বিরক্তিকর লোকরা বিপ্লব ঘটাবে এমনটা ভাবা যায় না...

অস্কার এঙবার্গ। উলিয়ানভদের একই গাঁয়ের বাসিন্দা। ছিমছাম থাকা তাঁর পছন্দ: সব সময়ই পরিচ্ছন্ন কামান মুখ, ছোট করে ছাঁটা গোঁফ, চুলের টেড়ি নিটোল সরল। এই পরিবেশে তিনি আরও ফিট্ফাট, 'ধর্মমত'-এর আসন্ন আলোচনার জন্য আপাতত গম্ভীর, নিজের স্বভাব অনুযায়ী অনর্গল আর কথা বলছেন না। তিনি কার পক্ষে এটাও স্পষ্ট। কুস্কভার নন।

আর আছেন অস্কারের বন্ধু নিকোলাই নিকোলায়েভিচ পানিন। এই কারিগরটির চেহারা অনেকটা লেখক গার্শিনের মতো: গড়নটা তেমনি চমৎকার, চোখেও সেই নিবিড় বিষণ্ণতা। মার্কসবাদী আন্দোলনের মধ্যেই পানিন বড় হয়েছেন। আর শাপোভালভ। নির্দ্বিধায় বলা যায় তিনি নতুন ধরনের কারিগর। ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁকে খুবই পছন্দ করতে শুরু করেছেন, বিশেষত তাঁর বাড়িতে অতিথি হওয়ার পর। একদিন হঠাৎ জেলাকর্তার অনুমতি নিয়ে ভ্লাদিমির ইলিচ আর নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্না দু-চাকার ঘোড়ার গাড়িতে চেপে বসলেন। উদ্দেশ্য: তেসিন্স্কয়ের নির্বাসিতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আর প্রথমত কমরেড লেঙ্নিকের সঙ্গে আলাপ—যাঁর সঙ্গে ভ্লাদিমির ইলিচের দার্শনিক আলোচনা কখনই শেষ হয় না। এই দীর্ঘ পথের অনেকটাই গেছে তাইগা হয়ে আর অভিজ্ঞতা না থাকলেও ভ্লাদিমির ইলিচ সাহসের সঙ্গেই গাড়ি চালান, তেসিন্স্কয়েতে পৌঁছনও নিরাপদেই।

ওখানে থাকার সময়ই পিটার্সবুর্গের জনৈক শ্রমিক, আলেক্সান্দর সিদরভিচ শাপোভালভের সঙ্গে দেখা করতে যান। 'সংগ্রামী লীগের' সদস্য হলেও নির্বাসনে আসার আগে তাঁর সঙ্গে উলিয়ানভদের পরিচয় ছিল না। শাপোভালভের হতশ্রী ঘরের টেবিলটা বইয়ে বোঝাই ছিল। ভ্লাদিমির ইলিচ সারুণ খুশি। আর শাপোভালভ কীভাবে মার্কস পড়ছেন সেটাও দেখার মতো: সারমর্ম লিখে লিখে একগাদা খাতা ভরিয়ে ফেলেছেন। পুরো 'ক্যাপিটাল' তাঁর নখদর্পণে। তিনি কবিতারও ভক্ত: লেরমন্তভ, নেক্রাসভ। আর ওটা কী? জার্মান-রুশ অভিধান। তিনি রুশীতে

'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার' অনুবাদ করছেন। চমৎকার! এই ধরনের শিক্ষিত, চিন্তাশীল শ্রমিক প্যার্টির খুবই প্রয়োজন। সৌভাগ্য শাপোভালভের মতো মানুষের সংখ্যা বাড়ছে...

ভ্যাদিমির ইলিচ স্ত্রীর দিকে তাকালেন। নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না তাঁর দিকে তাকিয়ে কেবল চোখে হাসলেন। তিনি তাঁর ভাবনা বুঝেছেন। নীরবে পরস্পরকে বুঝতে পারাটা কী অপার আনন্দের! তাঁর আর উপস্থিত অন্যান্য মহিলাদের দিকে তাকিয়ে ভ্যাদিমির ইলিচ সগর্বে ভাবলেন: 'আমাদের স্ত্রীরা। সুশ্রী, সুশিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী। শিল্প ও সঙ্গীতের অনুরাগী। বিপ্লবের আদর্শে তাঁরা সর্বত্যাগী। আমাদের স্ত্রী, আমাদের সংগ্রামসাথী। ডিসেম্‌ব্রিস্টদের স্ত্রীদের মতোই বীরাঙ্গনা।'

জানালার পাশে একা একা দাঁড়িয়ে তাঁর মন এসব সহকর্মীদের জন্য কৃতজ্ঞতায়, ভালবাসায় ভরে উঠল।

'বন্ধুগণ, এখন সভার কাজ শুরু করা যাক,' লেপেশিন্‌স্কির গলা শোনা গেল।

'সভাপতিত্ব কে করবেন? উলিয়ানভ? ভোট নেব? সর্বসম্মতিক্রমে। ভ্যাদিমির ইলিচ, আপনার জায়গায় গিয়ে বসুন।'

লেপেশিন্‌স্কি আর সিল্‌ভিন খাবার টেবিল আর বাড়ির যাবতীয় টুল বেঞ্চিগুলি এখানে এনে এমনভাবে সাজিয়েছেন যাতে ভানেয়েভ তাঁর বিছানায় শুয়ে সভাপতির মুখোমুখি থাকতে পারেন।

সভার প্রত্যেক সদস্যের জন্য নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না নিজের হাতে কুস্‌কভার 'ধর্মমত'-এর কপি করে রেখেছিলেন, ফলে পুস্তিকাটি উপস্থিত সকলেই ভালভাবে পড়তে পেরেছেন। পুস্তিকাটির উদ্দেশ্য যে শ্রমিকদের মার্কসবাদ থেকে সরিয়ে নিয়ে বিপ্লবী সংগ্রাম ও বিপ্লবী লক্ষ্য থেকে তাদের পথচ্যুত করা—এতে কারও সন্দেহ ছিল না। ১৮৯৯ সালে আগস্টের এই দিনে ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়েতে সমবেত সতের জন নির্বাসিত রাজনৈতিক কর্মীর কেউ কি এই 'ধর্মমত'-এর সমর্থক ছিলেন? না, কেউ না। তাহলে এই আলোচনা কেন?

অবশ্য লেপেশিন্‌স্কিদের ওখানে আলোচনা শুরু হয়েছিল। যাতে আনাতোলি বাদ পড়েছেন এমনটি তিনি না ভাবেন সেজন্যই ভানেয়েভের এখানে এটি চালিয়ে যাওয়ার এই ব্যবস্থা। সবারই মত: 'ধর্মমত' হল ইউরোপীয় ও রুশ শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে উদ্ভট ও কুৎসাপূর্ণ একটি অসত্য ভাষণ।

'বড় বড় কথার তুবড়ি ঢাকা একটি মিথ্যা! অর্থহীন শব্দাবলীর এক বাজে সংগ্রহ,' বললেন ভ্যাদিমির ইলিচ।

তাহলে শৌখিন সমাজের জনৈকা মক্ষিরাণীর এই অর্থহীন বাক্যসর্বস্ব বক্তব্যকে সরাসরি এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে না কেন? কুস্‌কভার সমর্থক কারা? তাঁর স্বামী জমিদারপুত্র সেগেই প্রকোপভিচ আর অভিজাত শ্রেণীর দু-চারটি ছাত্র? প্রভাব-

প্রতিপত্তিহীন, এমন সম্ভাবনাহীন একটা ছোট দলের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণার কী দরকার? কী জন্য?

মোটামুটি এই ছিল ফ্রিড্‌রিখ লেঙ্‌নিকের মত। দেখা হলেই তিনি আর ভ্লাদিমির ইলিচ দার্শনিক বিতর্কে মেতে ওঠেন। তারপর চলে এই বিষয়ে পত্রালাপ। এগুলিতে থাকে প্রতিভার দীপ্তি, শ্লেষ আর বিতর্কের দক্ষতা। কাটখোট্টা কালো দাঁড়িওয়ালা, ঘনকালো চোখের এই মানুষটি—যিনি কালো ভুরু নামিয়ে এই জগৎকে তীক্ষ্নভাবে নিরীক্ষণ করতেন—তাঁকে সত্যিকার মার্কসবাদী ভাবাদর্শে বিশ্বাসী করতে ভ্লাদিমির ইলিচকে কম হাঙ্গামা পোহাতে হয় নি।

ভ্লাদিমির ইলিচ লেঙ্‌নিকের বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান ও সততা সম্পর্কে খুবই শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু দার্শনিক বিতর্কে তিনি লেঙ্‌নিককে সব সময়ই কোনঠাসা করে ফেলতেন। তবু তাঁরা দুজনেই এই তর্কবিতর্ক উপভোগ করতেন।

‘লড়াই ঘোষণা করাটা উচিত হবে কি?’

ভ্লাদিমির ইলিচ ওয়েস্ট-কোটের ফাঁকে বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে চারদিকে চোখ পাকিয়ে তাকালেন।

‘এই লড়াই থেকে সরে যাওয়া কেন? মার্কসবাদী শ্রমিক আন্দোলন এখনো শুরুর পর্যায়েই রয়েছে আর সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পরিবেশে এর বিরোধীরা ইতিমধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছে। জার্মানিতে এর মারাত্মক বিরোধী এডয়ার্ড বার্নস্টাইন হলেন মার্কসবাদের সমালোচক। উনি মোটেই মৌলিক নন, এবং ভীরু। তবু খুবই বিপজ্জনক। উপদেশ যত সস্তা, যত ভীরুতাদুষ্ট, ততই তা অধিক সংখ্যক শিষ্যদের মন কাড়তে পারে। এডয়ার্ড বার্নস্টাইনের ‘ইকনমিজ্‌ম’-এর উপদেশামৃত সারা ইউরোপে মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ছে। তিনি সুবিধাবাদের প্রবক্তা। অর্থাৎ, তিনি চান শ্রমিকরা বলুক: প্রিয় প্রভুবৃন্দ, আমাদের কিছু কিছু সুবিধা দিলেই আমরা নিজের হাতে বিপ্লবের গলা টিপে ধরব। এটাই সুবিধাবাদের অর্থ! আমাদের রুশী কুস্‌কভা ও যাঁরা তাঁর মত পোষণ করেন, তাঁরা সকলে নির্লজ্জভাবে বার্নস্টাইনের ‘ইকনমিজ্‌ম’ ও সুবিধাবাদের তত্ত্বই আওড়ে চলেছেন। সুবিধাবাদ বাড়ছেই। এতে শ্রমিদের পথচ্যুতি ঘটে। আমরা কি লড়াইয়ে শরিক হব? অবশ্যই! সর্বথা। বিপ্লবে হেরে যেতে না চাইলে আমাদের এটাই কর্তব্য।’

‘ঠিকই বলেছ, ভলোদিয়া,’ চোখের ইশারায় স্ত্রী তাঁকে সমর্থন করলেন। তিনি তাঁর পরিকল্পনার শরিক, তাঁর ভাবনাগুলি জানেন। আর এই বক্তৃতাটি অনেক আগেই তাঁর জানা ছিল, তবু সমান উদ্দীপনায়, ভালবাসার অভিন্ন উষ্ণ অনুভূতিতে, কৃতজ্ঞতা ও গর্বে তাঁর মন ভরে উঠল।

এখানে, নির্বাসনে এসে তাঁরা ঘনিষ্ঠতর হয়েছেন। সকলের সঙ্গেই ভ্লাদিমির ইলিচের সমান সরল, আন্তরিক ব্যবহার। তিনি মোটেই উন্নাসিক বেখেয়াল বা

অকুশলী নন। সর্বদাই উদার, যত্নশীল, মনোযোগী। তিনি পূর্ণাঙ্গ, রহস্যময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর সঙ্গে বসবাস খুবই রোমাঞ্চকর।

আর যখনই তিনি তাঁকে বৈপ্লবিক মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দিতে শোনেন, তখনই — এমন কি ভানেয়েভদের মতো ছোট সমাবেশ হলেও — প্রতিবারই তিনি তাঁর নতুন উদ্যম, শক্তি, বিচারবুদ্ধি, যুক্তি, মনের জোর ও দীপ্তিতে সম্মোহিত হন।

'অনুক্ষণ তোমার সঙ্গে যে আছি এজন্যে আমি সুখী,' নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্না ভাবছিলেন। 'আমাদের আদর্শের, লক্ষ্যের অভিন্নতার জন্যে, তোমার পক্ষে প্রয়োজনীয় হওয়ার জন্যে আমি সুখী।'

হাত তুলে, অতি কষ্টে সমস্ত শরীরটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ভানেয়েভ বক্তব্য রাখতে চাইলেন। দমিনিকা বালিশ খাড়া করে তাঁকে আধ-বসা অবস্থায় থাকতে সাহায্য করলেন। ভানেয়েভকে তখন উদ্দীপ্ত, তরুণ ও আশ্চর্য সুশ্রী দেখাচ্ছিল।

'ছ'বছর আগে, আমরা পিটার্সবুর্গের ছাত্রছাত্রী — গ্লেব, মিশা সিল্ভিন, জিনা নেভ্জোরভা আর তুমি স্তারকভ,' ভানেয়েভ বললেন, 'বদ্ধ দরজার আড়ালে কার্ল মার্ক্স পড়েছিলাম। তারপর আসেন ভ্লাদিমির উলিয়ানভ। তিনি আমাদের ঘরে লুকিয়ে না থেকে শ্রমিকদের মধ্যে যেতে বললেন, মার্ক্সবাদের মতো একটি বিপ্লবী বিজ্ঞানের হাতিয়ারে শ্রমিক শ্রেণীকে সাজাতে বললেন। তিনি বলেন যে এতে অপরাজিত এক শক্তির উদ্ভব ঘটবে। কী ছিল সেটা? পূর্বানুমান? তাই। আমাদের অবশ্যই আগে দেখতে হবে। 'ধর্মমত' পুস্তিকাটি মারাত্মক। রুশ সুবিধাবাদের এটাই আরম্ভ। এখনই না আটকালে ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয়, দশম পর্যায়ে এটা পোঁছবে। এটা বন্ধ করা চাই। সুবিধাবাদীদের আমরা বৈপ্লবিক শক্তির ক্ষতি ঘটাতে দিতে পারি না। কঠোরভাবে এদের নিন্দা করা উচিত। আরও কঠিন হয়ে...'

'আমিও একমত,' ফ্রিড্রিখ লেঙ্নিক বললেন।

'আর এটা জানানও খুবই গুরুত্বপূর্ণ,' আসলে ভানেয়েভকে লক্ষ্য করে হলেও সকলের উদ্দেশেই ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন, 'সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হলেও আমরা মরে যাই নি, মরার ইচ্ছাও আমাদের নেই। বরং উল্টো, আমরা বাঁচতে চাই, কাজ করতে চাই...'

তারপর দাঁড়ালেন শাপোভালভ, ক্র্জিজানভ্স্কি, লেপেশিন্স্কিরা। প্রতিবাদপত্র পড়া ও অনুমোদিত হল।

এতে শুরুতে বলা হল:

'সতের জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোন এক এলাকায় (রাশিয়া) সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের এক সভায় সংবাদপত্রে প্রকাশ ও সকল সহকর্মীদের মধ্যে আলোচনার জন্য পাঠানোর উদ্দেশ্যে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।'

প্রতিবাদপত্রটিতে প্রথমে নিজের সই দেয়ার পর ভ্লাদিমির ইলিচ কলম ও দোয়াত

সহ সেটি ভানেয়েভের কাছে নিয়ে যান। ভ্লাদিমির ইলিচের পরই ভানেয়েভ একটা লম্বা সই দেন।

'সতেরজন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের' সেই সভার পর পর লেপেশিন্‌স্কিদের অতিথিরা নিজ নিজ গ্রামে ফিরে দৈনন্দিন কাজকর্ম শুরু করার পর একদিন সন্ধ্যায় কাজের ঘরের জানালাগুলিতে ভালভাবে পর্দা টেনে সবুজ শেডের বাতিটা জ্বালিয়ে ভ্লাদিমির ইলিচ ও নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না অদৃশ্য কালিতে প্রতিবাদপত্রের কয়েকটি নকল তৈরি করলেন। তুরুখান্‌স্ক, ভিয়াত্‌কা ও অন্যান্য জায়গায় নির্বাসিত রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে সেগুলি ডাকে পাঠান হল। ওঁদের সঙ্গে শুশেনস্কয়ের নির্বাসিতরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। আর আন্না ইলিনিচ্‌না উলিয়ানভা-এলিজারভাও একটি চিঠি পাবেন। সাধারণ চিঠি। সন্দেহজনক কিছু নয়।

'নাদিয়া'র সই দেয়া এই চিঠিটি পড়ার সময় আন্না ইলিনিচ্‌না ভাইয়ের সঙ্গে একযোগে বাছাই করা কয়েকটি চিহ্ন দেখে তা 'ফুটিয়ে তোলার' ব্যাপারটা আঁচ করতে পারবেন। তিনিও তখন জানালার পর্দা টেনে কাজে বসবেন। তারপর পুরো পরিবার জড়ো হবে খাবার ঘরে চায়ের আসরে: মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না, দ্‌মিত্রি, মারিয়া ও মার্ক। আন্না ইলিনিচ্‌না চিঠিটি নিচু গলায় পড়বেন, আর মা সোজা হয়ে বসে মন দিয়ে শুনবেন। বাইরে থেকে তাঁকে খুব শান্ত দেখালেও সরু হাতদুটি টেবিল-ঢাকনির কিনারে অস্থির হয়ে কেঁপে কেঁপে তাঁর নিরন্তর দুশ্চিন্তাটা ধরিয়ে দেবে। চিঠি পড়া শেষ হলে বলবেন:

'ভলোদিয়ার লেখার ধরনটা কেমন চমৎকার ধরা যায়!'

তারপর প্রতিবাদপত্রটি বিদেশে পৌঁছবে, ছাপা হবে রুশ ভাষায় গ. প্লেখানভের 'ভাদেমেকুম'* সংগ্রহে, আবার ফিরে আসবে দেশে। হাতে নকল করে, গোপনে ছাপিয়ে অথবা এই বিদেশী সাময়িকীতে একটি সংবাদ হিসেবে সকল শহরের শ্রমিক ও মার্কসবাদী দলের মধ্যে এটি বিলি করা হবে। শ্রমিকরা, সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ও বিপ্লবীরা এটা বুঝতে পারবে যে রাশিয়ার রাজনৈতিক জীবনের একটা কেন্দ্র কোথাও আছে, কোন এক জায়গায় রাজনৈতিক চিন্তা প্রবলভাবে স্পন্দিত হচ্ছে, বৈপ্লবিক পরিকল্পনা পরিপক্ক হয়ে উঠছে, প্রবল শক্তির তোড়ে জীবনে আলোড়ন জাগছে। কিন্তু কোথায়? কেউ কি জানবে যে এই কেন্দ্রটি রয়েছে সাইবেরিয়ার শুশেনস্কয়েতে? কেউ কি কোন দিন শুনেছে এই গাঁয়ের নাম?

---

* 'পথনির্দেশক'।

'আমাকে এ-ঘরেই থাকতে দাও,' ভানেয়েভ স্ত্রীকে বললেন।

গতকালের উত্তেজনার পর এখন তিনি অসম্ভব দুর্বল। চোখ বুজে শুয়ে আছেন। তাঁর মুখটি সাদা, যেন মার্বেল-খোদাই। মুখে অদ্ভুত ম্লান, শান্ত হাসি। জীবনের চিহ্ন বলতে বন্ধ চোখের পাতার সামান্য কাঁপুনি। বোজা চোখ আর মুখের এই হাসির রেশ দেখে দমিনিকার কান্না পেল। কিন্তু গতকাল ওঁর বক্তৃতার কথা মনে পড়তেই রুমাল কামড়ে ধরে নিজেকে সামলালেন।

'আমি কিছুই ভয় করি না,' নিজেকে বললেন। 'ও যতক্ষণ বেঁচে আছে, কিছুই আমাকে টলাতে পারবে না।'

ভ্ল্যাদিমির ইলিচ দেখলেন দমিনিকা দেউড়িতে দাঁড়িয়ে — মুখে রুমাল, বিষণ্ন চাহনিতে ভুরু কোঁচকান। দেউড়ির কাছে গিয়ে যাতে উনি শুনতে পান সেজন্য মাটিতে জোরে পা ঠুকলেন।

'আপনি সব সময় আমাদের জন্যে কিছু একটা আশা নিয়ে আসেন,' দমিনিকা বললেন।

ভ্ল্যাদিমির ইলিচ নুয়ে তাঁর হাতে চুমু খেলেন। মা আর স্ত্রী ছাড়া কারও হাতে তিনি চুমু খান না।

একটি টুল টেনে ভ্ল্যাদিমির ইলিচ বিছানার পাশে বসলে ভানেয়েভ তাঁর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকলেন। তবু মনে হল এই দৃষ্টিতে যেন আনন্দের আঁচ লেগেছে।

খোলা জানালা দিয়ে এক ঝলক বাতাস ঘরে এল। সাদা মেঘ আকাশে ভেসে চলেছে... তাঁর দেশ নিজনিতে ভোলগার উপর দিয়ে এমনি মেঘ ভেসে যায়। সেখানে উঁচু পারে দাঁড়ালে নদীর ওপারের মাঠ, মাঠের সবুজে ছড়ান ছোট ছোট বিলের নীলিমা চোখে পড়ে। তারপর দূরে দিগন্তে নীলাভ বনের রেখা। চোখের সামনে অসীম বিস্তার, চলমান রেখা, শান্ত সমাহিত বর্ণালী... চোখ জুড়িয়ে যায়, মনে হয় সুখের অতলে হারিয়ে যাই। মহিমময়ী ভোল্‌গা — তোমার তীরের মাঠ, গাঁ, তোমার পারের কাদামাটির ঢালে আবাবিল পাখির বাসা। প্রিয়তম দেশ, আমার জন্মভূমি!

ভানেয়েভ খুব তাড়াতাড়ি কথা বলতে লাগলেন, যেন মনের সবগুলি কথা বলার সময় ফুরিয়ে যাবে বলে ভয় পাচ্ছেন, যেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রকাশ করবেন তাঁর যে আর সময় নেই। এগুলি নিজের সঙ্গে তো নিয়ে যাওয়া চলে না। ঈশ্বর, কীসব যেন মাথাটা ঘুলিয়ে দিচ্ছে, দিশেহারা করে ফেলছে। দিশেহারা হলে তাঁর চলবে না। মোটেই না! তাঁকে তাড়াহুড়া করতে হবে। ভ্ল্যাদিমির

ইলিচ বেশিক্ষণ থাকবেন না। বাইরে ঘণ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে। শরৎ এসে পড়বে। কবে আবার তাঁদের দেখা হবে কে জানে...

'কখন কখন আমার মনে হয় আমি যেন এই পৃথিবীতে অনেক অনেক বছর থেকে আছি। আর সত্যিই তো, সাতাশ বছর কি খুবই কম? লেরমন্তভ তো ওইটুকুই বেঁচেছিলেন। চের্নিশেভ্স্কি সাতাশ বছর বয়সেই দুর্দান্ত সমালোচক হয়ে উঠেছিলেন। আর মার্কস! দার্শনিক, বস্তুবাদী, বিপ্লবী হিসেবে দর্শনের জীর্ণ জঞ্জালগুলি পুড়িয়েছেন। এবং আপনি, ভ্লাদিমির, সাতাশ বছরে কেমন ছিলেন? না, আমাকে চুপ করতে বলবেন না। কোন তুলনা করছি না। শুধু আপনাকে দেখতে বলছি। তা না হলে আপনি যে আমার কাছে কতটা, সেটা আর কোনদিন হয়ত বলা হবে না। কেউ যখন এমন কিছু স্বীকার করে, আপনি জানেন, তখন সে খোশ মেজাজেই থাকে... একেবারে ছেলেবেলা থেকেই আমি মহত্তম বন্ধুত্বের স্বপ্ন দেখেছি। আমি ঘুমোতে পারতাম না। ভোর পর্যন্ত জেগে থেকে ভাবতাম আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর কথা, যার জন্যে আমি স্বেচ্ছায় জীবন দিতে পারি, যাকে আমার জীবন সঁপে দেব। হয়ত কেঁদেও ফেলতাম... তারপর আমার জন্যে পিটার্সবুর্গে যা অপেক্ষিত ছিল তা নিজের উন্মত্ততম স্বপ্নকেও হারিয়ে দিল। আমি সাধারণ মানুষ, শুধু জানি আদর্শ সম্পর্কে আমার মনে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু, সব মিলিয়ে আমি সাধারণই। সে যাই হোক, আমার জীবন তবু সাধারণ নয়। আর সেটা হয়েছে পিটার্সবুর্গে 'সংগ্রামী লীগে' যোগ দেয়ার জন্যেই। এতেই আমার জীবনে অনন্যতার ছোঁয়া লাগে। পুলিশ আর রাজকীয় রক্ষীবাহিনী বোঝাই এই বিশাল পাথুরে শহরে, শীত প্রাসাদ থেকে নদীর ওপারের পিটার-পল দুর্গের সামনে, রাজনৈতিক অপরাধীদের কয়েদখানার কাছে আর হাতের ধারে শ্লুসেনবার্গ দুর্গ থাকতে কীভাবে এত বড় একটা নতুন শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠল — এখন ভাবছি, আমাদের মৃত্যুর অনেক পরেও ব্যাপারটা ঐতিহাসিকদের কাছে এক রহস্য হয়ে থাকবে।'

'এর কারণ... তুমি যা বলছ, আনাতোলি... এটা আর কিছু নয়, বিকাশেরই এক নিয়ম। এর কারণ রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী এটাই চেয়েছিল...'

'বিভ্রান্ত ঐতিহাসিকরা সম্ভবত তখন আমাদের পিটার্সবুর্গ যুগটি নিয়ে অনুসন্ধান চালাবেন,' ভানেয়েভ বলে চললেন। 'মাত্র আড়াই বছরের মধ্যেই মার্কসবাদী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠল! বেঁচে থাকতে আমার দারুণ ইচ্ছে হচ্ছে! গতকাল থেকে জীবনের এক প্রবল ঢেউ আমাকে তুলে নিয়ে সামনে চলছে। সে ঢেউ আমাকে বয়ে নিয়ে যাবে, সাগর তলে ডুবিয়ে দেবে না... আমি সেই সুখ চাই যা হবে খুব বড়। আমি সেই কাজ চাই যা হবে বিরাট!'

'বড় কাজ, বিরাট সুখ সবই আপনার হবে,' ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন। 'নির্বাসনের মেয়াদ তো আর মাত্র পাঁচ মাসের মতো। শেষটা এখন দেখাই যাচ্ছে। এই ক'টা মাস

বুদ্ধিসুদ্ধি খাটিয়ে আমাদের থাকতে হবে যাতে আর মেয়াদ না বাড়ে। তবে মনে হয় না এজন্যে ভয়ের কিছু আছে। আর তারপর... আনাতোলি, তোমাকে অবশ্যই ভাল হয়ে উঠতে হবে, প্রাণপণে চেষ্টা কর... শোন, কেন গোরুর তাজা দুধ খাচ্ছ না? যতটা পার। দুধে লোকে মোটা হয়। তোমার একটু মোটা হওয়া দরকার। রাশিয়ায় ফিরে গেলে ডাক্তাররা আবার তোমাকে পায়ের উপর ঠিকই খাড়া করে দেবেন আর তখন... আনাতোলি, তোমার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলব। তোমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হুঁশিয়ার হতে হবে না আমাকে। তুমি বুদ্ধিমান। আমার মনে আছে, কী চৌকশ ষড়যন্ত্রীই না ছিলাম আমরা পিটার্সবুর্গে। তুমি তখন ছিলে মিনিন। আর তাই, প্রিয় মিনিন, জানতে চাও, কী ধরনের কাজ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমরা না থাকায় পার্টি ভেঙ্গে গেছে। আমরা যখন জেলে আর নির্বাসনে...'

'আমরা গোড়ার কাজটা করেছিলাম।'

'আমরা জেলে বা নির্বাসনে থাকার সময় মিন্স্কে প্রথম কংগ্রেস হল। দাঁড়ানোর আগেই এটাকে ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা শুরু হয়ে গেল। গ্রেপ্তারের হিড়িক পড়ল। আরও গ্রেপ্তার। আর অন্যদিকে গজিয়ে উঠল জার্মান বার্নস্টাইন আর রুশী কুস্কভারা। আমরা আর কী করব? সত্যিকার প্রলেতারিয়েতের পার্টির জন্য লড়াই করব। অন্য সবকিছুর আগে এ কাজটাই আমাদের করতে হবে। গতকালের প্রতিবাদ সভায় এটা আমরা বলেছি। কী নিয়ে আমরা লড়ব, আনাতোলি? কীভাবে? সারা দিন আমি তাই ভাবি। নানা দিক থেকে প্রশ্নটি নিয়ে নিজের সঙ্গে আলোচনা করি। আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে কেবল একটাই পথ, একটাই পথ রয়েছে। একটা খবরের কাগজ বের করা! নির্বাসন থেকে ফিরে গিয়েই এতে হাত লাগাতে হবে। বেআইনী কাগজ! বিদেশে ছাপার। আর রাশিয়ায়, পিটার্সবুর্গ আর মস্কোয় ত বটেই — ওরেখভো, ইভানভো, ইয়ারোস্লাভ্ল, বাকু, কিয়েভ, নিজনি নভ্গরদের মতো সবগুলি শিল্পকেন্দ্রে আমাদের লোকেরা গোপনে এগুলো বিলি করবে, আমরা আমাদের গুপ্ত সংবাদদাতাদের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রেখে চলব। এই কাগজের মধ্য দিয়েই রাশিয়ায় কী ঘটছে আমরা সেটা শ্রমিকদের কাছে ব্যাখ্যা করব, আমরা শ্রমিক, কৃষক, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লবে শরিক হওয়ার জন্যে ডাক দেব। এই খবরের কাগজের সাহায্যেই আমরা এক নতুন, বিপ্লবী, প্রলেতারীয় পার্টি গড়ে তুলব। শোন, আনাতোলি... এই ঘৃণ্য সরকার অনেককেই ধ্বংস করেছে, বহুজনকে। ডিসেম্ব্রিস্ট, নারোদনিক-রা হাজার হাজার সেরা কর্মী। আমরাও প্রাণ দেব, তবে জয় আমাদের হবেই...'

সম্মোহিত ভানেয়েভ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে তাঁর আশা জাগল।

আরেকবার এই লোকটি, তাঁর চৌকশ সহকর্মীটি তাঁকে চলার পথ দেখাচ্ছেন — বিপজ্জনক, তবু বাস্তব। ভানেয়েভ ভাবতে লাগলেন: 'আমরা এখনো নির্বাসনে। কিন্তু কী আসছে সেটা আমরা জেনে গেছি। খবরের কাগজ। পার্টি। বিপ্লব। নতুন সমাজ। আমরা উদার, মহৎ, বিচক্ষণ একটি সমাজ গড়ব। সে সমাজ উদার, বিচক্ষণ না হয়ে যদি অন্য রকম কিছু হয়, পুরনো সমাজ থেকে যদি হিংসা আর দম্ভ এখানেও আশ্রয় নেয়, তাহলে কে দায়ী হবে? আমরা তোমাদের জানাতে চাই, তোমরা যারা এই নতুন সমাজে বসবাস করবে, আমরা তোমাদের জন্যে সর্বোত্তমকেই চেয়েছিলাম। মনে রাখবে, অবশ্যই মনে রাখবে, অঢেল ঘাম আর রক্তের মূল্যেই এই সমাজ আমরা কিনেছি। নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের মানুষ, তোমরা যেন সাহসী হও, উদার হও!'

'কাগজের নামটাও আমাদের ভাবতে হবে,' ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন। 'নামের মধ্যে সেই ভাবটা থাকা চাই। এটা খুবই জরুরি। জান আনাতোলি, আমি সব সময়ই কাগজটার কথা ভাবি। এটাই আমার মন জুড়ে আছে। নির্বাসনের মেয়াদ যতই শেষ হয়ে আসছে আমি ততই যেন অস্থির হয়ে উঠছি। আমি জানি, এটা আমাকেই করতে হবে। অঢেল কাজ। আচ্ছা, কাগজটির নাম 'ইস্ক্রা' দিলে কেমন হয়? কেমন লাগে তোমার?''

ভানেয়েভের আরও কাছে তিনি এগিয়ে গেলেন। তাঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ভাবী কাগজটির নাম নিয়ে তিনি অনেকটাই ভেবেছেন। 'ইস্ক্রা'! এটাই তাঁর মনে ধরেছে। স্ফুলিঙ্গ — এতে রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে আর আছে চমৎকার কাব্যিক এক শ্রুতিমাধুর্য।

> 'খনির গভীর বন্দী সাইবেরিয়ায় —
> ধৈর্য ধর, অক্ষুণ্ন রাখিয়ো অভিমান...'

তিনি আবৃত্তি করলেন।

'আমরা পুশকিনের ভক্ত। নাদিয়া আর আমি,' তিনি বললেন। 'না, ভক্ত শব্দটা সঠিক নয়। পুশকিন আমাদের প্রাণ। আর বিটোভেন। তবে, মাঝে মাঝে নিজেকে অবশ্যই সামলাতে হয়। পুশকিন আর বিটোভেনকে সরিয়ে রাখতে হয়। এখানে, এই সাইবেরিয়ায়, এই হতশ্রী শুশেনস্কয়েতেও ডিসেম্ব্রিস্টদের চেতনা টের পাওয়া যায়।

> 'ভেঙে পড়বে অসহ্য বেড়ি আর সেল যাবে খুলে —
> মুক্তি... মুক্তি বাহু তুলে জানাবে স্বাগত...

'যখন খুব ছোট তখন কেবলই চিতা শহর, ঘূর্ণিঝড় আর অসম্ভব ঠান্ডা কল্পনা করতাম। তাঁবুর চারদিকে খুঁটির বেড়া, পায়ে বেড়ি পরা ডিসেম্ব্রিস্টরা। পুশকিনের সেরা কবিতা। আর তাঁদের জবাব...'

'আর তাঁদের জবাবও!' তড়িঘড়ি ভানেয়েভ বললেন এবং দ্রুত পুনরুক্তি করলেন:

'আমাদের হাড়ভাঙা খাটুনি বৃথা যাবে না,
স্ফুলিঙ্গ থেকে হবে অগ্নিশিখা!'

'আর সেজন্যই 'ইস্ক্রা'! তাই না, আনাতোলি? স্ফুলিঙ্গ থেকে হবে অগ্নিশিখা। সময়, একটু জলদি চল! তবে আমাদের বুদ্ধি খাটাতে হবে, বাকী ক'টি মাস একটু হুঁশিয়ার থাকাই ভাল। দেখতে হবে, যাতে মেয়াদটা না বাড়ে। ভাল হয়ে ওঠ, প্রিয় আনাতোলি, বিজ্ঞ বন্ধু আমার। অসুখটিকে জেঁকে বসতে দেবে না। এটাই আসল কথা। সামনে অঢেল কাজ। খবরের কাগজ, পার্টি। আনাতোলি, তোমার মতো মানুষ ছাড়া পার্টি চলবে না। পার্টি আর শ্রমিক শ্রেণীর জন্যে তুমি বড় প্রয়োজন, প্রিয় বন্ধু আনাতোলি!'

ভ্যাদিমির ইলিচ ভানেয়েভের হাতে সামান্য চাপ দিলেন, কম্বলটা ঠিক করে দিলেন, তাঁর কপাল থেকে ভেজা চুলের একটা ভারী গোছা আলতোভাবে সরালেন।

* * *

...ভানেয়েভ আবার নৌকায় ভেসে চললেন। ইদানীং কেবল চোখ বুজলেই ভোল্‌গার খাড়া পার বরাবর নৌকায় ভেসে চলা যায়। নদীতে ছোট ছোট নৌকার দ্রুত যাওয়া-আসা। ঘাট ছেড়ে ওপারে ধীরেসুস্থে চলেছে ভারিক্কি ফেরি, বোঝাই-করা ঘোড়ার গাড়ি আর দাঁড়িয়ে থাকা গাঁয়ের বৌ-ঝিদের দল — মাথায় বিভিন্ন রঙের উজ্জ্বল রুমাল, পাশে খালি ঝুড়ি, জঙ্গল থেকে বৈঁচি আর বেঙের ছাতা নিয়ে বেচতে গিয়েছিল শহরে। 'কাভ্‌কাজ ও মার্কুরি' জাহাজ কোম্পানির একটি সাদা স্টিমার আসছে। হর্ণের কোমল শব্দ জলের ওপর স্বাপ্নিল আবেশ ছড়াচ্ছে। জাহাজের ঢেউয়ে আনাতোলির নৌকাটি আছাড় খাচ্ছে।

'তোল্‌, প্রিয় তোল্‌!'

তিনি চোখ খুললেন। নিকা।

'তোমার কী খারাপ লাগছে? ভেবেছিলাম... কী আহাম্মক আমি। তুমি একটু ঘুমিয়েছিলে।'

'আমি ঘুমোই নি। তাঁরা চলে গেছেন? দিনগুলো আমার বড়ই ছিল কাজের! নিকা, আমি এখনো কাজে লাগতে পারি। জান, সেটা হল ওষুধের চেয়েও ভাল। দেখবে, এই দিন থেকে কত তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠি। কাজে আমার ভাগটা আমাকেই তো করতে হবে। কেবল নিজেকে, নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবলে বেঁচে থাকার কোন আনন্দই থাকে না। সত্যি? আমার মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে...'

'তোমার কাছে একটুক্ষণ বসি, তোল্। তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না, তোল্।'

মুচকি হেসে ভানেয়েভ হাত বাড়িয়ে দমিনিকার কোল ছুঁলেন।

'অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের সন্তান তোমার কোলে আসবে। তখন আমরা হব তিন জন। তোমাকে একটা কথা বলার ছিল। যদি ছেলে হয়...'

'অনেক আগেই তা ভেবে রেখেছি। ছেলে হলে আমার দুজন তোল্ হবে। বড় তোল্ আর ছোট তোল্।'

'ওর গলা শুনতে ভারি ইচ্ছে করে।'

'আর যদি রাতভোর চেঁচায়?'

'চেঁচাক। ততদিনে ভাল হয়ে উঠব। আমরা পালা করে রাত জাগব। জান, ভ্লাদিমির ইলিচ আমাকে প্রাণ দিয়ে গেছেন। গন্তব্য আর কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্টাস্পষ্টি জানাটাই আমার পছন্দ। হয়ত আমাদের কচি তোল্ অন্য সমাজে বড় হবে। আমার ইচ্ছে, সে একটু তাড়াতাড়ি আসুক।'

'ওর কথা শুনতে চাও?' বললেন নিকা এবং তাঁর হাত নিজের পেটে চেপে ধরলেন। 'বুঝতে পারছ ওর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি?'

ভানেয়েভ কিছুই বুঝতে পারলেন না। তবু সামান্য ভুরু কুঁচকে মুখে একটা সুখী ভাব ফোটালেন, যেন বুঝতে পেরেছেন। এতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।

'নিকা, আমার কাছে থাক। একটু জিরিয়ে নিই।'

পাছে নৌকা তাঁকে দোলাতে শুরু করে আর দূরে নিয়ে যায়, তাই চোখ বুজলেন না।

'বলছিলাম কী, বইটা বালিশের নিচ থেকে বের কর...'

বালিশের নিচে হাত ঢুকিয়ে নিকা বইটা বের করলেন। চেখভের নাটক-সংগ্রহ। সম্প্রতি নিজনি নভ্‌গরদ থেকে পাওয়া।

''কাকা ভানিয়া'র ওই অংশটা আবার পড়। ওখানটায় দাগান আছে...'

পাতাটা খুঁজে পেয়ে তিনি পড়তে লাগলেন।

''দেবদূতের গলা আমরা শুনতে পাব। আমরা দেখব সারা আকাশ হীরেয় হীরেয় জ্বলজ্বল করছে। আমরা দেখব করুণাধারায় পার্থিব সকল পাপ, আমাদের সকল দুঃখকষ্ট ডুবে গেছে, সারা দুনিয়ায় তার বান ডেকেছে...''

'যথেষ্ট। তোমার গলা ভেঙ্গে যাচ্ছে। তুমি উতলা হয়ে পড়েছ। তোমার জন্যে খুবই খারাপ, পেটে সন্তান। খানিকটা দিবাস্বপ্ন দেখা যাক, কী বল? ইয়েরমাকভ্‌স্কয়ের একটা ছবি আঁকি। তবে এখনকার ইয়েরমাকভ্‌স্কয়ে — বেড়ার ওধারে শেকলে বাঁধা কুকুরের চিৎকার, উঠোনে পচা গোবরের ঢিপি, সারা গাঁয়ে তরতাজা পাতা বলতে কিছু নেই, এজন্যে যেতে হবে তাইগায়... না, আমি অন্য এক

ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়ের ছবি আঁকব: বিশাল এক আপেল বাগান, মাইলের পর মাইল ফুল ফোটার সময় মনে হবে, যেন স্পন্দমান এক ধবল সমুদ্র, মৌমাছি গুঞ্জনে মুখরিত... আর শরতে, খুব ভোরে বেরিয়ে এলে দেখবে সারা বাগানে শিশির জ্বলছে, রাতে গাছ থেকে পড়া অঢেল রাঙা আপেল মাটিতে...'

তিনি থেমে থেমে কাশতে লাগলেন। মুখ থেকে এক ঝলক কালো রক্ত সাদা শার্টে ছড়িয়ে পড়ল। চোখে যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'তোল্‌, তোল্‌ আমার! তুমি ভাল হয়ে উঠবে, এসব কেটে যাবে!' থুতনিতে লাগা রক্ত মুছতে গিয়ে রুদ্ধশ্বাসে দমিনিকা বলে চললেন।

'তোল্‌, তুমি ভাল হবে, ভাল হয়ে উঠবে,' মন্ত্রের মতো তিনি আওড়ে বললেন, 'তুমি ভাল হবে তুমি ভাল হয়ে উঠবে।' এবং হঠাৎ খোলা জানালা দিয়ে বিদ্যুতের মতো কিছু ঘরে ঢুকে আঁকাবাঁকা উড়ে কোণের দিকে মিলিয়ে গেল।

নিকা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন, হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

'ভয় পেও না, নিকা। একটা পাখি। হঠাৎ ঢুকে গেছে।'

কিন্তু দমিনিকা নিজেকে থামাতে পারলেন না। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে জোরে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

'কেঁদো না নিকা। কেঁদো না,' বিষণ্ণ গলায় ভানেয়েভ তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলেন।

॥ ১৬ ॥

শীত আর হাওয়া নিয়ে এল সেপ্টেম্বর। সায়ান ঢাকা পড়ল মেঘে। গ্রীষ্মের শীর্ণা শুশা হল ধূসরা স্রোতস্বিনী। ঠান্ডার জন্য ভ্লাদিমির ইলিচ গায়ে ওয়েস্ট-কোট চড়িয়েছেন। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ডেস্কের পেছনে, অভ্যাসমতো বুড়ো আঙুলগুলি বগলের নিচে ঢোকান। খুব ভোরে উঠেছেন। দুপুর পর্যন্ত একটানা কাজ করার ইচ্ছে। খুবই জরুরি কাজ: রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির খসড়া কর্মসূচি তৈরি। এতটা চিন্তাচ্ছন্ন যে জানলার বাইরে হঠাৎ মেঘ গর্জন করে উঠলেও খেয়াল করতেন না।

কিন্তু ঘরে নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌নার উপস্থিতি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। উনি টেবিলে কিছু একটা লিখছিলেন। তাঁর সান্নিধ্যে ভ্লাদিমির ইলিচ খুশি। কাজ করার সময় স্ত্রীর মিষ্টি মুখশ্রীতে যে আশ্চর্য উদ্ভাস ফোটে, সেটা লক্ষ্য করেন। নারী-শ্রমিকদের জন্য নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না একটি পুস্তিকা লিখছিলেন। কারখানায় ওদের মধ্যে প্রচার চালানোর সময় আনুষঙ্গিক তথ্যগুলি তিনি পিটার্সবুর্গে

থেকে সংগ্রহ করেন। নদীর ওপারে নেভা গেটের লাগোয়া থর্নটন কারখানার অভিজ্ঞতাগুলিই বিশেষভাবে তাঁর মনে পড়ছিল। মেয়ে-তাঁতিদের কাজগুলি ছিল খুবই কঠিন। অসহ্য রকম কঠিন! তাদের যৌবন ঝরে পড়েছিল, শরীর শুকিয়ে গিয়েছিল, মন কুঁকড়ে যাচ্ছিল, বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষাও তারা হারিয়ে ফেলেছিল। ভেজা, বদ্ধ কারখানায় এক নাগাড়ে বার ঘণ্টা বিরতিহীন তাঁতে দাঁড়িয়ে থাকার অসহ্য যন্ত্রণা তারা সইত। ধুলোর জন্য বুকে ব্যথা হত, চোখ জ্বালা করত। কী ভয়ঙ্কর জীবন! অভিশপ্ত স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিজেরা এগিয়ে না এলে, লড়াইয়ে যোগ না দিলে, এ থেকে মুক্তির কোন পথ ছিল না।

এ-নিয়ে স্পষ্টভাবে, সরলভাবে কিছু লেখার জন্য নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্না ভাবছিলেন। তিনি চান: এটা হবে খুবই সহজবোধ্য আর এইসঙ্গে বিশ্বাসযোগ্যও। সেইসব নারী-শ্রমিকদের উদ্দেশেই পুস্তিকাটি লেখা হবে। তাদের ক্লান্ত মুখগুলি, নিষ্প্রভ চোখগুলি তাঁর সামনে ভাসছিল। তাদের যন্ত্রণা তাঁর মধ্যে সংক্রামিত হল। তাদের শোষকদের বিরুদ্ধে তাঁর মনে সঞ্চারিত প্রচন্ড ঘৃণাবোধকে তিনি জ্বলন্ত, হন্তা ভাষায় রূপ দিতে চাইছিলেন। কিন্তু এই শব্দাবলী তো সহজ সাধ্যায়ত্ত নয়। প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা তিনি বারবার লিখলেন। তাঁর একমাত্র ভাবনা: বইটি যেন বিপ্লবের আদর্শ পূরণে অন্তত কিছুটা কার্যকর হয়। ভলোদিয়া এতে মত দিয়েছেন এবং এজন্য তিনি খুবই খুশি।

নিঃশব্দে তাঁরা আরও দু'ঘণ্টা কাজ করলেন, ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে চলছিল শুধু কলমের খস্খস্ শব্দ।

দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দেয়ার শব্দ শুনে নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্না স্বামীর দিকে একনজর তাকালেন। কিন্তু মনে হল তিনি ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে কিছুই শুনতে পান নি। পাণ্ডুলিপিটি সরিয়ে রেখে তিনি বাইরে গেলেন।

'ভলোদিয়ার কাছে কে যেন এসেছে,' তাঁর মা বললেন। তাঁরা কিছুক্ষণ ফিস্ফিস্ করে পরামর্শ করলেন। ভলোদিয়াকে কাজ ছেড়ে আসতে বলা তাঁদের ইচ্ছা নয়। কিন্তু কী করা? বুড়ো মানুষটি ত্রিশ মাইল দূরের গাঁ থেকে এসেছে। তাকে খালি হাতে বিদায় করা? কৃষকদের কখনই ভ্লাদিমির ইলিচ ফিরিয়ে দেন না — সে তারা যখনই আসুক।

লোকটিকে পড়ার ঘরে আনা হল। তার হাতে লাল কাপড়ে জড়ান একটি মাখনের বয়াম। ঘরে ঢুকে সামনের কোণে আইকন খুঁজতে খুঁজতে আর ওটি না পেয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে তড়িঘড়ি সে ক্রুশ আঁকতে লাগল। জানালার বাইরে শরতের একটি পলকা চারাগাছ বাতাসের তোড়ে করুণভাবে দুলছিল। দূরে সায়ান পাহাড় ঢাকা পড়ছিল মেঘে।

'বসুন।'

ভয়ার্ত চোখে পিটপিট করে তাকিয়ে বুড়ো টুলের ধারে মেঝেতে আস্তে আস্তে তার পুঁটলিটা রাখল এবং শেষে বসল। ভ্লাদিমির ইলিচ ডেস্কের পেছনে দাঁড়ালেন, বুড়ো আঙুল বগলের নিচে। মাথাটা একপাশে হেলিয়ে তিনি আগন্তুকের কাহিনী শুনতে লাগলেন। দেখতে যতটা মনে হয় আসলে লোকটা ততটা বয়স্ক নয়। গোল করে ছাঁটা চুল আর দাড়ি রোদে পুড়ে পুড়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে, পেকে যায় নি। মুখের দাগগুলিও বলিরেখা নয়, শ্রমের, অযত্নের ফল। তার গায়ে মুড়ি-সেলাই করা পেটি-হীন শার্ট আর পুরনো, জীর্ণ কোট। নাম — সিদর মার্কভিচ।

'বলে যান, সিদর মার্কভিচ,' ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন।

জানালার দিকে তাকিয়ে, চোখের জল মুছে মুছে সে দীর্ঘ এক কাহিনী বলে গেল।

'আমাদের ঘোড়া আছে, আমরা কাঙাল নই। এখন ফসল মাড়াইয়ের সময়। আমার স্ত্রী গেছে ঘুড়ীটা নিয়ে তার ভাইয়ের কাছে। আমরা তাদের, তারা আমাদের সাহায্য করে। এছাড়া চাষাবাদ তো চলে না। আমি চলেছিলাম হেঁটে। এতে আমি হয়রান হই না। আমি দিনে পঞ্চাশ ভার্স্ত* পর্যন্ত হাঁটতে পারি। তবে গরমের দিনে। শরতের সময় এতে রাত গড়িয়ে যায়। রাতের আগে যে পারা যাবে না, এটা হিসাবে ধরতেই হয়। অজান্তেই হয়ত ঝড়ো বাতাস শুরু হয়ে যাবে, সায়ান থেকে নেমে আসবে বরফের ঝড়। আমাদের এলাকায় এটা হামেশাই ঘটে। আপনি তো জানেন। মানুষজন পথ হারিয়ে শেষে নিজের বাড়ির ফটকে পেঁছেও মারা পড়ে। আর আমার সাতে সাতটা কাচ্চাবাচ্চা। ওদের তো আর এতিম বানাতে পারি না।'

সে কিছুতেই মূল কথাটায় আসতে পারছিল না। কেবলই এলোপাতাড়ি ঘুরছিল। কিন্তু ভ্লাদিমির ইলিচ তাড়া না দিয়ে ধৈর্যের সঙ্গে তার কথা শুনছিলেন।

ঘটনাটা হল এই। আঠার বছর বয়সী বড় মেয়ে আন্‌ফিসা গাঁয়ের জোতদারের খামারে কাজ নিয়েছে। অবশ্য, মা-বাবার মত নিয়েই। বছরে বেতন বিশ রুব্‌ল। সে বাগদত্তা কিন্তু তেমন কিছু যৌতুক তার হাতে নেই। কিছু একটা জাঁকালো পোশাক তার চাই আর সেজন্যই এই কাজ নেওয়া। তার পছন্দের ছেলেটা ভালই। ভাবী শ্বশুরের অঢেল বিষয়-সম্পত্তি না থাকলেও গতর খাটালে অভাব হওয়ার কথা নয়। আন্‌ফিসার সব ভালই চলছিল। বিয়ের দিনও ঠিক: মেরি মাতার পরবের পরের রবিবারে। এক সপ্তাহ আগে, একেবারে হঠাৎ সে বাড়িতে ছুটে এল মারাত্মক অবস্থায়। মুখ কাগজের মতো সাদা। সে আর তার মা ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে দরজা দিয়ে কাঁদতে শুরু করল। সে দরজা ধাক্কাতে লাগল। কিন্তু ওরা খুলল না...

রাখালরা বাথান থেকে গোরু নিয়ে ঘরে ফেরার পরই কেবল ওরা দরজা খুলল।

---

* প্রায় এক কিলোমিটারের সমান দৈর্ঘ্যের মাপ।

আন্‌ফিসাকে কিছু খাওয়ান গেল না। সে রুমাল টেনে মুখ ঢাকল। তার মলিন মুখের কাছে রাতের অন্ধকারও হার মানল। মরার মতো অবস্থা তার। বাবা ভাবছে: বিপদে পড়েছে বেচারী! বিপদ ঘটে নি, তবে তার উপক্রম হয়েছিল। ওই মালিকের ছেলে। আন্‌ফিসাকে সে শান্তিতে থাকতে দেবে না। অন্ধকারে সুযোগমতো সে আন্‌ফিসার উপর হামলার চেষ্টা চালায়। প্রথমে মেয়ে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করে। পরে রাগ দেখায়। কিন্তু তাকে থামানো মুশকিল। সে কেবল বলাৎকারই বাকি রাখে, কিন্তু হুমকি দেয়। তাই মেয়েটা বাড়ি ছুটে এসেছে। এখনো মাসেকের কাজ বাকি। তারপরই মেরি মাতার পরবের দিনে বছর পুরো হবে। কিন্তু সে তো চলে এল। ওরা এখন বলছে আন্‌ফিসাই কড়ার ভেঙ্গেছে। ওর পাওনা দেবে না। তাহলে এই এগার মাস সে যে কাজ করল তার কি কোন দাম নেই?

'তা-ই,' বিষণ্ণ স্বরে ভ্যাদিমির ইলিচ বললেন। ডেস্ক থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে তিনি জানালার ধারে গেলেন। ওখানে ফ্রেমে হেলান দিয়ে নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না দাঁড়িয়ে, মোটা বিনুনির ভারে মাথাটা পেছনে হেলান।

'তাই, বলছেন?' সিদর মার্কভিচ বিভ্রান্ত। 'মানে, আপনি বলছেন, ঠিকই করেছে। কেন, মেয়েটা যৌতুকটা জোগাড় করার জন্যেই কাজ করছিল। বারো মাসের মধ্যে এগার মাস সে খেটেছে। আর শেষ মাসটা সে থাকতে পারল কৈ? বেচারীর উপর হামলা শুরু হল। শেষ মাসটা আর টিকতে পারল না। হবু জামাই হয়ত জেনে যেত। ছেলেটা ভাল। তারা একে অন্যকে ভালবাসে। সে আন্‌ফিসার পথ চেয়ে আছে। জানতে পারলে ওই বদমাশটার সে হাড় গুঁড়িয়ে দেবে। আদালতে তার কোন সুযোগই থাকবে না। তারপর সে আর আন্‌ফিসার সারা জীবনটাই নষ্ট হবে। মেয়েটি আমার কাউকে কিছু বলতে চায় না। অথচ তার এতটুকু দোষ নেই...'

'ঈশ্বর, তার লজ্জা কীজন্যে? নাদেজ্‌দা মন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না আপত্তি জানিয়ে হঠাৎ এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন যে ভ্যাদিমির ইলিচ পায়চারি থামালেন আর তাঁদের অতিথিটি অবাক হয়ে ঘুরে বসল। 'লজ্জার বদলে সম্মানই তো তার পাওনা। আন্‌ফিসা গরবী ভাল মেয়ে। আরেকজন ভাল মানুষের সে বাগদত্তা। তাদের নৈতিক সমর্থন দেয়া দরকার। তাদের মান বাঁচানো উচিত। দুনিয়া থেকে কি ন্যায়-নীতি উবে গেছে? নিশ্চয়ই তুমিও বলবে ভলোদিয়া যে এমন লজ্জাকর ঘটনার একটা প্রতিবিধান হওয়া উচিত, তাই তো? সবই ওর ভুলতে বসেছে—সুনাম, সুখ, মানুষের অধিকারটুকু। কোথাকার এক জোতদারকে এগুলি নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেয়া চলে না! অসম্ভব, অসম্ভব!' আস্তিনের একটা বোতাম ঘুরাতে ঘুরাতে তিনি পুনরুক্তি করলেন। তারপর বোতামটা আঙুলের মধ্যে উঠে এলে তিনি লজ্জিত হলেন। নিজের মতামত তিনি কখনই জোরেসোরে জাহির করেন না। 'না, ভলোদিয়া, এটা ঘটতে দেয়া যায় না...'

'অবশ্যই না।'

তিনি স্ত্রীর কাছে গিয়ে আলতোভাবে তাঁর কাঁধ ছুঁলেন, এক পলক মুখের দিকে তাকালেন: চোখে ভালবাসা, আনন্দ, বিস্ময়।

'মনে লয়, আপনারাই ঠিক, লোকে যেমনটি বলে। সৎ খ্রীষ্টানের মতোই আপনারা থাকেন...' সিদর মার্কভিচ বলল।

'মোটেই সৎ খ্রীস্টানের মতো নয়,' আনন্দে চোখ টিপে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন। 'আমি বলি, সাধারণ মানুষের মতো। তাহলে...'

ডেস্কে গিয়ে তিনি কলম হাতে নিলেন।

'আমরা কি আদালতের সাহায্য চাইব?'

লোকটি নড়েচড়ে উঠল। তার রোদ-পোড়া বিমূঢ় মুখে ফুটে উঠল ভয়ার্ত ভাব।

'না, আমরা এ কাজ করব না,' ভ্লাদিমির ইলিচ নিজের প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন। 'আদালতে গেলে মেয়েটির সতীত্ব আর অহঙ্কারের উপর আরেক দফা হামলা শুরু হবে। আমাদের তখন বলতেই হবে কেন সে কাজ ছেড়ে দিয়েছে, সারা জীবনের মতো তার পেছনে কুশ্রী কানাঘুষার একটা পথ তৈরি হয়ে যাবে... না আমরা আদালতে যাব না। তবে জোতদারের ব্যাটাকে ভয় দেখাতে হবে... পাশা!'

পাশা যেন উড়ে এল। সাধারণত এ ঘরে সে আসে না।

'দেখ, এখানটায় বোস আর আমি যা বলি লেখ,' ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন।

ব্যগ্র পাশা টেবিলে বসে কলম হাতে অপেক্ষা করতে লাগল।

'শুনুন, সিদর মার্কভিচ। আমরা জেলা শাসকের কাছে দরখাস্ত দিচ্ছি। আমাদের দাবী মেয়েটিকে জোতদারের কাছ থেকে যেন তার হক আদায় করে দেওয়া হয়। মেয়েটির অধিকার রক্ষার দাবি জানাচ্ছি আমরা। হ্যাঁ, তাই, সবার আগে তার অধিকার...'

'এর কী দরকার ছিল!' হতাশ সিদর মার্কভিচ বলল। 'আপনি ভাবেন গাঁয়ের এক ছুঁড়ির জন্যে ওই ধনী লোকটির সঙ্গে ওরা সম্পর্ক খারাপ করবে?'

'তাহলে সব শেষ। আনফিসার জন্য এখানেও কোন সাহায্য মিলবে না। এতটা পথ পাড়ি দিয়ে আসা বৃথা হল,' মনে ভাবল সে।

'করবে, অবশ্যই করবে,' ভ্লাদিমির ইলিচ শান্তভাবে বললেন। 'নিশ্চয়ই করবে। ওই জোতদারকে আদালতে পাঠানোর ভয় দেখালে তড়িঘড়িই করবে। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার আইন আমরা খুঁজে বের করব। তাদের হুঁশিয়ার করব যদি তারা... কিন্তু আমার মনে হয় ওরা মামলার ঝুঁকি নেবে না। তাহলে পাশা, লেখ তো। নিজে লিখছি না, কারণ আমার হাতের লেখা ওরা ভালই চেনে। মেয়েটার বাবা লিখছে, অন্তত সই দিচ্ছে। ওরা অবশ্য ঠিকই অনুমান করবে যে এর পেছনে আইন জানে এমন কেউ আছে। এমনটিই আমি চাই। ওরা বুঝুক যে...'

প্রথম বাক্যটা বলে তিনি পাশার ঘাড় ডিঙিয়ে তাকালেন: গোটা গোটা অক্ষর, সোজা লাইন বরাবর সাজান।

'নকলনবীশ হিসেবে তোমার ভাল নম্বর পাওয়া উচিত, পাশা। এতে একটুও সন্দেহ নেই...'

পাশার গাল লাল হয়ে উঠল।

যথারীতি জেনি বাইরের দরজায় পাহারা দিচ্ছিল। সে নাক তুলে, কান খাড়া করে মাটিতে জোরে জোরে লেজ পিটাতে লাগল। ভ্লাদিমির ইলিচ পুরো দরজা খুলে চেঁচিয়ে উঠলেন:

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। পাশের দেশ থেকে কোন বন্ধুর আগমন...'

লেওপোল্ড ঘরে এল। তাকে কিছুটা বিব্রত দেখাল। সে কারও দিকে সরাসরি তাকাচ্ছিল না।

'ওখানে কি এখনো ব্যথাটা আছে?' লেওপোল্ডের বুকে আঙুলের খোঁচা দিয়ে আশ্বস্ত হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলেন ভ্লাদিমির ইলিচ।

লেওপোল্ডের মুখ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু এই উজ্জ্বলতা তেমনি দ্রুত মিলিয়ে গেল।

'বাবা চিঠিটার কথা বলেছিলেন। যদি আপনার...'

'প্রিয় মহাশয়, এটা নিয়ে আমরা তো আলাপ করছি না।'

'সেটাও... আর প্রথমত।'

আর দ্বিতীয়ত? লেওপোল্ডের কী হয়েছে কেউ জানত না। তার একটা অভিযোগ ছিল। সে দুঃখ পেয়েছে। কার কাছ থেকে? বন্ধুদের ডেকে পাঠানোর সময় ভ্লাদিমির ইলিচ লেওপোল্ডের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন!

অন্যদের সঙ্গে লেওপোল্ডের বাবা ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়ে যেতে পারেন নি। তিনি তখন জ্বরে কাঁপছেন। তাঁর তৈরি ছেলেমেয়েদের সবগুলি খরগোশ-লোমের কোট গায়ে চাপান হল, স্ত্রী বারবার লাইম-পাতা দিয়ে গরম চা খাওয়ালেন, তবু তাঁর কাঁপুনি থামে নি। সেই রাত লেওপোল্ড ঘুমাতে পারে নি। সে কেবলই এপাশ-ওপাশ করেছে, দুশ্চিন্তায় ভুগেছে। ভোর হওয়ার আগেই সে উঠে পড়েছিল। কিন্তু তাকে ডাকা হল না। তাকে বাদ দিয়েই সবাই চলে গেলেন। সে শুনল, দূরে ঘণ্টির শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে। ভ্লাদিমির ইলিচ বলতে পারতেন: 'আমাদের তরুণ কমরেড লেওপোল্ড আমাদের পার্টির একজন ভাবী সদস্য। একে গাড়িতে তুলে নেওয়া হোক। লেওপোল্ড, তুমিও আমাদের সঙ্গেই ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়ে যাচ্ছ।'

কুস্‌কভার 'ধর্মমত'-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সই করার জন্য সবাই যে ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়ে যাচ্ছেন সেটা লেওপোল্ড জানত। তাঁরা ফিরে এলে ভ্লাদিমির

ইলিচ সই নেওয়ার জন্য নিজেই তার বাবার কাছে আসেন। কিন্তু লেওপোল্ডকে তাঁরা ডাকেন নি...

তার মনে ব্যথার কথা সে কাউকেই বলে নি। সে আহত, নীরব ভঙ্গিতে, সরাসরি কারো দিকে না তাকিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরছিল। কিন্তু তার মনে হল যেন ভ্লাদিমির ইলিচ ব্যাপারটা আঁচ করেছেন।

'তোমার বাবা কি এখনো উত্তরের অপেক্ষায় আছেন?' ভ্লাদিমির ইলিচ জিজ্ঞেস করলেন।

'তাই, অপেক্ষা করছেন।'

'এখন বসে লেখ তো। পাশা, সোনামণি, এমন গুরুতর একটা ব্যাপারের জন্যে তোমার লেখাটা খুবই মেয়েলী বটে। এতে পুরুষের হাত চাই যে।'

জোতদারের ছেলের বলাৎকারের ভয়ে আন্‌ফিসার চলে আসার ব্যাপারে যে আইন ও ন্যায়বিচার ওর পক্ষে সেটা দরখাস্তে ভালই ফুটে উঠল। প্রাণপণে, ঘেমে-উঠে সিদর মার্কভিচ সেটা সই করল এবং দুভাঁজ করে টুপিতে গুঁজল।

সিদর মার্কভিচ ঘোঁতঘোঁত করল, মাথার পেছনটা চুলকাল।

'আপনারা... আপনারা সরল মানুষ, তবে খুবই বুদ্ধিমান। মনটা আপনাদের ভালই। নিশ্চয়ই ভাল। ঠাকরুণ, ধন্যবাদ হিসেবে ওটা নিন।'

মেঝে থেকে সে পুঁটলিটা তুলল।

'না না! কী যে বলেন!'

'এতে দোষ কী? নিশ্চয়ই আপনার স্বামী আমার জন্যে অযথা মাথা ঘামান নি। কেই-বা মাগনা খাটে বলুন?'

ভ্লাদিমির ইলিচ এগিয়ে এসে বললেন:

'কে এটা লিখেছে, কাউকে বলবেন না। দরখাস্তটা খারিজ হলে আবার আসবেন। তবে মনে হয়, খারিজ হবে না। আপনার বয়ামটি ফেরত নিন। আমাদের কোনকিছুর দরকার নেই। বাড়ি নিয়ে যান। রাতে থাকার মতো আস্তানা আছে তো? আবহাওয়া ভাল নয়। এখন বেরিয়ে বিপদের ঝুঁকি নেবেন না। বরং কাল খুব ভোরেই রওয়ানা দেবেন... বিদায়, সব ভাল হোক...'

'আপনার মেয়েটি যেন সুখী হয়,' নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না যোগ করলেন।

বিভ্রান্ত চাষীটি পুঁটলি আর দরখাস্ত সহ টুপিটি বগলে চেপে পাশের ঘরে গেল। আরে এ কী? সাদা ব্লাউজ গায়ে এক বয়স্কা মহিলা কাঠের সোফায় বসে সিগারেট টানতে টানতে মোটা একখানা বই পড়ছেন।

'ঈশ্বর! মেয়েলোকও সিগ্রেট খায়!' তার মুখ থেকে ফসকে বেরিয়ে এলো।

তিনি বই থেকে হাসি হাসি চোখে তাকালেন।

'এতে মাথা গলানোর কী দরকার?'

'আপনাদের বাড়িতে যা দেখলাম, যা শুনলাম, এতে ভাল-মন্দ বাছবিচারের শক্তি আমার লোপ পেয়েছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ছেড়ে আসা ঘরের দিকে ইশারায় ফিস্‌ফিস্ স্বরে সে বলল:

'আপনার ছেলে?'

'জামাই,' জবাব দিলেন এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্‌না।

'কড়া লোক। বকাঝকা করেন। বাজি রাখতে পারি। অ্যাঁ?'

'দোষী হলে অবশ্যই, দেখছি হাতের এই উপহারের জন্যে বকুনি খেতে হয়েছে নিশ্চয়ই?'

'ওটাকে উপহার বলেন? ঘরে তৈরি খানিকটা মাখন। বড়জোর তিন পাউন্ড। এই হল গিয়ে উপহার। উনি বললেন, বাড়ি নিয়ে যাও। ওঁর জন্যেই এনেছিলাম, আর এখন বাড়ি ফেরত নেব কেন? দরখাস্তটা লিখেছেন? লিখেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ দেব না? আচ্ছা, আপনিই নিন, নেবেন?'

'আমাকে মাপ কর বাপু। উনি এমন রেগে যাবেন যে আমরা সবাই বেকায়দায় পড়ব। আর মনে রেখ, আমিও রেগে যেতে পারি।'

'ওদিকে দেখুন। ওঁরা বুঝতে পারবেন না। সত্যি বলতে কী, আপনারা সবাই অদ্ভুত। কাজটা হল। এই দেখুন না দরখাস্তটা, মানে ওটা টুপির ভেতর। আচ্ছা, তাহলে কাজের সেলামীটা না নেওয়া কেন? বলুন, আমাকে বলুন।'

'আমরা সেলামী নিই না। আর কথা বাড়াবে না। জামাই শুনতে পেলে দুজনকেই বকবে!'

'কী লোকরে বাবা! ধন্যবাদ। তবে বলতেই হবে, আপনারা অদ্ভুত লোক! আবারও ধন্যবাদ। বিদায় তাহলে।'

কাগজ-সুদ্ধ টুপিটা মাথায় দিয়ে সে চলে গেল।

ভ্লাদিমির ইলিচের কাজের ঘরে তখনো ঘটনাটা নিয়ে আলাপ চলছিল।

জানলার কাছে ছিলেন নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না। ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে নিজেকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বললেন:

'কী ভয়ঙ্কর ঘটনা, জোতদারের ছেলেটাও ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর জোতদারের শোষণ! মেয়েটা ভাল। তার ভাবী বরটাও। সরল-সোজা মানুষ। আপোস ওর জন্যে নয়। ওদের ভালবাসা আর বিশ্বাস আমাকে বেশ নাড়া দিয়েছে। মনটা শুদ্ধ থাকলেই এতটা বিশ্বাস জন্মায়, কেবল শুদ্ধ হলেই।'

'ও আমাদের যা বলেছে, তুমি শুনেছ তার চেয়ে বেশি,' ভ্লাদিমির ইলিচ মন্তব্য করলেন।

'না, ভলোদিয়া। ছেলেটা কীভাবে মেয়েটির মান বাঁচানোর জন্যে ছুটে যেত, সে ঠিক তাই বলেছে। এতে যে মেয়েটির দোষ থাকতে পারে, সেটা কখনই তার মাথায়

আসত না। তাকে সে কিছুমাত্র সন্দেহও করত না। এতেই বোঝা যাচ্ছে ছেলেটা কত সৎ, কতটা বিশ্বাসী। বিশ্বাস ছাড়া তো ভালবাসা, বন্ধুত্ব অসম্ভব।'

ভ্লাদিমির ইলিচ স্ত্রীর কথা শুনছিলেন। মুখে শান্ত, সাদর হাসির রেশ। ক্ষণিক নীরবতা। এই সময় লেওপোল্ডের মনে হল কিছু একটা শোনার জন্য সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছেন। অপেক্ষা করছেন। কিন্তু আসলে সে নিজেই অপেক্ষা করছে নিজের কাছে—তার মনের ভেতরে যা আছে তা প্রকাশের জন্য সাহস তার হবে কি।'

'ভ্লাদিমির ইলিচ, আপনি আমার মনে ব্যথা দিয়েছেন,' বলে পৃথিবী তাকে গ্রাস করুক, এটাই কামনা করল। কথাটা কেন সে হঠাৎ বোকার মতো বলে ফেলল। কীজন্য? এখন কী হবে? যদি উনি বলেন: 'এমন ছিঁচকাঁদুনে লোকের কোন দরকার নেই আমার। যাও, আর এসো না।'

কিন্তু ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন ঠিক উল্টোটা।

'তোমার দুঃখের কারণ আমি জানি লেওপোল্ড। দেখ, ওটা ছিল পুরোপুরি পার্টি সভা। তোমাকে ওখানে আমি নিতে পারি না। তোমার বোঝা উচিত। এজন্যে অভিমান করো না। এখনো তোমার সামনে কতকিছু পড়ে আছে...'

'ওরে বাবা, খাবারের সময় এসে গেছে,' পাশা চেঁচিয়ে উঠল এবং হেঁসেলে ছুটে গেল। ছুটে যাওয়াই পাশার অভ্যাস, যেন ঘরে আগুন লেগেছে—হোক কুয়ো থেকে জল আনা কিম্বা উনুনে কড়াই দেখতে যাওয়া।

'তাহলে, তোমার অভিযোগটার কোন ভিত্তি নেই। খুবই ভাল কথা যে ওটা না লুকিয়ে রেখে সরাসরি বলে ফেলেছ।'

উত্তরে লেওপোল্ড বিড়বিড় করে কী যেন বলল। কিছুই বোঝা গেল না। সে পাশার পেছনে উধাও হল। নিজের চিন্তাগুলি গুছানোর জন্য তার কিছুক্ষণ একা থাকা দরকার। উনুনে হাঁড়ি কড়াই নিয়ে কর্মব্যস্ত পাশার কাছ দিয়ে যেতে যেতে সে অস্থির হয়ে হঠাৎ বলল:

'বাড়ির পেছনটায় ওই নদীর পারে এস। আমি অপেক্ষা করছি।'

সে রাস্তায় ছুটল। মনে তার তোলপাড় চলেছে।

''বিশ্বাস ছাড়া বন্ধুত্ব, ভালবাসা একেবারেই অসম্ভব'—কী নিদারুণ সত্য! আশ্চর্যও বটে। অচিরেই আমার নতুন জীবন শুরু হবে। হে পর্বতমালা, বিদায়! কী উজ্জ্বল আর পরিচ্ছন্ন তুমি! বাতাস মেঘগুলিকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তুমি দাঁড়িয়ে আছ তুষারে উজ্জ্বল, আলোয় আলোময়। তোমার ওপারে দুনিয়ার শেষপ্রান্ত নয়, ওখানে স্বাধীনতা। ভ্লাদিমির ইলিচ বলেছেন, আমার সামনে সবকিছুই রয়েছে। আমি চাই ওই 'সবকিছু' একটু জলদি শুরু হোক! এখন শরৎ। মাটি শক্ত। পায়ে চলার শব্দ ওঠে। ঘাস মরে গেছে। গাছের পাতা ঝরছে। সবকিছুই শূন্য, শীতল। নদীতেও শরতের আঁচ লেগেছে। জমে যাওয়ার আগেই ও ইয়েনিসেইয়ে পৌঁছতে চায়। বাতাস কীভাবে

ওকে আলুথালু করে ভাটার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। বিদায়, নদী, বিদায়!'

বিশ্রী ধরনের বাতাস। নদীর পারে পায়চারি করতে করতে সে কোটের কলার উঁচু করল। ও যদি না আসে? বুকে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। আজকের মতো আর কখনো পাশার কথা সে ভাবে নি। 'পাশা, এসো, আর দেরি নয়!'

শীতে জমে যাবার মুখেই কেবল পাশা এল।

'কী ব্যাপার? গোপন কিছু? একি, জমে যাচ্ছ দেখছি! সারা শরীরে কাঁপুনি!' ওর জন্য উদ্বেগ সত্ত্বেও চোখে তার উত্তেজনার আঁচ।

'হ্যাঁ, গোপন কথা।'

এই দারুণ শীতে সে কাঁপছিল।

'অচিরেই আমাদের গোপন কথা সবাই জানবে: আমরা দেশে, পোল্যাণ্ডে ফিরছি। প্রথমে বাবা কথাটা চেপে রেখেছিলেন। কিন্তু এখন সবই জানিয়েছেন। আর মাসেকের মধ্যেই তাঁর নির্বাসনের মেয়াদ শেষ। কিন্তু ট্রেনের ভাড়া আমাদের নেই। ভ্যাদিমির ইলিচ বাবার জন্যে একটা দরখাস্তের খসড়া লিখে দিয়েছেন। বাবা অর্থসাহায্য চাইবেন। আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না। যে-কোন দিনই উত্তর আসতে পারে। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ ভ্যাদিমির ইলিচ কথাটা লুকনোর জন্যেই বললেন এসব নিয়ে আমরা আলাপ করছি না। ব্যাপারটা আসলে আমাদের দরখাস্ত নিয়েই, বুঝলে? আমরা বাড়ি ফিরছি। এক মাসের মধ্যেই বাড়ির পথে, পোল্যাণ্ডে।'

পাশা নীরবে শুনল, তার উত্তেজনা মিলিয়ে গেল।

'রোজ রাতে পোল্যাণ্ডের স্বপ্ন দেখছি। আমরা ট্রেনে। ট্রেন ছুটছে পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে—বাড়িঘর, বাগ-বাগিচা, মধ্যযুগের দুর্গ, দুর্গ-ঘেরা খাল, গাঁ-গঞ্জ, ছোট ছোট শহর, শহরের টালির ছাদ, গির্জা, উঁচু গম্বুজ পেরিয়ে। এই তো পোল্যাণ্ড। তারপরই লদ্জ। চিমনির রীতিমত অরণ্য। আকাশচুম্বী ওই চিমনিগুলি, তাদের উপর গাঢ় বেগুনি মেঘ—মানে কারখানার ধোঁয়া, হঠাৎ উজ্জ্বল লাল আলোর ঝলকানি, যন্ত্রপাতির অবিরাম কলগুঞ্জন — সব মিলিয়ে অনুপম এই লদ্জ, আর... একি, পাশা কী হল তোমার?'

পাশা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। সে হাত দিয়ে গাল মুছছিল আর সেইসঙ্গে দুলছিল কাঁধ থেকে খসে পড়া বিনুনি।

'পাশা!'

সে পাশার হাত সরিয়ে নিল। চোখের জলে ভেজা মুখটি তখন খুবই করুণ দেখাচ্ছিল।

'পাশা, বাবা আর মা তোমাকে মেয়ের মতো দেখবেন। তুমি আর আমি লদ্জের কারখানায় কাজ পাব। তোমাকে ভালবাসি, পাশা।'

কথাটা দুজনকেই মুহূর্তে নির্বাক করে দিল।

'তোমাকে ভালবাসি। ভালবাসি তোমাকে। আমি বলছি। সত্যি বলছি। তোমাকে চিরদিন বিশ্বাস করব। তোমাকে কোনদিন এতটুকু ব্যথা দেব না...'

'কিন্তু তুমি তো চলে যাচ্ছ।'

'পাশা, ওখানেই জন্মেছি। আমি পোল। তুমিও পোল্যাণ্ডে যাবে। চিরজন্মের মতো। আমরা দুজনে কাজ করব। আমরা মজুর হব। বিপ্লবী হব।'

'কিন্তু আমার আপনজনেরা, আমার মা?'

'তাকে আমরা পোল্যাণ্ডে আমাদের দেখতে যেতে বলব। কিছুদিনের মধ্যে উলিয়ানভরাও চলে যাবেন। আমরা বাড়ি গিয়ে একটু গুছিয়ে বসলেই তোমাকে লিখব আর তখনই তুমি চলে আসবে। পোল্যাণ্ডে আমাদের বাড়িগুলোর চাল টালির। এখানকার মতো নয়। রাস্তার ধারে লাল ফুল! আর কলকারখানায় বোঝাই লদ্‌জ শহরে কালো চিমনির বন, আমার মনে পড়ে...'

দুশ্চিন্তা, অনিশ্চয়তায় সে রুমালের কিনার দিয়ে মুখ ঢাকল। তার চোখের সামনে ফুটে উঠল অদ্ভুত দৃশ্য: কালো চিমনির বন, গাঢ় বেগুনি আকাশ, একদল লোক চলেছে অপয়া অগ্নিশিখার দিকে, সামনে লেওপোল্ড--ফ্যাকাশে কপাল, জ্বলজ্বলে চোখ, হাতে লাল পতাকা।

'কথা দাও, পাশা।'

পাশা কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। এই অপয়া দৃশ্য তাকে একইসঙ্গে লুব্ধ করল, ভয় দেখাল। 'সত্যি কি লেওপোল্ড শুশেনস্কয়ে ছেড়ে যাচ্ছে? তাকে ছাড়া সে বাঁচবে কীভাবে? তাকে না দেখে, তার সঙ্গে কথা না বলে, তার কাছ থেকে বইয়ের গল্প, পোল্যাণ্ডের গল্প না শুনে? উলিয়ানভরাও চলে যাচ্ছেন। না, এসব নিয়ে না ভাবাই ভাল। এখনো অঢেল সময় আছে। ভাববার দরকার নেই। আমাকে কথা দিতে বলো না, লেওপোল্ড! আমাকে জিজ্ঞেস করা কেন? তুমি জমে যাচ্ছ। বাড়ি গিয়ে উনুনে শরীরটা গরম কর। আমাকে এসব জিজ্ঞেস করা কেন?'

॥ ১৭ ॥

সে-বছর সাইবেরিয়ায় শরৎ এল আগেভাগেই। শেষ জাহাজ ক্রাসনোয়ার্স্ক ছেড়ে গেল। এটি হারালে প্রখোরকে ইয়েনিসেইস্ক, তুরুখান্‌স্ক কিম্বা আরও উত্তরের কোন প্রত্যন্ত এলাকায় যেতে হত। ওইসব জায়গায় সুমেরু মহাসাগর থেকে আসা তুষার-মেঘ এখনই উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, তুন্দ্রার উপর তুষারঝড় বইছে আর রাস্তার পাশের ডোবাগুলি রাতে জমে যাচ্ছে।

প্রখোরের সৌভাগ্য যে জাহাজটি পেয়ে গেছে। আজকের ঠাণ্ডা, বিষণ্ণ দিনে ঘোড়ার

গাড়িতে সে মিনুসিন্স্ক ছাড়ছে। সঙ্গী বলতে এক গাড়োয়ান। গাঁয়ের নামটি ছাড়া গন্তব্যের আর কিছুই সে জানে না। কিন্তু নামে কী আসে যায়? এখানকার সবকিছুই তার কাছে অদ্ভুত ঠেকছে। মিনুসিন্স্ক শহরের সবগুলি বাড়িই একতলা, সমতল দিগন্তসীমা, রাস্তাগুলিতে হাঁটু অবধি কাদা। তাদের চলার পথটি ছিল বালুময়। বেচারি ঘোড়াটার অঢেল সহ্যশক্তি আর ভরপেট থাকা সত্ত্বেও এ কঠিন পথে গাড়ি টানতে গিয়ে কষ্টে বারবার মাথা ঝাঁকাচ্ছে। তারা একটি পাইন বন পেরিয়ে গেল। বনটি অন্ধকার, অপয়া, আসন্ন ঝড়ের অপেক্ষায় নিথর।

গাড়োয়ান ঘোড়াটাকে জোরেসোরে সামনে ছুটালে ওটা প্রাণপণে এগুনোর চেষ্টা করছিল। সামনে বিস্তৃত সমতল। বিরান স্তেপ। দিগন্তে তাইগার কালো সীমারেখা। প্রখোরের বুকে ব্যথা টনটনিয়ে উঠল। বাড়ি থেকে দূরে যেতে যেতে ফেলে আসা দিনের স্মৃতিগুলি কেবলই মধুর হয়ে উঠছিল। অথচ সত্যিকার বাড়ি বলতে কিছুই তার নেই। সম্ভবত সে হল দুনিয়ার নিঃসঙ্গতম মানুষ। তবু সে তো অল্পবয়সী। একদিন নিশ্চয়ই সে সুখী হবে। ইতিমধ্যে পদল্স্কে দেখা উলিয়ানভদের স্মৃতি নিয়ে সে টিকে থাকবে। অনেকদিন পর এটি ছিল তার জন্য এক সেরা অভিজ্ঞতা। আন্না ইলিনিচ্না তার জীবন বাঁচিয়েছেন। ফটকে উনি না এলে তার কী হত? ক্ষুধা আর অন্যায় সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে তার মন বিষিয়ে দিয়েছিল। হিংস্র নেকড়ে-ছানার মতো সে সকলের দিকেই দাঁত খিঁচাত।

উলিয়ানভরাই তাকে বাঁচিয়েছেন। তাঁরা তাকে খাবার, পরণের কাপড়-চোপড়, নিজেদের বাড়িতে শোবার বিছানা দিয়েছেন। তার মরে যাওয়া মনটিকে উষ্ণতায় তাঁরাই পুনরুজ্জীবিত করেছেন।

সকালে আন্না ইলিনিচ্না পুলিশের সই আর সিল দেয়া হুকুমনামাটি দেখেন। পরিবারের সবার সঙ্গে আলাপ করে শেষে বলেন:

'তারিখটা আছে, কিন্তু ফিরে গিয়ে হাজিরা দেয়ার সময়ের কোন উল্লেখ নেই। তাই তুমি আমাদের সঙ্গে আরেক দিন থেকে বিশ্রাম নাও। জেলের তর সইবে, এক সময় গিয়ে ঢুকলেই হল!'

দিনটা প্রখোর ওঁদের সঙ্গে কাটায়। তার এই ছুটির দিনটা মাটি করার জন্য আকাশে মেঘ ছিল না, বৃষ্টি বা বাতাসও ছিল না। আগস্টের একটি রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। রোদে-পোড়া বাগানের লাইলাক আর গোলাপী ফ্লক্সগুলি তীব্রতর সুঘ্রাণ ছড়াচ্ছিল। আঁকাবাঁকা পাথ্রার স্রোতের তখন চোখধাঁধান ঝলকানি। ঝোপে একটি দোয়েলের সুখী কাকলির বিরতি ছিল না।

বাড়ির ভেতরের ঘরগুলি ছিল খুবই আরামের—পরিচ্ছন্ন হলুদ মেঝে, কালো পিয়ানো, বই-ঠাসা অনেকগুলি তাক।

তার লোভী চাহনিতে বাধা দিয়ে আন্না ইলিনিচ্না বললেন: 'ইচ্ছে হলে

ওগুলোতে চোখ বুলাতে পার। দুপুরের খাবার পর্যন্ত আমরা অমনিই ব্যস্ত থাকব। তারপর তোমার সঙ্গে আবার কথাবার্তা বলা যাবে।'

তিনি দোতলায় তাঁর চিলেকোঠায় গেলেন। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না অন্য কোথাও ব্যস্ত। অন্যরা কাজে গেছেন। প্রখোর একা। অধীর, অনভ্যস্ত হাতে সে বইগুলি নামিয়ে দেখতে লাগল।

সে বালজাকের 'পিতা গোরিও' বইটি খুলে পড়ল: '...বোধ হয় আক্ষরিকভাবে আমাদের কাহিনীটা নাটকীয় নয়, কিন্তু এটা শেষ করলে আমাদের পাঠকরা হয়ত চোখের জল ফেলবেন...' একনাগাড়ে সে কয়েক পৃষ্ঠা রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেলে বইটি রেখে দিল। 'এটা জোগাড় করে পড়তেই হবে।'

তারপর হাতে নিল তলস্তয়ের 'আন্না কারেনিনা': '...সবগুলি সুখী পরিবারই দৃশ্যত অভিন্ন, প্রত্যেকটি অসুখী পরিবার নিজস্ব ধরনেই অসুখী। ওব্লোন্স্কি পরিবারে তোলপাড় চলেছে।'

শেষে লেরমন্তভ:

পাহাড় চূড়োয় লেগেছিল মেঘ;
ঘুমল ওখানে, জেগে ওঠে যবে ভোর;
ছুটেছিল নীলাকাশে, শরীরে বেগ,
সোনার বরণ, ছোট্ট শরীর তার।
তবু রেখে গেল পথরেখা এ'কে
বিপুল হৃদয় 'পরে...

বই পড়ার পুরনো নেশা তাকে পেয়ে বসল। তাকের এই বোঝাগুলির জন্য তার ঈর্ষা হল। একটি বই নামিয়ে একটি পৃষ্ঠা পড়ে আবার গোড়ায় গেল আর শেষে বাকি পৃষ্ঠাগুলি কেবল উল্টে উল্টে শেষ পৃষ্ঠায় এল। বসতে সে ভুলে গিয়েছিল: বিশ্বভুবন ভুলে সারাটা দিন সে তাকগুলির সামনে দাঁড়িয়েই কাটাল। কী আশ্চর্য দিন! এক সময় সে পায়ের শব্দ শুনল। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না এলেন।

এই ছোটখাটো মহিলার ক্ষীণ শরীরের মজ্জাগত শক্তি প্রখোর এক সহজাত স্বজ্ঞা থেকে সঠিক অনুমান করেছিল। তিনি বসলেন। কোন ভূমিকা ছাড়াই শান্তভাবে কথা বলতে লাগলেন। তাকে বললে যে অবিচার ও পরীক্ষার মধ্যে তার জীবন শুরু হলেও সে যেন অনুক্ষণ এটা না ভাবে, সে যেন নিজের প্রতি করুণা বোধ না করে। কারণ, নিজের প্রতি করুণা মানুষকে দুর্বল করে দেয়। বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকে মানুষের মতো বেঁচে থাকাই উচিত।

তাঁর কণ্ঠস্বরে কোন উত্তেজনা ছিল না, যেন কথা বলছেন রোজকার সাধারণ বিষয়ে। বিস্মিত প্রখোর ভাবল: 'অর্থাৎ উনিও... কিন্তু বুড়ো হয়ে গেছেন যে... তিনি পিয়ানো-বাজিয়ে। কিন্তু তাঁরই ছেলে আলেক্সান্দর। আর ভ্লাদিমির ইলিচ।

আর আন্না ইলিনিচ্‌নাও তো ওঁদেরই মতো। দ্মিত্রি ইলিচ। আশ্চর্য মা বটে...'

গত রাতে শোনা বাজনার সুর এখনো তার কানে লেগে ছিল। তাকে একটু বাজিয়ে শোনানোর জন্য মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভ্‌নাকে সে অনুরোধ করতে পারল না। কালো পিয়ানোটা বন্ধ। কিন্তু এখনো কানে বাজছে গতরাতের সেই সুর যখন অন্ধকার বাগান পেরিয়ে সে আন্না ইলিনিচ্‌নার সঙ্গে বাড়ি পৌঁছয়।

কী সুখের দিন আজ! স্নেহস্নাত হল প্রখোর। তাকে নিয়ে সারা পরিবারে অঢেল হৈচৈ চলল। তার জেল ও নির্বাসনকে কিছুটা সহনীয় করার চেষ্টা করা হল।

তখন দুপুর। সূর্য মধ্যগগনে। সামনের ছোট্ট বাগানে কিছুক্ষণ উষ্ণতা ছড়িয়ে সে অস্তাচলে গেল। সুখের দিন শেষ হতে চলল।

শুরু করার জন্য আন্না ইলিনিচ্‌না প্রখোরকে পাঁচটি বই নিতে দিলেন। আশ্বাস দিলেন আরও বই পাঠানোর।

'তোমাকে অবশ্যই পড়াশোনা করতে হবে,' বাগানে পায়চারি করতে করতে আন্না ইলিনিচ্‌না তাকে বললেন। 'মনে থাকে যেন নির্বাসন থেকে শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান মানুষ হয়ে তোমাকে ফিরতে হবে। এটা ভুলবে না।'

তিনি তার জন্য একটা পাঠ্যসূচি প্রস্তুত করলেন, তাকে একটা বিদেশী ভাষা শিখতেও বললেন।

'পারবে না? বাজে কথা! সবাই পারে, তুমি পারবে না! সাইবেরিয়ায় যেখানেই থেকো গুছিয়ে নিয়েই আমাকে লিখবে। কী ধরনের শ্রমিকদের আমি জানি, বলব?'

তিনি তাদের নাম বললেন না। কিন্তু যাদের কথা বললেন তারা সবাই সংস্কৃতি ও রাজনীতির জ্ঞানের দিক থেকে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি চৌকশ।

'আমি কখনই অতটা পৌঁছতে পারব না।'

'যদি সত্যিই চাও, অবশ্যই পারবে।'

* * *

মেঘের আড়াল থেকে সূর্য বেরিয়ে এসে মাঠে এক ঝলক রোদ ছড়াল। দূরে থালার মতো গোল আর চ্যাপ্টা একটি হ্রদের নীল-রুপালী ঝিলিক চোখে পড়ল। ওখানে একটি গ্রাম। সেখানকার শুঁড়িখানার সামনে গাড়ি থামিয়ে গাড়োয়ান বলল:

'আমরা এখানে ঘণ্টাখানেকের মতো জিরিয়ে নেব।'

ঘোড়াটাকে খাওয়ানোর সময় প্রখোর পাদুটি একটু টানটান করার সুযোগ পেল। গ্রামটি বড়সড়, খাঁটি সাইবেরীয় — মজবুত ঘর, উঁচু বেড়ায় ঘেরা। 'এরকম একটিতেই পুরো তিন বছরের জন্যে আমাকে নরকযন্ত্রণা সইতে হবে। আর যদি

ওখানে স্কুল, শিক্ষক, নির্বাসিত রাজনৈতিক কর্মী আর একটিও বই না থাকে?' ভীতিকর ভাবনা। নির্বাসনের অপেক্ষায় মস্কোর বুতির্স্কায়া জেলে আর পরে ক্রাসনোয়ার্স্ক জেলে থাকার সময় তার সঙ্গীরা সবাই ছিল নির্বাসিত রাজনৈতিক কর্মী। ওদের মধ্যে থাকায় আনন্দ ছিল। তারপর সবাইকে আলাদা করে নানা গাঁয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রখোর আবার নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে।

'নাকী কান্না নয়,' সে নিজেকে বলল। 'নিজেকে নয়, অন্যকে করুণা কর।'

* * *

আবার সেই কষ্টকর যাত্রা শুরু হল। আরেকটা পাহাড়ে উঠতে গিয়ে ঘোড়াটা যন্ত্রণায় মাথা ঝাঁকাতে লাগল। উঁচু, খাড়া পাহাড়। জীবনে এমন চড়াই প্রখোর দেখে নি।

'পাহাড়টার নাম কি?' প্রখোর জিজ্ঞেস করল।

'দুম্নায়া।'

গাড়ির কিনার ধরে ধরে তারা পাহাড়ের চড়াই ভাঙ্গছিল। গাড়োয়ান একটিও কথা বলল না। চুড়োয় উঠে আবার তারা গাড়িতে চাপল। গাড়োয়ান চাবুক বাগিয়ে ধরে কথা বলল: 'দুম্নায়া মানে ভাবনা পাহাড়। চড়াই ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ভাবনায় পেয়ে বসে। হয়ত তাই এমন নাম।'

বাঁয়ে দিগন্তরেখায় এক বিশাল পর্বতমালা। সায়ান পর্বত। তুষারশৃঙ্গগুলি আকাশে জ্বলজ্বল করছে। ফাট থেকে নেমে আসা বেগুনি ও নীল ছায়ার প্রেক্ষিতে গিরিচূড়ার তুষারকে শুভ্রতর দেখাচ্ছিল। এই হল সাইবেরিয়া। উঁচু পাহাড়পর্বত, দুর্গম তাইগা, বিরান স্তেপ, নীচু পারের বহতা সরু নদী... রাস্তার দো-মাথায় একটি মাইলপোস্ট। একটি চিহ্ন সহ বড় বড় কালো হরফে লেখা: 'শুশেনস্কয়ে গ্রাম ১২ মাইল'।

প্রখোর চোখ বুজল। তার বুকে হাতুড়ি-পেটা শুরু হল। ভনভন আওয়াজে কানে তালা লাগল। গাড়োয়ান কি সোজা বড় রাস্তা ধরে চলে যাবে, নাকি শুশেনস্কয়ের দিকে মোড় নেবে?

প্রখোর বুঝতে পারল গাড়োয়ান লাগাম টানছে। সে চোখ খানিকটা খুলল। তারা বড় রাস্তা থেকে নেমে গেছে। সামনে শুশেনস্কয়ে।

এ-পর্যন্ত প্রখোরের জীবনে দুটি দৈবঘটনা ঘটেছে: প্রথমটি পদল্স্কে উলিয়ানভদের সঙ্গে দেখা আর দ্বিতীয়টি শুশেনস্কয়েতে পৌঁছন। আন্না ইলিনিচ্না বলেছিলেন: 'আমার ভাই আছে শুশেনস্কয়েতে। হয়ত তোমাকে খুব দূরে পাঠাবে না। ওর সঙ্গে দেখাও হতে পারে...'

আমরা শুশেনস্কয়ে যাচ্ছি কেন?' উদাসীন হওয়ার ভান করে প্রখোর জিজ্ঞেস করল।

'শহর ছাড়তে ছাড়তে দেরি হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, রাতটা ওখানেই কাটাতে হবে,' বিড়বিড় করে গাড়োয়ান জবাব দিল।

'সে অযথা কথা বলে না,' প্রখোর ভাবছিল। 'হয়ত কোন অসুবিধায় পড়েই এমন বদমেজাজি হয়ে গেছে। হতে পারে স্ত্রী অসুস্থ। নাকি সাইবেরিয়ার সবাই এরকম? তাদের দেশের মতোই গোমড়ামুখ? তবে এই কাটখোট্টা মানুষগুলির উপর ভরসা রাখা চলে। হাসিমুখদের চেয়ে অনেক ভাল...'

প্রখোর আশপাশের দৃশ্যাবলীর দিকে তাকিয়েও কিছু দেখতে পেল না। সে তখন একটিমাত্র চিন্তায় ডুবে ছিল: শুশেনস্কয়ে পেঁৗছে গাড়োয়ানকে ফাঁকি দিয়ে কীভাবে ভ্লাদিমির ইলিচের সঙ্গে দেখা করা যায়। হতে পারে যে গাড়োয়ান আপত্তি করবে না। আবার করতেও পারে। তাকে বাধা দেয়ার এক্তিয়ার ওর আছে কি? প্রখোর জানে না। সে কিছুই জানে না। সে অনেকগুলি বই পড়েছে। অথচ কার্যত সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ হলেও কোন কিছুরই প্রাথমিক জ্ঞানটুকু পর্যন্ত তার নেই। যাকগে, জীবনই তাকে শিক্ষা দেবে। এটাই তো জীবনের কাজ।

'হো হো!' গাড়োয়ান সরাইখানায় এসে ঘোড়া থামাল। ঘোড়াটা শূন্যে মাথা দুলিয়ে লেজ কোঁচকাল। গাড়োয়ান ঘোড়ার সাজ খোলার সময় প্রখোর অনিশ্চয়তাজনিত এক উত্তেজনায় ভুগতে লাগল। তারপর খালি-পা, লম্বা স্কার্ট পরা মোটা গুল্‌ফের একটা মেয়েলোক বৈঠকখানায় সামোভার ধরাল, যেখানে ছিল দেয়াল বরাবর চওড়া বেঞ্চ, বিশাল এক ইটের উনুন আর তাতে সর্বত্র ছেঁকে বসা আরশুলা। তখনো তার এই চিন্তাটি কাটল না। প্রখোর যতটা ভয় পেয়েছিল তার চেয়ে সবকিছুই অনেক সহজে ঘটল। পুরো কথা না শুনেই গাড়োয়ান তাকে যেতে দিল।

কেন সে তাকে যেতে দেবে না? ওতে ঝুঁকির কী রয়েছে? শুশেনস্কয়ে থেকে কেউ তো পালাতে পারে না। এখান থেকে স্টেশন হল ছ'শ মাইল। শরৎ এসে গেছে। বন এখন জল-কাদা আর হাওয়ার দাপাদাপিতে ভুতুড়ে, নেকড়ের দঙ্গল পথে পথে। তাই পালানোর সাধ্য কার? শুশা নদী দিয়ে? কিন্তু শুশা তো সায়ান পর্বতে ঘেরা। সায়ানের পরই তো দুনিয়ার সীমানা। না, এখান থেকে পালানোর পথ নেই।

'নির্বাসিতরা কোথায় থাকেন?' পথে যার সঙ্গে প্রথম দেখা হল তাকেই প্রখোর জিজ্ঞেস করল।

'কাকে তুমি চাও সেটা না জানলে কী করে বলি। এখানে কখনই তো ওদের অভাব হয় না। আমাদের এখানটাই ওদের জন্যে যুৎসই জায়গা।'

'ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ।'

'ও, তাই বলুন।'

লোকটির দেখান পথে প্রখোর একটি নির্জন গলি দিয়ে এগিয়ে শুশার পারে

পৌঁছল। এরই মধ্যে নদীর তোড় পড়ে গেছে। জলে বরফ জমছে। পারে একটি বাড়ি। প্রখোর দেখল, বারান্দার চাল আটকে খাড়া দুটি খুঁটি, তুষারের আঁচ লেগে কুঞ্জের লতাপাতা এখন বাদামী। সে জানত না যে কুঞ্জটি ভ্লাদিমির ইলিচের হাতে তৈরি। কিন্তু কোন স্পষ্ট কারণ ছাড়াই পদল্‌স্কের উলিয়ানভদের বাড়িটির কথা তার মনে পড়ল আর এজন্যই এটা তার ভাল লাগল। একটি অল্পবয়সী মেয়ে বাঁকে করে কানায় কানায় ভরা দুটি জলের বালতি বয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছিল। এমন ঠাণ্ডা সত্ত্বেও গোলাপী গাল, নীল চোখের এই স্বাস্থ্যবতীর গায়ে ছিল সারাফান আর মাথায় রুমাল।

'এটা ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভের বাড়ি?' সে জিজ্ঞেস করল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির সুন্দর মুখটি গম্ভীর হয়ে গেল।

মাঝরাতে পুলিশের ঘরে ঢোকার কথা পাশার মনে পড়ল। তারা পুলিশী পোশাকেই এসেছিল, পেছনে বেল্টের খাপে ছিল রিভলবার। ভ্লাদিমির ইলিচের কাজের ঘরে গিয়ে ওরা দরজা আটকালে পাশা ভয় পেয়েছিল। জেনি লোম খাড়া করে ঘেউঘেউ করছিল। এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্‌না ছোট সোফায় বসে একটার পর একটা সিগারেট টানতে টানতে বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। পাশার দাঁতের ঠক্‌ঠকানি শোনা যাচ্ছিল।

'এটা থামাও তো,' এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্‌না রেগেমেগে বলেছিলেন।

দুজনেই চুপ করে ঘর থেকে প্রতিটি শব্দ শুনছিলেন। আসবাব নিয়ে টানাহেঁচড়া, ড্রয়ার আটকান আর বইগুলি মেঝেতে ফেলার আওয়াজ আসছিল। এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্‌নার ছাইদানিটি ভরে গিয়েছিল।

'আমার ঈশ্বর, দয়া কর! দয়া কর প্রভু!' হাতদুটি কোনক্রমে বুকে চেপে ধরে পাশা বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছিল।

পুলিশ ভ্লাদিমির ইলিচের কাজের ঘরে বেআইনী কিছুই পায় নি। তল্লাসির পর নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না নিজেই ঘরটি গুছিয়েছিলেন।

প্রখোরের চেহারাটা মোটেই পুলিশের মতো নয়। তবু হুঁশিয়ার থাকার তাগিদে সে শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল:

'তাঁর কাছে তোমার কী চাই?'

হাড্ডিসার এই ছেলেটির সরল মুখ, অবাক চোখের চাহনি দেখে পাশা অজান্তেই আশ্বস্ত হয়েছিল। আর সে যেন তাকে দেখে কিছুটা মুগ্ধ, তাও আঁচ করেছিল।

'তুমি কী চাও? এখানকার লোক নও দেখছি!' কিছুটা নরম স্বরে পাশা জিজ্ঞেস করল।

'আমি নির্বাসিত।'

'অ্যাঁ!'

পাশার মুখ থেকে খসে যাওয়া 'অ্যাঁ' ছিল বহুধা অর্থব্যঞ্জক: বিস্ময়, আনন্দ, সমবেদনা। এখানে যে মায়া-মমতা জুটবে সঙ্গে সঙ্গে প্রখোর তা আঁচ করল।

'বালতিদুটো আমাকেই দাও। ভরা বালতি সুদ্ধ দেখা হল। ভাগ্যের লক্ষণ।'

'আমার ওপর ভরসা রাখতে পার। ওগুলো আমিই নেব। অভ্যেস আছে। ঘরে এসে আমাদের অতিথি হও। তাহলে, তুমি নির্বাসিত। আর আমি ভেবেছিলাম জেলাসদরের নতুন পিয়ন বা ওই জাতীয় কিছু। নাম কী?'

'প্রখোর।'

'অ্যাঁ! সারা শুশেনস্কয়েতে প্রখোর নামে কেউ নেই। এমন নামটা কোত্থেকে জুটালে? প্রখোর। তোমাকে মানায় ভালোই। পাদ্রি বোধ হয় তোমার জন্যেই নামটা বেছে রেখেছিলেন। এর চেয়ে ভালো নাম আর হত না...'

'আর তোমার নাম?'

'পাশা। ভেতরে এসো। ভ্লাদিমির ইলিচ আর নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না বাড়ি নেই। খুব ভোরে বেরিয়েছেন। আগামী কাল সন্ধের দিকে ফিরে আসবেন।'

দৈবঘটনাটি আর উতরাল না। কিন্তু দেখা যাক কাল কি হয়।

জেনি লাফিয়ে উঠল। জোরেসোরে লেজ নেড়ে গোটা দুই সাদর ডাক ছাড়ল।

'সব সময়ই ও ভাল-মন্দ তফাত করতে জানে আর কখনই তার ভুল হয় না,' পাশা তাকে বলল। 'টেবিলে গিয়ে বসো। তুমি তো অতিথি।'

বালতিগুলি পাশা রান্নাঘরের মেঝেতে নামাল। তাতান সামোভার থেকে ধোঁয়া উঠছে। একটি পাণ্ডুর ছোট ছেলে মেঝেতে বসে খেলছে, হাতে ঘরে-তৈরি রঙিন কাঠের টুকরো। সে প্রখোরের দিকে শিশুদের পক্ষে বেমানান কঠোর চোখে তাকাল।

'তুমি দরখাস্ত লেখাতে চাও?'

'আরে না, না। ও হল প্রখোর। নতুন নির্বাসিত। আর এ মিৎকা। ওরা লাতভিয়ার। তার বাবাকে এখানে পাঠিয়েছে। উনি পশমী জিনিস বানান। নামটাও বিদেশী -- কুদ্‌ম। জুতো তৈরি করে আর অঢেল মদ গেলে। ওতেই তো সবকিছু চলে যায়। ভ্লাদিমির ইলিচ আর নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না মিৎকার জন্যে দুঃখ করেন। এখনই চা দিচ্ছি। প্রখোর, আমাদের নিয়ম-কানুন এখনো জান না তো? একজন পুলিশ রোজ সকাল-বিকাল তোমাকে দেখত আসবে — যেখানে থাকার কথা সেখানে আছে কি না। আবার শহর থেকে কোন সার্জেণ্টও তোমার খোঁজে আসতে পারে। তখন আরও চালাক-চতুর হতে হবে, বেআইনী কিছু থাকলে লুকিয়ে ফেলবে।'

'কাকে এসব বলছ, পাশা?'

এক বয়স্কা মহিলা রান্নাঘরে এলেন। তাঁর হাতে সেলাইয়ের কাজ, বগলে দেশলাই দিয়ে দাগ দেয়া একটি বই, পরনে সাদা ব্লাউজ, চুল পাট করে আঁচড়ান, সাদা চওড়া কপাল, হাসিমাখা চোখ।

'কোত্থেকে এলে বাছা?'

'আমাদের নতুন নির্বাসিত, এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্না।'

'তামাশা! সরকারের কী হয়েছে — দুধের বাচ্চাদের নির্বাসনে দিচ্ছে। কী দিয়ে ওদের ভয় দেখালে?' তিনি প্রখোরকে জিজ্ঞেস করলেন।

তাঁর গলার স্বরে ঠাট্টার রেশ থাকলেও চাহনিতে নির্ভরতার ইশারা ছিল। সেই আদেশ তার মনে পড়ল: 'নিজেকে করুণা কর না। নিজের প্রতি করুণা মানুষকে দুর্বল করে দেয়।' তাই কীভাবে তার জনৈক বন্ধু, মাদাম কুস্কভার ভক্ত পিওতর বেলোগর্স্কির বিশ্বাসঘাতকতায় সে আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে — তা না বলে চুলে ঝাঁকানি দিয়ে আনন্দিত স্বরে বলল:

'অল্প বয়সের একটা সুবিধা হল এই যে আমাদের সামনে অনেক কিছু থাকে।'

'তাই মনে করলে চল, এবার চা খাওয়া যাক।'

মিৎকা সঙ্গে সঙ্গে খেলা ছেড়ে বাঁকা পায়ে হেলতে দুলতে পলকা ঘাড় বাড়িয়ে চিনির বয়ামে মিষ্টির খোঁজে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

'তোর জন্যে একটা মিষ্টি আছে বাছা, ভাবিস না,' এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্না তাকে বললেন।

সাদা ব্লাউজ-পরা মহিলাকে প্রখোরের অসাধারণ কিছু মনে হল না। তবে তাঁর বই পড়ার অভ্যাসটা লক্ষণীয় বটে। বইটি আনার ধরন আর টেবিলের উপর কাপের পাশে তা রাখা থেকেই সে এটা সঙ্গে সঙ্গে অনুমান করেছে। চায়ের জন্য অপেক্ষা করার সময়টুকুতে তিনি সেলাইয়ের কাজ করছিলেন। পোল্যাণ্ডে চাকুরির সময় জারের কর্মচারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর স্বামীর দুঃসাহসী, বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কথা, এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্না সুখে-দুঃখে কীভাবে অনুক্ষণ তাঁর সহচরী ছিলেন, এসব কথা কিছুই প্রখোর জানত না।

এই সময় পাশা ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে শুনতে পাচ্ছিল না। অদ্ভুত কিছু একটা তার মধ্যে ঘটছিল। সে তখন সুখী এবং দুঃখীও। ভবিষ্যৎ বেমালুম ভুলে গিয়ে আসন্ন বিদায়ের কথাই সে ভাবছিল। সময়ের এই উড়ে যাওয়াটা তার কাছে অসহ্য ঠেকছিল। বেচারী প্রখোর! প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম। প্রেম-পাগল সে। কিন্তু সম্ভাব্য শেষ মুহূর্ত অবধি পাশাকে কাছে রাখার যাবতীয় কলাকৌশল খাটানোর বুদ্ধি সে কখনই খোয়ায় নি।

'সরাইখানার পথটা আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন? আমি নতুন — বুঝতেই পারছেন।'

'সম্ভবত পথ গুলিয়েও ফেলেছেন, তাই না?' এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্না সায় দিয়ে বললেন। 'ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও পাশা।'

'আমিও যাব,' মিৎকা বায়না ধরল।

'না রে খোকন, তুই দিদিমার সঙ্গে ঘরে থাকবি। পাশা একাই পারবে।'

ধন্যবাদ আপনাকে, এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্না! জ্ঞানী, বোদ্ধা, কৌশলী...

কালো আকাশে চলমান কালো মেঘের দল। নিষ্প্রভ তারাগুলি শুশেনস্কয়ের উপর দিয়ে ছুটছে। জোতদারদের বাড়ির উঠোনে কুকুরগুলি ঘেউঘেউ করছে। তাদের শেকলের ঝনঝনানি শোনা যাচ্ছে। বসতির বাড়িগুলির জানালায় কেরোসিন বাতির মিটমিটে আলো, জনহীন পথে বাতাসের হুল্লোড়। পাশাকে না পেলে নিষ্ঠুর, একঘেয়ে, নিরাশ নিঃসঙ্গতাই প্রখোরের ভবিতব্য হয়ে উঠত। পাশা, পাশার নীল চোখ, খড়রঙের ভারী বিনুনি! সে জানে, কালই ভ্যাদিমির ইলিচের সঙ্গে তার দেখা হবে। কিন্তু এখনকার মতো পাশা। কেবল পাশাই।

'মন খারাপ করবে না,' পাশা বলে যাচ্ছিল। 'এখানকার লোকজন নির্বাসিতদের ভালই চেনে। খামকা ওরা তোমার কোন ক্ষতি করবে না। ভাল মানুষ হলে ভাল ব্যবহার পাবে। আমাদের লোকগুলো এ-রকমই। তারা এক শ' মাইল দূর থেকেই ভাল-মন্দ বাছাই করতে পারে। এই যেমন ভ্যাদিমির ইলিচ। তুমি জান যে সারা সাইবেরিয়ায় তাঁর নামে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেছে? ওরা বলে, উনি লোকটি খুব ভাল। সৎ মানুষ। ওরা তাই বলে। আচ্ছা প্রখোর, তোমার কি মনে হয় ওরা কোনদিন জারকে হটাতে পারবে?'

মেয়েটি তার সবকিছু তছনছ করে দিল। সে পাশাকে বলতে চেয়েছিল তাকে ছাড়া এখন সে বেঁচে থাকতে পারবে না। এই সকালেই সে পারত। কিন্তু এখন নয়। তাকে ছেড়ে আর বেঁচে থাকা অসম্ভব। সে ঠিক করল যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নিজের গ্রাম থেকে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

'অতটা দূর থেকে!' সন্দেহে পাশা মাথা দোলাল। 'তাইগা পেরিয়ে!'

'তাতে কী? তাইগা আমাকে রুখতে পারবে না!'

'এতটা নিশ্চিত হবে না। বরফের ঝড় শুরু হলে দেখবে সে কী মাতামাতি, সে কী আওয়াজ! তাই বলে সাইবেরিয়াকে ভয় পাবে না। আমরা লোকজন খারাপ কিছু নই...'

সে তাড়াতাড়ি তাকে সরাইখানায় নিয়ে এল, খুবই তাড়াতাড়ি। যদি ছেড়ে যেতেই হবে তবে কেন তাদের দেখা হল।

'পাশা, আমার জন্যে এখানে একটু অপেক্ষা কর।'

সে সরাইখানায় গেল। মিটমিট করে একটি বাতি জ্বলছে, হয়ত তারই জন্য। লোকজন ঘুমুচ্ছে: বেঞ্চ, কাঠের তক্তপোষ, ইটের উনুনের উপর। নাকডাকান, শ্বাসপ্রশ্বাস আর ফোঁসফোঁসানিতে ঘরের বাতাস কাঁপছে। সত্যি, বাতাস এতটা ঘন যে ছুরি দিয়ে কাটা যায়। বেঞ্চির তল থেকে প্রখোর তার কাঠের বাক্সটা বের করল। গলার সুতোয় ক্রুশের বদলে বেঁধে রাখা চাবি দিয়ে সে ওটা খুলল। তলায় শার্ট,

বইপত্র আর নিজের সামান্য জিনিসপত্রের নিচে ছিল মায়ের নরম ধূসর রঙের ভেড়ার লোমের দস্তানাজোড়া — সাদা তারা-আঁকা, লেসের মতো পাড় লাগান। লেসের কাজের জন্য তার মা'র নাম ছিল।

সে ছুটে গিয়ে পাশাকে দস্তানা দিল।

'এগুলো আমার মা'র জিনিস। তাকে মনে রাখার জন্যে বাবা দিয়েছেন। নিলে খুশি হব। আর মনে রেখো, এক সময় ইয়ের্মাকভ্স্কয়েতে প্রখোর নামে একজন নির্বাসিত ছিল।'

'অসম্ভব,' পাশা বলল। 'আমাকে কী ভেবেছ? অচেনা লোকজনদের কাছ থেকে যারা উপহার নেয়, তেমন কেউ? কেন, ওগুলো আমি ছোঁব না!'

'সেই ধরনের অচেনা তো আমি নই। আমি একজন নির্বাসিত রাজনৈতিক কর্মী। বাড়ি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে আমাকে এখানে পাঠান হয়েছে। পাশা, নাও না ওগুলো।'

দস্তানাজোড়া পাশার পকেটে গুঁজে দিয়ে হাত আঁকড়ে ধরে তাকে কাছে টেনে পাশা বোঝার আগেই প্রখোর আনাড়ির মতো তার ভুরুতে চুমু খেল। 'তুমিই আমার প্রথম...'

॥ ১৮ ॥

শবযাত্রা সামনে এগিয়ে চলেছে। কালো পোশাকে, দুঃখে মাথা নুইয়ে অল্পকিছু লোক কফিনের পিছু পিছু চলছে। কফিনবাহকদের প্রখোর দেখতে পাচ্ছিল না। তার মনে হচ্ছিল কফিনটা যেন হাওয়ায় ভাসছে। বড় রাস্তা দিয়ে শবযাত্রাটিকে সে দূর থেকে যেতে দেখল এবং শেষে গাঁ পেরিয়ে কবরখানার দিকে মোড় নিল। প্রখোর ওদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু সে দৌড়তে পারছিল না। কেন? মানুষ তো কফিনের পেছনে ছুটে যায় না। রাস্তা বরাবর বাড়িগুলির ফটকে নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে। তাদের মুখগুলি কঠিন, নিথর। শবযাত্রাটি চোখের আড়াল হলেও ওরা ঘরে গেল না।

ভ্ল্যাদিমির ইলিচ আর নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্না যে ইয়ের্মাকভ্স্কয়েতে প্রখোর সেটা পাশার কাছে শুনেছিল। কিন্তু তাঁরা যে অন্ত্যেষ্টির অনুষ্ঠানে গেছেন সেই খবরটা কেউ তাকে বলে নি। একটিমাত্র সন্ধ্যাই তো সে তাঁদের সঙ্গে কাটাবে। তাই শোকসংবাদ জানিয়ে সেটা তাঁরা নষ্ট করতে চান নি। সন্ধ্যাটাও ছিল চমৎকার। প্রখোর আর এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্না কথা বলছিলেন পিটার্সবুর্গ সম্পর্কে সেখানে তাঁদের স্মৃতিবহ জায়গাগুলি নিয়ে। অবশ্য প্রখোরের চেয়ে তিনি অনেক

বেশি খুঁটিনাটি জানতেন। পিটার্সবুর্গে কেটেছে তাঁর শৈশব আর স্কুলের দিনগুলি। শেষে অনেকদিন ওখানে ছিলেন তাঁর মেয়ের সঙ্গে। তবে একটা ব্যাপারে প্রখোরের কাছে তাঁকে হার মানতে হল। বলশায়া মর্স্কায়া সরণীর লিফার্ত ছাপাখানার নামটি পর্যন্ত তিনি কস্মিনকালে শোনেন নি। তারপর প্রখোর যখন বলল যে সেই 'রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ' বইটির প্রুফ আন্না ইলিনিচ্নার কাছে পড়ে দেখার জন্য নিয়ে যেত তখন এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্না বিস্মিত হলেন। পাশা নির্বাক হয়ে গেল। তাছাড়া সেই সন্ধ্যায় আরও কিছু ছিল...

এখন কেউ তাকে বলেই দেখুক না যে প্রথম দেখার ভালবাসা কিছু নেই। এখন সে একেবারে আলাদা এক মানুষ, উৎসাহে টগবগ করছে, গোটা দুনিয়াকে আলিঙ্গনে বাঁধতে চাইছে।

প্রথম প্রেম! ভীরু, উদার, নিঃস্বার্থ। যে-মানুষ তার স্বাদ পেয়েছে সে ভাগ্যবান, এমন কি ব্যর্থ হলেও।

শবযাত্রার পিছু পিছু প্রখোর জলদি পা চালাল। কিন্তু তার মনে পাশা ছাড়া আর কিছু ছিল না। পাশা — পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম, যেন নতুন ব্যাঙের ছাতাটি। তার কানে বাজছিল ওর সেই 'অ্যাঁ' কথাটি। না, সে এখন অসহায়। তাছাড়া সে তো জানে না এটা কার অন্ত্যেষ্টি। অচেনা লোকের জন্য কান্নাকাটি অসম্ভব যে। আসলে ভ্লাদিমির ইলিচকে দেখার জন্যই সে শবযাত্রার পিছু নিয়েছে। নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্নাকেও।

কবরখানার কাছেই তাইগার শুরু। সবকিছু নিস্তব্ধ, নিথর। মেঘভরা আকাশটিও অনড়। শরতের ঝড়ো হাওয়া ঝোপঝাড় আর গাছপালার পাতাগুলি খসিয়ে দিয়েছে। কাঠের ক্রুশ আর ছোটছোট ঢিপি ভরা কবরখানা এখন নগ্ন, বিষণ্ণ।

কফিন কোনকিছুর উপর তোলা হল। প্রখোর এবার মৃতের চেহারা দেখতে পেল। নিটোল আদল, লালচে রঙের ছাঁটা দাড়ি, শান্ত অপার্থিব মুখশ্রী, বাদামী ওক-পাতায় ঘেরা। কফিনের মাথায় দাঁড়ান অল্পবয়সী এক মহিলা, চুলে কালো রুমাল বাঁধা। তিনি কাঁদছেন না।

কে একজন বক্তৃতা দিচ্ছেন: 'বিদায়, আনাতোলি...'

এবং তখনই প্রখোর ভয়ে আচ্ছন্ন হল। কবরখানা, নিষ্পত্র ঝোপঝাড়, নিচু আকাশ, নিবিড় তাইগা, মেঘে-ঢাকা পাহাড়ের অস্পষ্ট আদল আর কফিনের পাশে দাঁড়ান ভেঙ্গে-পড়া, প্ররোধহীন, মাথায় কালো রুমাল এক নারী... জীবন কী? জীবন কেন? মরে গেলে তো সবই শেষ!

কে যেন কফিনের দিকে এগিয়ে এলেন। প্রখোর তাঁকে চিনতে পারল। পদল্স্কের বাড়িতে তাঁর ফোটো দেখেছে।

'আমরা কবর দিচ্ছি আমাদের কমরেডকে, বন্ধুকে, যার জীবন জার সরকার ধ্বংস করে দিয়েছে,' ভ্লাদিমির ইলিচ শুরু করলেন।

আর তখনই প্রখোর বুঝতে পারল যে উনি অবিকল সেই ফোটোর মতো দেখতে হলেও আসলে অনেকটাই আলাদা: বেঁটেখাট, মাথায় টাক আর দেখতেও খুবই সাধারণ। তবু প্রখোর কিছুতেই কেন তাঁর মুখ থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না? এই মুখ অদ্ভুত প্রাণবন্ত, চঞ্চল, অনুভূতি আবেগে ভরপুর। দেখে মনে হয়, তিনি আধমনা হয়ে কিছুই করেন না। ভালবাসলে সত্যিই ভালবাসেন। শোকে দারুণ শোকার্ত হন। তাঁর অনুভূতিগুলি দুর্দম।

'ধন্যবাদ ভানেয়েভ। আপনার সাদাসিধে সৎ জীবনের জন্যে ধন্যবাদ,' তিনি বলতে লাগলেন। 'শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শের জন্যে আপনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। ধন্যবাদ। আমরা এজন্যে গর্বিত। আজীবন আপনি শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শের জন্যেই লড়াই করে গেছেন। আনাতোলি, প্রিয় বন্ধু... খাঁটি বন্ধু আমাদের...'

মুহূর্তকাল ভ্লাদিমির ইলিচ চুপ করে রইলেন। তিনি নিজের গলায় হাত ছোঁয়ালেন, বিষণ্ণ ভঙ্গিতে ভুরু কোঁচকালেন।

হালকা বরফ পড়া শুরু হল। শুকনো বরফের কণা উড়ে উড়ে ভানেয়েভের কপালে এসে জমছিল। গলছিল না। কালো রুমাল পরা মহিলাটি কফিনের কিনার আঁকড়ে হতাশ চোখে তাকিয়ে আছেন ওই বিবর্ণ মুখের দিকে, যে-মুখটি কিছুক্ষণ আগেও সজীব ছিল, যেখানে ভালবাসার, যন্ত্রণার ছাপ পড়ত, কিন্তু এখন তা মৃত, সব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

'আপনি আর আমাদের মধ্যে নেই, খাঁটি বন্ধু আমাদের,' নিচু গলায় আস্তে আস্তে ভ্লাদিমির ইলিচ বলতে লাগলেন। 'আমাদের সাধারণ লক্ষ্যের দিকে সবার সঙ্গে এগিয়ে যেতে কী আগ্রহই না আপনার ছিল! মনে পড়ছে, এই সেদিন... আপনার অকাল মৃত্যুর নামে আমরা শপথ করছি, আমরা শপথ করছি বন্ধু! জেল, মৃত্যু আমাদের ভয় দেখাতে পারবে না। এখন আমরা মাত্র কয়েকজন, কিন্তু ক্রমেই আমাদের সংখ্যা বাড়বে। আমরা ঘনিষ্ঠ। আমরা অনড়। আনাতোলি, আপনি প্রথম সারির যোদ্ধা ছিলেন। আপনার স্মৃতি অবিস্মরণীয় হোক, আমাদের প্রিয় আনাতোলি ভানেয়েভ।'

কালো রুমাল মাথায় মহিলাটি আনাতোলির মুখে হাত বুলিয়ে বরফের কণাগুলি আস্তে আস্তে সরিয়ে দিলেন। ঝোপে পাখিরা কিচিরমিচির করছিল। স্তব্ধতা ভেঙে হাতুড়ির শব্দ উঠল। দ্রুত, তীক্ষ্ণ। কফিনের ঢাকনিতে পেরেক মারা চলছে। ভয়ে পাখিরা উড়ে গেল। কাঠের ক্রুশের ভিড়ে আরও একটি নতুন ঢিপি উঠল। কাজ শেষ হল।

অন্ত্যেষ্টির পরই প্রখোর ভ্লাদিমির ইলিচের কাছে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু সহকর্মীরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন। বান্ধবীদের হাতে ভর দিয়ে বিধবা মহিলাটি কবরখানা থেকে বিদায় নিলেন।

কে যেন ভ্যাদিমির ইলিচকে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ করলেন, প্রখোর শুনল। নাদেজ্দা কনস্তান্তিনভ্নার মুখে ছিল অসুস্থতার ছাপ।

'তুমি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ছ না তো,' ভ্যাদিমির ইলিচ তাঁকে বললেন। 'আমরা বরং তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরি।'

যে-বাড়িতে তাঁরা গেলেন সেটা মনে রেখে প্রখোর দ্রুত আঞ্চলিক সরকারী অফিসে ছুটল। অন্ত্যেষ্টি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওখানে তার হাজিরা দেয়ার কথা। বোঁচা নাক, বড় বড় কান, তেল-মাখা চুলওয়ালা গ্রাম্য কেরানিটি একটি বড় খাতায় হুকুম বা ওই জাতীয় কিছুর নকল লিখছিল। প্রখোর গলা খাঁকারি দিল। কিন্তু কেরানি ভ্রুক্ষেপ করল না। প্রখোর আরও জোরে কাশতে লাগল।

'আগুন তো লাগে নি। একটু অপেক্ষা কর,' কেরানিটি বলল।

সে প্রখোরকে আধ ঘণ্টার মতো দাঁড় করিয়ে রাখল। শেষ পর্যন্ত একটি পাতায় কিছুক্ষণ ফুঁ দিয়ে কালি শুকানো সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে খাতাটা বন্ধ করল এবং নির্বাসিতের কর্তব্য সম্পর্কে প্রখোরকে কিছু বলার উদ্যোগ নিল: নির্বাসিতের পক্ষে বিনা অনুমতিতে গাঁ ছেড়ে যাওয়া নিষেধ, সে রাজনীতি নিয়ে আলাপ করবে না, ক্ষতিকর কোন বই পড়বে না।

'কিন্তু বইটা ক্ষতিকর কি না সেটা জানা যাবে কীভাবে?' প্রখোর জিজ্ঞেস করল।

'সরকার জানে। কেবল শুনে যাবে, তর্ক করবে না।'

অনেকক্ষণ সে এটিই চালাল।

'দেখা হওয়ার আগেই তাঁরা হয়ত চলে যাবেন,' প্রখোর আক্ষেপ করতে লাগল। 'বোঁচা নাক আহাম্মক কোথাকার, তোর বকবকানি কি কোনদিন শেষ হবে না? শয়তান তোর ঘাড় মটকাক!'

'স্যর, আমি কি এখন আমার থাকার জায়গাটায় একটু যেতে পারি? পরে আপনার নির্দেশ শোনার জন্যে আবার আসব,' প্রখোর কথা বলার সুযোগ নিল।

'স্যর' বলায় কাজ হল। তার জন্য আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের বাছাই করা ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার অনুমতি সে সহজেই পেয়ে গেল। বাড়িওয়ালি বুড়ি তাকে আরেক দফা কড়া জেরা করল। অচেনা লোককে ভাড়াটিয়া নিলে শেষে হতাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পরে যাতে ফাঁকির সুযোগ না ঘটে সেজন্য আগেভাগেই সবকিছু ঠিক করে নেওয়া দরকার। বুড়ো-বুড়ী নিজের আয়েই সংসার চালায়। বুড়ো অনেক দিন থেকেই অসুস্থ। কেবল জরুরি প্রয়োজনেই সে উনুনের উপরের বিছানা থেকে নিচে নামে।

'বাড়ির সব কাজই আমাকে করতে হয়,' বুড়ী প্রখোরকে বলল। 'ঘোড়ার মতো খাটি আর খাটি। কিন্তু খাটে পৌঁছলেই পিছুটান শুরু হবে। চাষাভুষোর বাড়িতে পুরুষ ছাড়া চলে না। আমি তাই একজন ভাড়াটে রাখি। তুমি গোরুর জল আনবে,

গোয়াল পরিষ্কার করবে, উনুনের জন্যে কাঠ কাটবে, পুরুষের সবগুলো কাজই তোমাকে করতে হবে।'

'রাজি।'

প্রখোর তার কাঠের বাক্সটা বেঞ্চের নিচে ঠেলে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

'মাথা খারাপ নাকি হে, থাম, অপেক্ষা কর!' বুড়ি চেঁচিয়ে উঠল এবং শেষে বিড়বিড় করতে লাগল: 'হুঃ! একটা আস্ত পাগলাকে ভাড়াটে করে পাঠিয়েছে। দিনের বেলায়ই ওর সঙ্গে থাকতে ভয় করছে। ওকে আমি আর ঘরেই ঢুকতে দিচ্ছি না!'

অন্ত্যেষ্টির পরে যে-বাড়িতে ভ্লাদিমির ইলিচ আর নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন প্রখোর সেদিকে ছুটল। কিন্তু পৌঁছেই দেখল একটি ঘোড়ার গাড়ি ফটক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ভ্লাদিমির ইলিচ গাড়িটা চালাচ্ছেন। হালকা তামাটে রঙের ঘোড়া, কালো কেশর, লেজের আগায় কালো দাগ, হাঁটু অবধি কালো রঙের মোজা, চলেছে দুলকি চালে।

প্রখোর দৌড়ে ফটক পেরিয়ে গাড়ির পেছনে ছুটল। বাড়ির কর্তা ও কর্ত্রী অতিথিদের বিদায় দিতে এসে তাকে দেখে অবাক হলেন। কেউ কেউ প্রখোরকে চিনতে পারলেন: নতুন নির্বাসিত, কবরখানায়ও দেখা হয়েছে।

অন্ত্যেষ্টির সময় যে-বরফ পড়ছিল তা এখন থেমে গেছে। জমাট মাটিতে বরফের গুঁড়ো ছড়ান। পথঘাট পিছল। ঘোড়া ততটা জোরে ছুটতে পারছিল না। গ্রাম ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রখোর তাঁদের ধরে ফেলল। সামনের রাস্তা চলেছে কুয়াশা-ঢাকা মাঠ পেরিয়ে বনের দিকে। দৌড়নোর জন্য তার হাঁপ ধরেছিল। জোরে শ্বাস ফেলতে ফেলতে সে গাড়ির কিনার ধরে নীরবে হাঁটতে লাগল। ভ্লাদিমির ইলিচ কৌতূহলের সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে ঘোড়ার লাগাম টানলেন।

'হ্যালো, ভ্লাদিমির ইলিচ, নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না,' শেষ পর্যন্ত প্রখোর বলতে পারল।

'হ্যালো,' ভ্লাদিমির ইলিচ জবাব দিলেন, 'কিন্তু আগে তো আপনাকে দেখি নি।'

'আমিও না। বাড়ি থেকে সবাই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।'

'নাদিয়া, শুনছ?' তাঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ভ্লাদিমির ইলিচ গাড়ির এক পাশে হেলান দিয়ে প্রখোরকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন: 'পদল্‌স্কে ছিলেন নাকি? কবে? কার সঙ্গে দেখা হয়েছে? মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভ্‌নার সঙ্গে? কথা হয়েছে তাঁর সঙ্গে? কী বলেছেন তিনি? আমাকে কিছু বলতে বলেছেন?'

মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভ্‌নার সঙ্গে প্রখোরের দেখা হয়েছে, কথাও হয়েছে। কিন্তু ভ্লাদিমির ইলিচকে কোন শুভেচ্ছা তিনি জানান নি। সে তো জানত না সাইবেরিয়ার কোথায় তাকে পাঠান হচ্ছে। ক্রাসনোয়ার্স্ক থেকেই এর হুকুম মেলে। ইর্কুতস্কের

গভর্নর-জেনারেল সাইবেরিয়ার নির্বাসিতদের দায়িত্বে থাকায় এটা তাঁরই এখতিয়ার। পদল্স্কে কাটান সেই ক্ষণিকের সুখদিনটির পর প্রখোরের সঙ্গে উলিয়ানভদের আর দেখা হয় নি। আন্না ইলিনিচ্না তার সঙ্গে বুতির্স্কায়া জেলে দেখা করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অনুমতি মেলে নি।

'মানে, তারা আমাকে তাদের শুভেচ্ছা জানায় নি। থাক গে। আসল কথা, আপনি তাদের দেখেছেন, কমরেড... কী আপনার নাম? প্রখোর? কমরেড প্রখোর, দয়া করে এবার ওদের কথা বলুন, যতটা সম্ভব খুঁটিনাটি,' ভ্লাদিমির ইলিচ কোমল মিষ্টি স্বরে বললেন।

নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্না তাঁর হাত থেকে লাগাম নিলেন। তিনি লাফিয়ে মাটিতে নামলেন। কিছুটা ভারী গড়নের হলেও তিনি যে খুবই উচ্ছল, চটপটে সেটা প্রখোর লক্ষ্য করল। তাঁকে তরুণ, হাসিখুশি আর উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

'আপনি নিজের চোখে আমার মাকে দেখেছেন?'

'নিশ্চয়ই, আর কার চোখে দেখব, বলুন?'

'আপনি যে তাঁকে দেখেছেন এটা এক দারুণ ব্যাপার! আজকের দিনটা আমাদের জন্যে দুঃখের। এমন দিনে বাড়ির খবর মহামূল্যবান বৈকি! তাঁকে কেমন দেখেছেন — যতটা মনে আছে ভাল করে বলুন তো।'

গাড়ির ধারে তাঁরা পরস্পরের কাছে দাঁড়ালেন। ভ্লাদিমির ইলিচের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে কেমন অস্থিরতা। মুখের কোণে তিক্ত রেখার আভাস। প্রখোর তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করল। পদল্স্কের বাড়ির রঙিন বর্ণনায় সে মেতে উঠল।

'মেঝেগুলো হলুদ রঙের আর কাচের মতো ঝকঝকে, খাবার ঘরের টেবিলে ঢাকনিটা ঝালর-দেয়া। প্রত্যেকটি ঘরেই বইয়ে ঠাসা তাক। আপনার মা মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না বিকেলটা পিয়ানো বাজিয়ে কাটান। ওই কালো পিয়ানোয় তিনি এমন সুর তোলেন যে কেবলই কাঁদতে ইচ্ছে হয়।'

চার বছর হল ভ্লাদিমির ইলিচ কোন বাজনা শোনেন নি। শৈশবে, কৈশোরে সারা বাড়ি মায়ের বাজনায় মুখরিত থাকত। পরে পিটার্সবুর্গেও মাঝে মাঝে কনসার্টে গেছেন। আর আজ কতদিন! মায়ের জন্য এখন বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা তাঁকে আবিষ্ট করল। এমন অসাধারণ মা...

'মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্নার চুল সাদা, খুবই সাদা। লেস দেয়া মাথার সাজ পরেন...'

'নিশ্চয়ই কোন ছুটির দিন ছিল, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্নার ওখানে সবাই জড়ো হয়েছিল,' নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্না মন্তব্য করলেন।

'সবাই কিনা জানি না, হয়ত তাই। তাঁরা বলছিলেন, কেবল ভলোদিয়া নেই। মানে, আপনি ভ্লাদিমির ইলিচ। তখন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না বললেন: 'আমি

কি কোনদিন আমার সব ছেলেমেয়েকে একসঙ্গে বসতে দেখব! ততদিন আমি বাঁচব, কি বাঁচব না?' পরিবারটি খুবই ঘনিষ্ঠ, মানে আপনার আত্মীয়েরা। লোক তাঁরা ভাল। নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্না, তাঁরা আপনার কথাও বলেন।'

'আসলে আপনি একজন ভাল মানুষ, প্রখোর,' ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন।

'ভলোদিয়া, তাহলে রাতটা ইয়েরমাকভ্স্কয়েতে থেকে যাই? তুমি তখন প্রাণ ভরে কথা বলতে পারবে। কী বল?' নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্না পরামর্শ দিলেন।

'সেটা অসম্ভব। তোমার শরীরটা ভাল নেই। তাছাড়া ঘোড়া আর গাড়িটাও একদিনের জন্যে ভাড়া নিয়েছি।'

ঘোড়াটা হঠাৎ জোর কদমে চলতে শুরু করল, যেন ওর সম্পর্কে কথাটার অর্থ বুঝেছে।

'হো! হো! একটা কথা, কমরেড প্রখোর, আপনি কি দ্মিত্রি ইলিচকে দেখেন নি? জানেন সে কেমন আছে? শরীর ভাল?'

'দ্মিত্রি ইলিচ! কেন, এই তো! মাফলারটা তাঁরই দেয়া। আসলে দ্মিত্রি ইলিচ নিজে ওটা দেন নি, দিয়েছেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না। বললেন, নিয়ে নাও, শীতের সময় পরবে, মিতিয়ার মাফলার। দেখুন না ভ্লাদিমির ইলিচ কী গরম! গলায় জড়ালে উনুনের মতো তাপ লাগে।'

ভ্লাদিমির ইলিচ মাফলারটা ছুঁয়ে দেখলেন এবং বললেন যে ওটা নিশ্চয়ই খুব গরম হবে। 'তাহলে দ্মিত্রি ইলিচ ভালই আছে। তাই কি?'

নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্নাও মাফলারটি দেখতে এগিয়ে এলেন এবং যাঁকে তিনি মানিয়াশা ডাকতেন, অর্থাৎ মারিয়া ইলিনিচ্নার কথা জিজ্ঞেস করলেন।

'মারিয়া ইলিনিচ্না খুবই গম্ভীর মানুষ। দোলনা-চেয়ারে বসে সারা সন্ধ্যা তিনি চুপ করে থাকেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে কেউ সাহস পায় না। উলিয়ানভদের মধ্যে একমাত্র ওঁরই কাছে ঘেঁসা যায় না।'

'কে, মারিয়া ইলিনিচ্না?' ভ্লাদিমির ইলিচ যেন ধাঁধায় পড়লেন।

'হয়ত মনে কোন দুশ্চিন্তা আছে,' নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্না বললেন। 'মানিয়াশা খুবই হাসিখুশি, আলাপী। তার বয়সে আমিও কিছুতেই মন বসাতে পারতাম না। প্রথমে চেয়েছিলাম গাঁয়ের স্কুলে শিক্ষকতা করতে। কিন্তু চাকুরি জুটল না। তারপর মেয়েদের প্রশিক্ষণ কোর্সে মিছেই ভর্তি হলাম। ছেড়ে দিলাম সঙ্গে সঙ্গেই, জীবনের একটা লক্ষ্য খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। মানিয়াশারও এখন এই অবস্থা চলছে। সে তো অল্পবয়সী।'

প্রখোর তার উদ্ধারকারী আন্না ইলিনিচ্নার এক বিরাট কাব্যিক বর্ণনা দিল। তাঁর কণ্ঠস্বর গভীর, ব্যঞ্জনাময়। তিনি চমৎকার আলাপী। আর অসম্ভব বুদ্ধিমতী... তাঁর চোখ... মনে হয় যেন ভেতর পর্যন্ত দেখছেন।

হাসিমুখে ভ্লাদিমির ইলিচ এসব শুনছিলেন। মায়াভরা হাসি। প্রখোরের কোন বড় ভাই থাকলে তিনিও তার কথা শুনে হয়ত এমনটিই হাসতেন।

'আপনার চোখ আছে, কমরেড প্রখোর,' নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না বললেন। 'কোন এলাকায় আপনার বাড়ি?'

প্রখোর লজ্জায় আচ্ছন্ন হল। তার জীবন যে অদ্ভুতভাবে, বিস্ময়করভাবে ভ্লাদিমির ইলিচ আর উলিয়ানভদের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, সেই কাহিনী সে বলতে পারল না। তাই লিফার্তের ছাপাখানায় ভ্লাদিমির ইলিচের বইটি ছাপান, পিটার্সবুর্গে আন্না ইলিনিচ্‌নার সঙ্গে তার দেখা কিংবা কুস্‌কভার চক্র, সেখানে তাঁর শত্রুতামূলক, ভণ্ডামিপূর্ণ 'ধর্মমত' রচনা — এসব না-বলাই থেকে গেল। শরতের ছোট দিন, এখনকার বিষণ্ণ আকাশ, দীর্ঘ পথ, পথে তাইগার গভীরে বাতাসের অপয়া গুঞ্জন — এসবের জন্যও তার কাহিনীটা শেষ হল না। ভ্লাদিমির ইলিচ আর নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না তো বাড়ি ফিরবেন।

'আমি পিটার্সবুর্গের শ্রমিক, ছাপাখানায় কাজ করি,' এটুকুই শুধু প্রখোর বলল।

'এত অল্পবয়স, এরই মধ্যে ছাপাখানার কর্মী?' মনে হল নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না অবাক হয়েছেন।

'দেখুন, কমরেড প্রখোর,' বললেন ভ্লাদিমির ইলিচ। 'দিনটা আমাদের জন্যে দুঃখের। আজ আমাদের এক বন্ধুকে কবর দিলাম। তিনি তাঁর সারাটা জীবন শ্রমিক শ্রেণীর ও তার আদর্শের জন্যে উৎসর্গ করেছিলেন। খুবই গুণী কমরেড ছিলেন। হয়ত আপনিই তাঁর জায়গায় দাঁড়াবেন। খুবই গুরুতর ব্যাপার। নির্বাসনে থাকা কিন্তু মোটেই সোজা নয়। তবে ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়ের লোকজন ভাল। এটাই ভরসা। বাজে কাজে সময় নষ্ট করবেন না। পড়াশুনো করবেন। এটাই হল সেরা কাজ। বলছিলাম কী, একটা পাঠ্যসূচী তৈরি করুন। প্রতিটি দিনের কাজ হিসাব করে...'

উনিও আন্না ইলিনিচ্‌নার মতো তাকে পড়তে বলছেন।

'শুশেনস্কয়েতে আমাদের দেখতে আসবেন,' নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না তাকে আমন্ত্রণ জানালেন।

ভ্লাদিমির ইলিচ গাড়িতে উঠে ল্যাগাম ধরলেন।

'বিদায়, কমরেড প্রখোর। সাহস রাখবেন। কিছু দরকার হলে আমাকে জানাবেন। আসবেন কিন্তু!'

নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না দস্তানা নাড়লেন।

চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত প্রখোর গাড়ির দিকে তাকিয়েই রইল।

॥ ১৯ ॥

প্রখোর গাঁয়ে ফিরে এল। অন্ত্যেষ্টির সময় সে ভ্লাদিমির ইলিচ ছাড়া অন্যদিকে বড় একটা তাকায় নি। উপস্থিত অন্যান্যদের কারও মুখই এখন তার মনে পড়ল না। তবে একজনকে সে অবশ্যই লক্ষ্য করেছিল: লম্বা লোকটি, মুখটা কোমল, রোদ-পোড়া নয়, সূক্ষ্ম খোদাই করা ভুরু, পাঁশুটে লাল চুল।

প্রখোরের কোন সত্যিকার বন্ধু ছিল না। কোনদিনই ছিল না। চিন্তাটা তিক্ত হলেও সত্যি। ছেলেবেলায় পদল্স্কে এক দঙ্গল ছেলের সঙ্গে সে ছুটোছুটি করত। তারা ডাংগুলি খেলত, পাঞ্জা লড়ত, জঙ্গলে বেঙের ছাতা কুড়োত, দল বেঁধে স্কুলে যেত। একটি ছেলের কথা আজও মনে পড়ে। তারা দুজন পদল্স্ক থেকে পালানোর পরামর্শ করত। কিন্তু গন্তব্যটা তারা জানত না। ওখানকার জীবন যে অন্যরকম — কেবল সরাইখানা, শুঁড়িখানা, মাতাল বেনিয়া আর ভাড়াখাটা ঘোড়ার গাড়ি নয় — এতে তারা নিঃসন্দেহ ছিল। প্রখোর পিটার্সবুর্গ গেল একা। তার বন্ধুটি পদল্স্কেই থেকে গেল। সে চাকুরি নেয় সরাইখানার আস্তাবলে। সৎমা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে স্কুলের ওই বন্ধুর কাছেই তার কাঠের বাক্সটি সে জমা রেখেছিল। সে রাজি হল কিন্তু জানিয়েছিল: 'ঠিক আছে। রেখে যা। কাউকে বলিস না কিন্তু। নির্বাসনের মেয়াদ পেয়েছে এমন কারও সঙ্গে খাতির রাখা খুব সুবিধের নয়, বুঝলি! এটা এখানে সবাই বলে। আমাদের ওই মাস্টারের কথা মনে আছে? ওকে সাইবেরিয়ায় মেয়াদ খাটতে পাঠিয়েছে।'

পিটার্সবুর্গে লিফার্তের ছাপাখানায় প্রখোরের বয়সী কেউ ছিল না। ওখানকার অন্য সবাই ছিল বয়স্ক। বন্ধুত্বের দুর্দম বাসনা সত্ত্বেও কোন বন্ধু সে পেল না —এটি আপতিক না তার দুর্ভাগ্য? সেজন্যই অন্ত্যেষ্টির অনুষ্ঠানেও যে গর্বিত-মুখ লোকটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, তাকে দেখে প্রখোর মুগ্ধ হল, তাকে খুঁজতে লাগল।

বিশ্রী আবহাওয়ার জন্য পথ জনশূন্য। প্রখোর জলদি পা চালিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ওই লোকটিকে একটি বাড়ির ফটকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। তার লোমের টুপিটা মাথার পেছনের দিকে সরান, হাতদুটি পকেটে, দৃষ্টিতে উদগ্র অহঙ্কার। ওর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা নিমেষে মন থেকে উবে গেল। প্রখোর পাশ কাটিয়ে চলেই যাচ্ছিল। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল এবং যা দেখল তা একেবারে আলাদা, অভাবিত: লোকটির মুখে বিষণ্ণতা। কোন যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রখোর এক আকস্মিক টানে পেছনে এল।

'আমি ভ্লাদিমির ইলিচকে ধরতে ছুটছিলাম।'

'ধরতে পেরেছ?' সে পকেট থেকে তার হাতদুটি বের করল।

শোনা যায়, মানুষ প্রথম সাক্ষাতেই প্রেমে পড়ে। কিন্তু এভাবে কি বন্ধুত্ব হয়? হতে পারে। এমনটি ঘটে থাকে।

লেওপোল্ডেরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু কেউ ছিল না। রাজনীতি ও পড়াশোনা নিয়ে অবাধ মতবিনিময়ের মতো কোন অন্তরঙ্গ সুহৃৎ তার জোটে নি। কারও সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনার ব্যাপারে বাবার কড়া নিষেধ। লেওপোল্ড নিজেও এটা জানে। লালমুখো, লম্বা খড়রঙের গোঁফওয়ালা পুলিশ সার্জেন্টকে সে ভুলে যায় নি। গাঁয়ের অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে সে মাছ ধরতে, শিকারে যেত। কিন্তু এর বেশি এগুতে তার ভয় হত। আর এই নতুন লোকটি আসল ব্যাপারটা নিয়েই শুরু করল।

'তুমি কি ভানেয়েভকে চিনতে? কী ধরনের বিপ্লবী কাজ তিনি করেছেন?'

লেওপোল্ড ভানেয়েভকে বেঁচে থাকা অবস্থায় দেখেছে, তাঁর বিপ্লবী কাজকর্মের কথাও শুনেছে।

'জান, পিটার্সবুর্গে তাঁর পার্টি-ছদ্মনাম কী ছিল? মিনিন। শ্রমিকদের প্রত্যেকটি চক্র তাঁকে জানত, ভালবাসত। পুলিশরা হন্যে হয়ে খুঁজল: মিনিন, মিনিন কী? আহাম্মক সব। জীবনের শেষ পর্যন্ত ভানেয়েভ সংগ্রামী ছিলেন। এবার নিজের কথা বল তো।'

লেওপোল্ডের বিস্মিত উক্তিতে উৎসাহিত প্রখোর ইয়ের্মাকভ্স্কয়ে তার আসার আনুপূর্ব ঘটনাবলী সবই বলল। শ্রোতার নিবিষ্টতার মতো আর কিছুই বক্তাকে ততটা উদ্দীপ্ত করে না। প্রখোর উত্তেজনার বশে গল্পটাকে অনেকটা ফাঁপিয়ে তুলল, নিজের ঝুঁকিগুলির কথা বলল আর জেলের হতাশাবোধের ব্যাপারটা চেপে গেল।

'তুমি মিস্কেভিচ পড়েছ?'

প্রখোর চিন্তার ভান করল।

'মিছিমিছি মাথা নিঙড়াবে না,' লেওপোল্ড তাকে বলল। 'পড়লে আর কোনদিন ভুলতে না। উনি আমাদের নামী পোলিশ কবি। পোল্যান্ড থেকে রাশিয়ায় নির্বাসিত হন। এখানেই পুশকিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। পুশকিনের নাম জান তো?'

গদ্যই প্রখোর পছন্দ করত। 'ক্যাপ্টেনের মেয়ে', 'তারাস বুলবা'। গোর্কির লেখাও তার ভাল লাগত।

'কে, কার কথা বললে?' লেওপোল্ড জিজ্ঞেস করল।

'মাক্সিম গোর্কির নাম শোন নি? তাঁকে তোমার খুব ভাল লাগত! তাঁর নাম পিটার্সবুর্গের সকলের মুখে মুখে। আমার সঙ্গে গোর্কির একটি বই আছে। ধার দিতে পারি। ওহ্, তুমি তো কাল চলে যাবে? আমি দুঃখিত। সত্যি দুঃখিত। তবু বইটা তোমাকে দেব। সুযোগমতো ফেরত দেবে। পরস্পরের সঙ্গে দেখা করার একটা পথ বের করার কথা ভাবা যাবে। তাহলে তুমি মাক্সিম গোর্কি পড় নি! দেখবে!'

'তাঁর মধ্যে এমন কী আছে?'

'সবকিছু। তিনি শ্রমিকের, বিপ্লবের পক্ষে। এটাই হল কথা। শোন: 'উঁচু পাহাড়ের পথে গুটিসুটি মেরে একটি সাপ কুয়াশা-ঢাকা গিরিসঙ্কটে এসে থামল...' চালিয়ে যাব?'

'যাও।'

''হঠাৎ রক্তমাখা ডানা আর ক্ষতবিক্ষত বুক নিয়ে একটি বাজ ওই গিরিসঙ্কটে, কুণ্ডলিত সাপের কাছে পড়ল।' সাধারণ বাজ ভাবছ? না, তা নয়। বলা হয় যে বাজ। কিন্তু আসলে...'

'আমি নিজেই বুঝব। ব্যাখ্যার দরকার নেই।'

''সমুদ্র জ্বলজ্বল করছে। এক ঝলক আলো আর প্রচণ্ড ঢেউ তীরে ভাঙছে...' তাছাড়াও আছে তাঁর 'বুড়ি ইজেরগিল'। ওটাও পড়ার মতো।'

'তাহলে চল, তোমার মাক্সিম গোর্কি নিয়ে আসি,' লেওপোল্ড বলল। 'আচ্ছা, বল তো, জীবনের লক্ষ্য ছাড়া কি বাঁচা যায় ওই রকম দিনের পর দিন? নিশ্চয়ই তুমি বেশি অর্থ উপার্জন করবে, ভাল জামাকাপড় ও অন্যান্য জিনিস কিনবে। এই তো সব। আর কোন লক্ষ্য নেই। এভাবে বাঁচা যায়?'

'কী আজেবাজে কথা বলছ! একজন নির্বাসিত, একজন বিপ্লবী হিসেবে জীবনের লক্ষ্য ছাড়া আমি বাঁচব কীভাবে? অর্থের কোন পরোয়া করি না। আমার লক্ষ্য জারকে উৎখাত করা, পুঁজিবাদকেও, আর...'

'এত জোরে নয়, আস্তে। তোমাকে বুঝেছি। আমিও এই মতের মানুষ, আমার লক্ষ্যও তাই। আমাদের মেয়াদ শেষ হলে পোল্যাণ্ডে ফিরে তোমাকে নিয়মিত চিঠি লিখব। নির্বাসনে চিঠি পাওয়ার আনন্দ কী, জান না। বাবা দৈবাৎ চিঠি পান। কিন্তু প্রত্যেক ডাকেই উলিয়ানভদের গাদাগাদা চিঠি আসে। তাঁদের আনন্দ দেখার জন্যেই তখন বিশেষভাবে ওখানে যাই। ভ্লাদিমির ইলিচ একটি করে খাম খোলেন। দাড়ি টানেন আর খুব তড়িঘড়ি প্রত্যেকটি পাতা পড়ে যান...'

'লেওপোল্ড, একটা কথা বল তো। আমি পুরো সত্য জানতে চাই। উনি মানুষটা কেমন?'

'এর উত্তর দেয়া আমার পক্ষে কঠিন। জানি না কার সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে। তিনি ভাল মানুষ বললে খুবই কম বলা হয়। উনি অন্য কারও মতো নন।'

'বুঝলাম। ছেলেবেলায় আমি মানুষকে দুভাগে ভাগ করতাম: সাধারণ, আর অসাধারণ। অসাধারণদের সংখ্যা এক হাতের আঙুলের চেয়েও কম। কিন্তু আছে...'

''কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার' পড়েছ?' লেওপোল্ড জিজ্ঞেস করল।

প্রখোর বিপদে পড়ল। মিথ্যা সে বলতে পারত। কিন্তু ইচ্ছা হল না। নিশ্চয়ই 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার' বইটির নাম শুনেছে, কিন্তু পড়া হয়ে ওঠে নি।

'পড় নি!' বাড়তি আতঙ্কে লেওপোল্ডের শ্বাস আটকে গেল। 'আর 'পুঁজি'র প্রথম খণ্ড?'

'না।'

'আর...'

'বাদ দাও। আর কোন জেরা নয়। জেলের মধ্যে কোথায় এসব বেআইনী বই পাব? তার আগে লাইব্রেরি থেকে বই এনে পড়তাম। লাইব্রেরিয়ান তার ইচ্ছামতো বই দিত। এখন এটা পুষিয়ে নেব।'

'ইয়ের্মাকভ্স্কয়ের নির্বাসিতদের মধ্যে লেপেশিন্স্কিরা আর সিল্ভিনরা আছেন। ভ্লাদিমির ইলিচ সব সময় ওঁদের কথা বলেন। ওঁরা নাকি ভাল লেখাপড়া জানেন। ভ্লাদিমির ইলিচের আরেকজন বন্ধু আছেন — গ্লেব ক্র্জিজানভস্কি। দুনিয়ার সবকিছু জানেন। কিছুই তাঁর অজানা নেই। শোন, এই কবিতা তিনি পোলিশ ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন। বাবা তাঁকে আবৃত্তি করে শোনান, আর তিনি অনুবাদ করেন:

'খেপা দানব হন্তা জালিম ভয় দেখায়,
আমাদের আটকে রাখে জেলখানায়।
তবু তো মন মুক্ত পাখি, যদিও দ্বারে তালা,
তোরাই যাবি জাহান্নমে, আসবে তোদের পালা।

আমার কী হল? পথে পঞ্চম স্বরে গান ধরেছি! আরেকজনের কথাও বলা দরকার। লেঙ্নিক। গাঢ় রঙের দাড়িওয়ালা, রুক্ষ ধরনের মানুষ। চমৎকার দাবাড়ে। মাইল সত্তর দূরের গাঁ তেসিন্স্কয়ে থাকেন। এঁরাই ভ্লাদিমির ইলিচের বন্ধু। বাবা বলেন এমন বন্ধু থাকলে আপদ-বিপদের কোন ভয় নেই। তাহলে আমরা বন্ধু হলাম, প্রখোর?'

'তাই।'

'ভালমন্দের সমান অংশীদার। পরস্পরের কাছে কিছুই লুকব না। কিছু না। ঠিক?'

'ঠিক।'

তারা রাস্তার একমাথা থেকে অন্য মাথা অবধি পায়চারি করছিল। সময়ের কোন খেয়াল ছিল না। আসন্ন সন্ধ্যার আভাস তাদের চোখে পড়ে নি। কোন বাড়ির জানালায় ফ্যাকাশে হলুদ বাতি জ্বলছে। অন্যগুলিতে রাতের জন্য শক্ত করে জানালা আটকান হচ্ছে যাতে ফাঁক গলিয়ে আলোর ছিটেফোঁটাও বাইরে না আসে। কিন্তু প্রখোরের বাড়ি? এই অন্ধকারে কী করে সে খুঁজে পাবে? আর পেলেও বুড়ি তো হাজার ডাকাডাকিতেও দরজা খুলবে না। রাস্তার উপর দুটি জানালা ছাড়া বাড়িটির আর কিছুই তার মনে নেই।

'রাতের জন্যে আমাদের ওখানেই চল। অনেকক্ষণ ধরে মজার মজার গল্প করা যাবে,' লেওপোল্ড বলল।

না, প্রখোরকে বাড়িটা খুঁজে পেতেই হবে। অন্যথা বুড়ি সকালেই ওই কেরানিটার কাছে ছুটে গিয়ে বলবে যে তার নির্বাসিত-ভাড়াটেটা পালিয়েছে। বাড়িটার আরও কিছু তাকে মনে করতেই হবে। দুটো জানালা। তক্তার চাল। কাঠের বেড়া। বেড়ার ওধারে উঁচু গাছ। একটাই গাছ — লম্বা, সরু, ফল ঝুলছে। ফলগুলিতে বরফের আঁচ লাগার জন্যই বুড়ি অপেক্ষা করছে... ওই তো বাড়িটি। বেড়া আর পেছনে গাছটা। বাড়ির দুটি জানালা। ফটকটা খোলা। হয়ত তারই জন্য।

বাড়িওয়ালীর কোন বাতি নেই। আলোর জন্য সে উনুনে খানিকটা আগুন জ্বালিয়ে রাখে। দেয়ালে ছায়া নাচছিল। কুঁজো পিঠ আর এলোমেলো মূর্তি সহ বুড়ির অস্থির ছায়াটাকে দেখাচ্ছিল ডাইনীর মতো।

সঙ্গে সঙ্গেই বকাঝকা শুরু হল:

'একটা দিন না যেতেই চরখী নাচন শুরু করে দিয়েছে! একে তো এমনটি ছুটোছুটি এক ঝক্কির ব্যাপার, তার উপর সঙ্গে আবার আরেকটি জুটিয়েছে। বাড়িতে মচ্ছব লাগাবে দেখছি। বুঝতে আর বাকি নেই, তুমি আমার জানটা কাবার করবে। না, আমার এখানে এসব চলবে না। অন্য জায়গা দেখ।'

প্রখোর বেঞ্চের নিচ থেকে বাক্সটা টেনে বের করল। বইটা খুঁজে পেয়ে সে লেওপোল্ডকে বলল:

'বাইরে চল। ওখানেই মাক্সিম গোর্কি তোমাকে দেব।'

তারপর বুড়ির দিকে ফিরে শান্ত গলায় বলল:

'দিদিমা, রাগ করো না, উঠোনে একটুক্ষণ থাকব। দেরি হবে না!'

বরফ পড়তে শুরু করল। সবে সেপ্টেম্বর। গাছেরা এখনো উদোম হয় নি। তবু আকাশের যেন বাঁধ ভেঙ্গেছে, আর ক্রমেই ঘন হয়ে বরফ পড়ছে — যেন নরম, ফুল্যান এক অন্তহীন পর্দা, মাটির উপর ধীরে ধীরে নামছে।

'শীত এসে গেছে,' লেওপোল্ড বলল। 'সাইবেরিয়ায় একবার বরফ পড়লে বসন্তের আগে আর গলে না।'

'বইটা নাও,' প্রখোর বলল, 'আমার ফেরা দরকার। শুনলে তো বুড়ির বকবকানি, নাকি শোন নি? নিজের বাড়ি চিনতে পারবে?'

'মাত্র তিনটে বাড়ির পর। ওই তো জানালার আলো দেখা যাচ্ছে। এরই মধ্যে পড়ে ফেলব। বলছিলাম কী প্রখোর, জান...'

'কী?'

'বলেছিলাম যে আমরা কিছুই লুকব না, তাই না?'

'হ্যাঁ!'

'জানি না কীভাবে বলব... আমার একটা গোপন কথা আছে। এ নিয়ে কিছু বলতে চাই না, কিন্তু... শুশেনস্কয়েতে উলিয়ানভদের ওখানে কি পাশার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?'

প্রখোর কোন কথা বলল না। অবিরাম বরফ পড়ছে। পর্দা নেমে এসেছে — নরম, ফুরফুরে। বরফের জন্য অন্ধকার ততটা নিরেট নয়।

'প্রখোর, পাশার সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি?'

'হয়েছে।'

তার আটকে যাওয়া গলা থেকে স্বর বেরুচ্ছিল না। লেওপোল্ডের কথা শেষ হওয়ার আগেই সে সবকিছু বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু লেওপোল্ড ওর গলা আটকে যাওয়া লক্ষ্য করে নি।

বরফে মাঠঘাট, বাড়ির ছাদ ঢেকে যাচ্ছে। প্রখোর লেওপোল্ডের কাঁধের দিকে তাকাল। ওখানে বরফের ছোটছোট মসৃণ ঢিপি।

'মানে তুমি বলছ, সে তোমাকে কথা দিয়েছে? তুমি ভাবছ সে পোল্যান্ড যাবে?'

'নিশ্চয়ই! সে স্পষ্ট করে তা বলে নি, কিন্তু ওর মনের কথা জানি। সে রাজি। এখানে সব সময়ই নির্বাসিত রাজনৈতিক কর্মীদের স্ত্রী আর বান্ধবীরা আসছেন। আমার মা বাবার কাছে এসেছেন আমাদের সব্বাইকে নিয়ে!'

'সে তো নির্বাসনের ব্যাপার। আর তোমরা ফিরছ দেশে। নির্বাসনে তো নয়।'

'কিন্তু আমি বিপ্লবী হতে যাচ্ছি।'

'আর তুমি ভাবছ সে তোমার জন্যে দেশ ছাড়বে?'

'সে আমাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে।'

কী অহঙ্কারেই না কথাটা সে বলল। মাথাটাও ঝাঁকাল। আর বলতেই হয় চমৎকারভাবে। তাহলে ব্যাপারটা হল: পাশা যাবে পোল্যান্ডে, তাকে বিয়ে করবে। চলে আসার আগের দিন রাতে পাশাকে চুমু খাওয়ার সময় সে কীভাবে সরে গিয়েছিল, সেটা মনে পড়ায় প্রখোরের দুঃখ হল।

'আমি চললাম। কিছুটা পড়ার চেষ্টা করব,' লেওপোল্ড বলল। 'দুঃখের ব্যাপার যে শুশেনস্কয়ের বদলে তোমাকে এখানে থাকতে হচ্ছে। বইটি শেষ হলেই তোমাকে লিখব। তোমার কোন প্রেমিকা আছে?'

'না, কেউ নেই।'

বাড়িওয়ালী তার জন্য অপেক্ষা করছিল। রাতের খাবারের জন্য এক বাটি ঠান্ডা ঝোল ছিল।

'এটা খাও। দেখ, খিদেয় চোখগুলো কীভাবে গর্তে ঢুকেছে। বাউন্ডুলে। ভাববার কথা, মদ গেলো নি তো? যাও, খেয়ে নাও... পেট ভরেছে? তাহলে এবার বিছানায়। বেঞ্চের ওপর তোমার বিছানা আছে। ঘুমোও এবার।'

প্রখোর শুয়ে পড়ল। চামড়ার কোট দিয়ে সে মাথা অবধি ঢাকল। কোটের নিচে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, দারুণ চাপ পড়ে।

'বন্ধুত্বের শপথ নেওয়ার সময় আমি ওটা লুকিয়ে রেখেছিলাম! ভীরু! আমি নিজেকে সাহসী ভাবি। আসলে আমি হলাম ভীরু। সাহসী যে-কেউ সোজা বলে দিত: তুমি পোল্যান্ড যাচ্ছ, যাও। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি ওকে আমি ভালবাসি...'

* * *

অন্ধকার থাকতেই তাকে ঘুম থেকে জাগান হল। সকাল সকাল জাগা — প্রখোরের বাড়িওয়ালী বুড়ি স্তেপানিদার এটাই নিয়ম। সূর্য ওঠা নাগাদ প্রখোর গোরুর জন্য অনেক বালতি জল এনেছে, ওদের জাব দিয়েছে। গোয়ালে নতুন খড় বিছিয়েছে। বরফে রোদের আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পালে পালে চড়ুই রয়ান গাছে জড়ো হয়ে ফল ঠোকরাতে লাগল।

সকালের খাবার এল। বুড়ো উনুনের উপরের বিছানা থেকে নেমে এসে খেতে বসল। টার্কি মোরগের মতো তার গলার চামড়া ফালি-ফালি ঝুলছিল। নিষ্প্রভ চোখে জলভরা। সে দারুণ আগ্রহে চামচ দিয়ে আলু আর দুধ খাচ্ছিল, দম আটকে যাবার মতো প্যানকেক গিলছিল। সব সময় তার মাথা নড়ছিল। বুড়ো প্রখোরকে দেখলই না।

'বয়স পাঁচ কুড়ি,' বুড়ি স্তেপানিদা প্রখোরকে বলল। 'ঈশ্বর কেবল একশ' বছরের জন্যেই ওকে বুদ্ধিশুদ্ধি দিয়েছিলেন, তাই এখন ওর মাথা একেবারে খালি।'

খাওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন এল। গোলাপী গাল এক তরুণী — শহুরে মহিলাদের মতো লোমের কোট আর মাথায় সাদা পশমী শাল। দোরগোড়ায় তিনি মাটিতে পা ঠুকলেন আর গাছের একটা সরু ডাল দিয়ে ফেল্টের জুতো থেকে বরফ ঝাড়লেন।

'কমরেড প্রখোর, আমি আপনাকে নিতে এসেছি,' সে বলল।

ভুরু কুঁচকে বুড়ি স্তেপানিদা টেবিল পরিষ্কার করতে লাগল, কাঠের চামচগুলি ছুড়ে ফেলতে শব্দে তার রাগের ভাবটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'আমার নাম ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না সিল্‌ভিনা,' মহিলাটি বললেন। 'খুব ভোরে লেওপোল্ড প্রমিন্‌স্কি আর তার বাবা শুশেনস্কয়ে চলে গেছে। লেওপোল্ড আপনাকে তার শ্রদ্ধা আর মাক্সিম গোর্কির জন্যে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছে। এবার আমার সঙ্গে আসুন।'

বুড়ি স্তেপানিদা মুখ কালো করে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকল। সকালটি চমৎকার। রোদ-ঝলমল আকাশ গাঢ় নীল। ইতিমধ্যেই শীতের আঁচ-লাগা।

'আমরা নির্বাসিতরা সবাই পরস্পরের বন্ধু,' বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না বললেন। 'ভাগ্যের দয়ার উপর আমরা আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি না। আপনি এখানে নতুন। আপনি অল্পবয়সী। আপনাকে দেখাশোনা করতে লেওপোল্ড আমাদের বলে গেছে। এবার বলুন, আপনার পরিকল্পনা কী?'

তার আর কী পরিকল্পনা থাকা সম্ভব?

'অবশ্য, আমি জানি, নিশ্চয়ই খামকা সময় নষ্ট করতে চান না তো? কেবল টিকে থাকতে? আমরা ঠিক করেছি যে আপনার মতো তরুণ শ্রমিকের প্রথমেই যা উচিত তা হল পড়াশুনা। আমাদের মতে...'

একটু পরেই তাঁরা ডাক্তার আর্‌কানভের বাড়ি পৌঁছলেন। বাইরে থেকে দেখতে গাঁয়ের বাড়ির মতো দেখালেও ভেতরটা ছিল আলাদা: শহরের বাড়ির মতো অনেকগুলি ছোট ছোট কোঠা, চমৎকার সাজান-গুছান। একটি ঘরে ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না প্রখোরকে নিয়ে এলেন। ওখানে ছিল খাবার একটি গোল টেবিল, বেতের চেয়ার, বইয়ের আলমারি, সাদা পোর্সেলিনের ঢাকনিওয়ালা একটি বাতি।

প্রখোরকে আর্‌কানভের ছেলের পাশে বসতে বলা হল। তেরো বছর বয়সী হাসিখুশি ছেলেটা। শিক্ষিকা একটু চোখ ফেরাতেই টেবিলের তলা থেকে সচিত্র 'বিশ্বপরিক্রমা' পত্রিকা বার করে নিবিষ্ট মনে তার ছবিগুলি দেখতে থাকে। ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না প্রখোরকে বললেন:

'মিথ্যে লজ্জার মতো বাজে ব্যাপারটা ভুলে যাওয়াই আমাদের জন্যে ভাল। বয়সটা তো কিছুই নয়। এবার বলুন তো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কে কী জানেন? সুইজারল্যাণ্ডের আবহাওয়া কেমন? রব্‌স্পিয়ার কে ছিলেন? জার্মান ভাষায় বলতে পারেন: মানুষের মঙ্গলের জন্যে বুদ্ধি সহকারে, সক্রিয়ভাবে আমি আজীবন কাজ করব। পারেন না? অনেক পড়াশোনা দরকার। আসুন, এবার শুরু করা যাক।'

নির্বাসিতদের সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের বিস্ময়ের ভাবটা বরাবরই অটুট ছিল। ওদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, মনকষাকষির কোন ঘটনা আজও ঘটে নি। নতুন কেউ আসা মাত্রই পুরনোরা তাকে লুফে নেয়, তার ওপর অভিভাবকত্ব ফলায়।

ডাক্তারের ছেলের কাছে লজ্জিত হওয়ার কোন ইচ্ছা প্রখোরের ছিল না। অর্থাৎ, এজন্য তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন দিয়ে পড়তে হবে। সে দেখল, ডাক্তার আর নির্বাসিতদের কাছ থেকে চাওয়া মাত্রই বই পাওয়া যায়। কিন্তু তার তো আরও কাজ আছে: বাড়িওয়ালীর গোরুগুলিকে জল আর জাব দেয়া, গোয়াল পরিষ্কার, উনুনের লাকড়ি কাটা, উঠোনের বরফ সরান... এইসব।

তাছাড়া আরও একটি কাজ তার জুটেছিল। প্রথমে অনিচ্ছার সঙ্গে, দায়সারার মতো করলেও শেষে ওটা তার ভালই লাগছিল। কাজটা ছিল: ডাক্তারের নির্দেশে

ভানেয়েভের স্ত্রীকে নিয়ে রোজ বেড়াতে যাওয়া। মহিলাটি কোমর পর্যন্ত কালো শালে ঢেকে, কষ্ট সহকারে পা টিপে টিপে খুব সতর্ক হয়ে হাঁটেন। এজন্য গাঁয়ের লোকজন, ছেলে-বুড়ো, বিশেষত মেয়েরা তাকে টিটকারি দিত। দমিনিকা ভাসিলিয়েভ্‌নাকে নিয়ে পথে বেরুলেই মেয়েরা জানালায় ভিড় জমাত। দমিনিকাকে রোজই অনেকটা পথ হাঁটতে হত। সে তাঁকে নিয়ে গাঁয়ের বাইরে যেত। প্রখোর ততদিনে সেই কেরানির হুকুম অক্ষরে অক্ষরে না মেনে চলার মতো সাহসী হয়ে উঠেছিল। 'দেখ দেখ, দুজন কেমন চলেছে,' মেয়েরা চাপাহাসি হাসে। 'সময় তো ঘনিয়ে এসেছে। এখন ওঁর উচিত ছিল সেলাই নিয়ে বসা। না, উনি আরেক জনের বগলদাবা হয়ে হাওয়া খাচ্ছেন। আর ওই ছেলেটার আক্কেলও বলিহারি। ন'মাসের এক গর্ভবতীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি। লাজলজ্জার মাথা খেয়েছে। এরপর আমাদের মেয়েগুলো তো ওই খেপাটার দিকে ফিরেও তাকাবে না।'

ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়ের নির্বাসিতরা মুহূর্তের জন্যও ভানেয়েভের বিধবাকে ত্যাগ করে নি। কেউ-না-কেউ সর্বক্ষণই তাঁর সঙ্গে থাকে। দুই ওল্‌গা — লেপেশিন্‌স্কায়া আর সিল্‌ভিনা আসন্ন বাচ্চাটির জন্য ছোট জামা ও টুকিটাকি সেলাই করেন, একসঙ্গে কাঁদেন।

কিন্তু অদ্ভুত হলেও সত্যি যে দমিনিকা প্রখোরের সঙ্গেই থাকতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। প্রখোর ভানেয়েভের সম্পর্কে ততটা জানত না। দমিনিকার বন্ধুরা তাঁকে বিব্রত না করার জন্য প্রসঙ্গটা এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু দমিনিকা তা চাইতেন না। আনাতোলি সম্পর্কে কথা বলার তাঁর দারুণ ইচ্ছা হত। তাঁদের মিলিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত — এত সুখী, অথচ কী ক্ষণস্থায়ী, কী যন্ত্রণাময়।

'বলে যান, প্রখোর আর্তেমভিচ, আরও জিজ্ঞেস করুন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হওয়ার কথা জিজ্ঞেস করুন। শুনুন কীভাবে ওটা ঘটল: জেলে আমি ওঁর বান্ধবী সেজে এসেছিলাম। আমাদের কমরেডরাই ব্যবস্থাটা করেন। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এক ভদ্রলোক বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ান। কেমন দেখতে, চেহারা ভাল কি না — কিছুই আর মনে নেই। শুধু তাঁর আশ্চর্য, উদার চাহনিটাই আজও ভুলি নি। আর প্রথম দেখাতেই আমি তাঁর প্রেমে পড়লাম।'

'তাহলে প্রথম দেখার প্রেম হতে পারে? আপনার বিশ্বাস আছে?' পাশার কথা ভেবে প্রখোর জিজ্ঞেস করল।

'কেবল প্রথম দেখাতেই! পরে আগুন নিবে যায়, কিংবা জ্বলে ওঠে। ওহ্‌, হ্যাঁ, অবশ্যই জ্বলে ওঠে... সে ছিল স্বপ্নচারী। সত্যিকার সকল বিপ্লবীই একইসঙ্গে বাস্তববাদী আর স্বপ্নচারী। আর জানেন প্রখোর আর্তেমভিচ, বন্ধুত্বের অর্থ ওর কাছে কী ছিল? ছেলেবেলা থেকেই বন্ধুত্ব সম্পর্কে বড় কিছু একটা ওর মনে ছিল। ওটা সে খুবই পবিত্র ভাবত... আর জানেন, ও কেন আমাকে নিকা বলতে ভালবাসত?

নাইক হলেন ডানাওয়ালা দেবী, বিজয়িনী। শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও ভাবত, সে মারা যাবে না। মৃত্যুর ভাবনাকে সে তাড়িয়ে দিত। কেবলই বলত: 'শোন, আমার ডানাওয়ালা দেবী, শোন, জয় আমাদের হবেই! নতুন এক সমাজে, করুণা আর জ্ঞানের এক সমাজে আমরা বাস করব। সকলেই হবে সৎ, দিলখোলা। এই সমাজে কোন বেইমান থাকবে না।' এই সমাজটা দেখার বড় ইচ্ছে হয়! প্রখোর আর্তেমভিচ, এটা আপনি বিশ্বাস করেন? ও করত। সে ভাবত আমাকে নিয়ে একদিন প্যারিসে যাবে, লুভ্‌র মিউজিয়ামে ডানাওয়ালা দেবী — সামথ্রেস নিকে'কে দেখবে। জানেন, ওটা কী? শ্বেতপাথরের মূর্তি, খুব পুরনো। ইজিয়ান সাগরের সামথ্রেস দ্বীপে পাওয়া। এই তো নিকে। ওর মাথা ছিল না। তবু ঠিকই সুন্দর ছিল। তার শরীর, কাঁধ, বুক ডানা — সবকিছুতেই এগিয়ে যাওয়ার, কেবলই এগিয়ে যাওয়ার উচ্ছ্রিত বাসনা! সে তো বিজয়ের প্রতীক। মঙ্গলের, কেবল মঙ্গলের বিজয়ের। বুঝলেন?'

গাঁয়ের রাস্তায় ধীরে, হুঁশিয়ার হয়ে তিনি পা ফেলেন। জানালা থেকে মেয়েরা তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে।

দমিনিকা নীরব হলেই প্রখোরের মন চলে যায় পাশার কাছে। লেওপোল্ডের সঙ্গে নিজের বন্ধুত্ব নিয়ে সে ভাবে। তার কী করা উচিত? এমন সংকটে একজন মার্কসবাদী, একজন বিপ্লবী কী করে? সে লেওপোল্ডের বন্ধুত্ব চায়। কিন্তু এর অর্থ কি, পাশাকে অস্বীকার?

'এখনো আমার কোন টেলিগ্রাম এল না,' দমিনিকা বললেন। 'একটা টেলিগ্রামও না।'

প্রতিদিন সকালে দমিনিকা প্রথমেই টেলিগ্রামের কথা জিজ্ঞেস করেন। এবং এটির ভাষাও তাঁর জানা: 'প্রিয় মেয়ে আমাদের, আমরা তোমার সমব্যথী, তোমার অভাব বোধ করছি, আর আমরা চাই বাচ্চা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি ফিরে এসো। আমরা তুমি ও আমাদের প্রিয় নাতির আসার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছি! বাবা মা।'

দিনের পর দিন গড়াল। টেলিগ্রামটি এল না।

'আমি বাড়ি ফিরি, ওরা তা চায় না। তারা বাড়ি থেকে আমাকে বিদায় দিয়েছে।'

'আমাকেও বাড়ি থেকে বিদায় করা হয়েছে,' প্রখোর বলল।

'প্রখোর আর্তেমভিচ, আপনি হলেন পুরুষ মানুষ। আপনি তো আর সন্তান প্রসব করতে যাচ্ছেন না।'

'ভয় পাবেন না আপনি যে মা হতে যাচ্ছেন। তাই খুশি থাকুন। সেটা আপনার ভাগ্য, বুঝতেই পারছেন?'

'ঠিক কথা। কোন ভুল নেই। আমি খুশি। প্রখোর, ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার পিতৃপদবিটা বাদ দিলে কেমন হয়? ভানেয়েভ ছেলে চেয়েছিল। আমিও। আর মেয়ে হলেও কিছু আসে-যায় না। সে মেয়েকেও এমনি ভালবাসত... আপনি এমন

চমৎকার সব কথা বলেন। ধন্যবাদ আপনাকে, প্রখোর। আপনি আমার আপন ভাইয়ের মতো...'

রোজকার মতো একদিন বেড়ানোর সময় দমিনিকা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। এমন কিছু একটা ভয় আঁচ করলেন যা কেবল তিনিই বুঝতে পারেন। তাঁর মুখে সবুজের একটা আভা ছড়িয়ে পড়ল। চোখগুলি ঠিকরে বেরিয়ে আসতে লাগল, নিথর হয়ে গেল।

'বাড়িতে, জলদি,' কোনক্রমে ফিসফিস করে বললেন। অন্ধের মতো হাত বাড়িয়ে তিনি এলোপাতাড়ি কাছের বেড়ার দিকে এগুতে লাগলেন। এবং যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে বেড়ার গায়ে পড়ে গেলেন।

'জলদি ওল্‌গা বরিসভ্‌নাকে ডাকুন! লেপেশিন্‌স্কায়া! জলদি, প্রখোর, জলদি! তিনি তাঁর কালো শালের কিনার মোড়াতে লাগলেন। হাঁ করে ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে লাগলেন।

ভয়ে প্রখোরের মাথা বিগড়ে গেল। কী করা যায় এখন? সাহায্যের জন্য চেঁচানো? ভাল মানুষ, ভাইয়েরা, বাঁচান!

গাঁয়ের বউরা যখন দেখল বিধবাটি বেড়ার গায়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন তখন তারা কাঁধের উপর কোট ফেলে তাঁর কাছে ছুটে গেল, হাত ধরে তাঁকে বাড়িতে এনে তুলল।

'হাসপাতালে ওল্‌গা বরিসভ্‌নার কাছে দৌড়ে যাও। জবুথবুর মতো ওখানে দাঁড়িয়ে থেকো না!' মেয়েরা প্রখোরকে ধমক দিল।

সে হাসপাতালে ছুটে গেল।

'ওল্‌গা বরিসভ্‌না! ওল্‌গা বরিসভ্‌না!'

'ভয়ের কী আছে?' তিনি তাকে থামিয়ে দিলেন। 'সবকিছুই স্বাভাবিক। এমনটাই হয়।'

তবু প্রখোরের সমান তালে তিনিও ভানেয়েভের বাড়ির দিকে ছুটলেন আর উত্তেজনায় বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন:

'সময়মতো পেঁছুতে পারলে হয়! ঈশ্বর, জানি না ওখানে কী হচ্ছে!'

ওখানে পেঁছে দেখলেন সামোভারে জল ফুটছে। শোবার ঘরে দমিনিকা কাতরাচ্ছেন। আর অদ্ভুত এক মহিলা গুনগুন করে বলছেন:

'চেঁচাতে লজ্জা কর না, ভাই, চেঁচাও যতটা পার। ভাল হবে।'

চিরকালের মতো উদ্যমী আর নিপুণা ওল্‌গা বরিসভ্‌না হাত ধুলেন, সাদা পোশাক পরলেন, মাথায় সাদা একটা রুমাল বাঁধলেন, শেষে সবাইকে ঘর থেকে বের করে দিলেন।

সেই দিনে জন্মাল খুদে তোল্‌।

॥ ২০ ॥
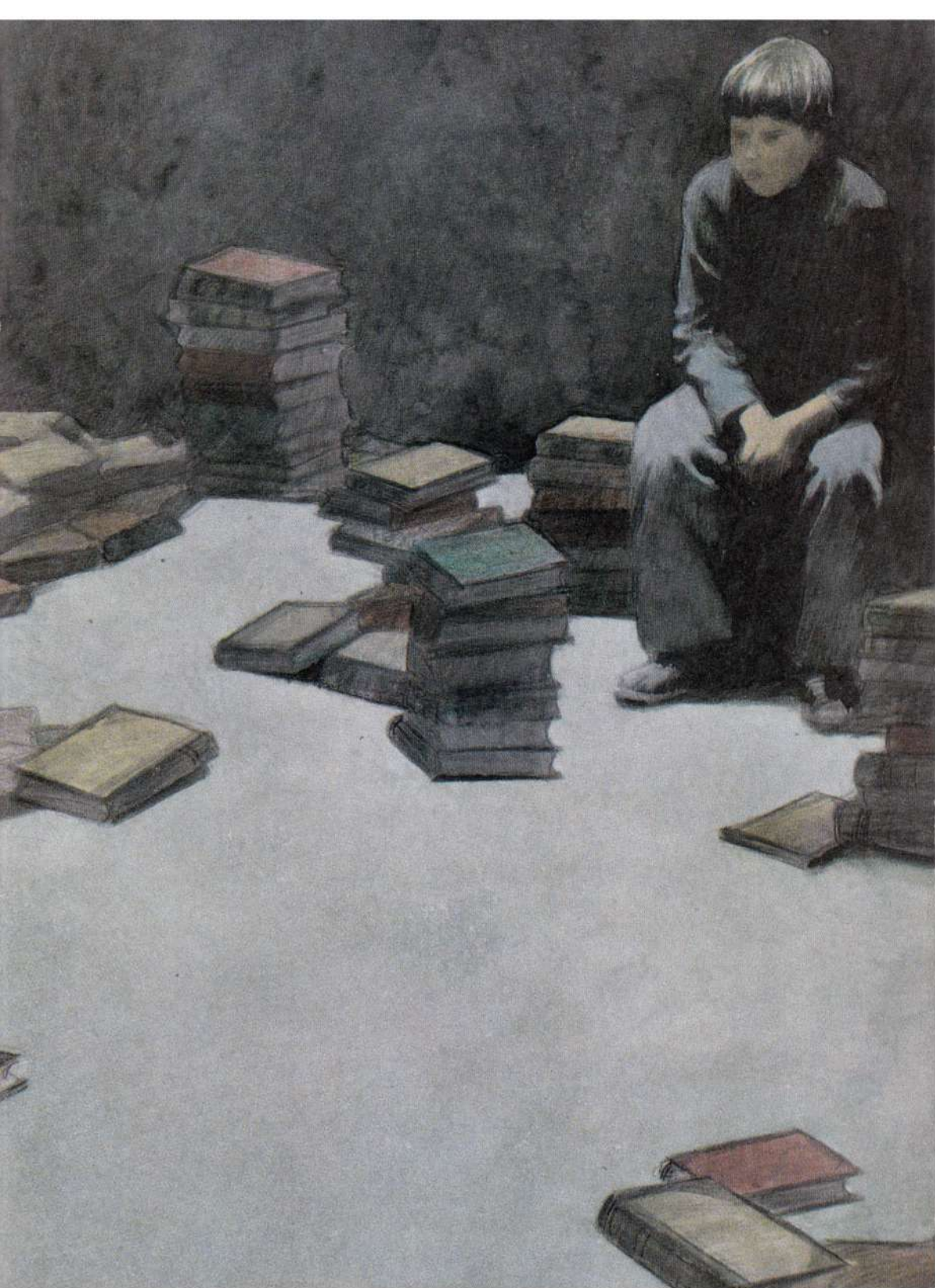
ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়েতে রাতে প্রচণ্ড ঝড় এল। বাতাসের উন্মত্ত দাপটে দরজা-জানালা বাড়িঘর ককিয়ে উঠছিল। বাইরে তখন নারকীয় তোলপাড়: ফটক ভাঙছে, কুয়োর উপরকার কাঠামো বাতাসে তড়পাচ্ছে, রয়ান গাছের জমে যাওয়া চালগুলি বেড়ার উপর আছড়ে পড়ছে, এখানে-ওখানে বরফের ঝাপটা আসছে, চিমনিতে বাতাসের শো-শো আওয়াজ। 'ঈশ্বর, কোথায় আমি!' হতাশ প্রখোর ভাবল। 'সাইবেরিয়ায়। এই সাইবেরিয়ায় তিন বছর নির্বাসন। সত্যি? চিমনির কী অদ্ভুত আওয়াজ — যেন বাইরে এক দঙ্গল নেকড়ে খেপেছে!'

বেঞ্চে শুয়ে বুড়োর ভেড়ার চামড়ার কোটের নিচে প্রখোর ঘুমিয়েছিল। ঝড় তাকে জাগিয়ে দিল। চোখ খুলে সে ঠায় শুয়ে থাকল। প্রখোর কোথাও টুক-টুক আওয়াজ শুনল — ভানেয়েভের কফিনে পেরেক ঠোকার মতো শব্দ... দুঃখের রাত বেড়েই চলল, যেন অন্তহীন। জানালার ঢাকনাটা অবিরাম আছাড় খাচ্ছে।

আলো ফুটতেই স্তেপানিদা বুড়ি দীর্ঘশ্বাস ফেলে লেলে গোঙাতে লাগল। উনুনের উপরকার বিছানা থেকে পা নামিয়ে সে পিঠ চুলকোতে শুরু করল।

'প্রভু, আমাদের পাপ ক্ষমা কর (হাই)। ওরে বেটা, ওঠ্ রে (দীর্ঘ হাই)। শুনছ, জানালার ঢাকনা যে ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে। মনে হয়, বরফের ঢিপির জন্যে সামনের ফটকটাও খোলা যাবে না।'

সারা রাত তাণ্ডব চালিয়ে বরফের ঢিপিতে ফটক আটকে, রাস্তার নিশানা মুছে দিয়ে, ডোবাগুলি ঢেকে দিয়ে, জানালার কাছে হরেক রকমের ফুলের নকশা সেঁটে দিয়ে শেষে ঝড় বিদায় নিয়েছে। গাঁয়ের উপরের আকাশ এখন উঁচু, নির্মল। যেন বৃষ্টি-ধোয়া, রক্তিম সূর্য দিগন্তে উঁকি দিল। বরফে উচ্ছল উজ্জ্বলতা চকিত হল। অদৃশ্য হল রাতের তাণ্ডবের শেষ রেশটুকু। দিন শুরু। নানা কাজে বোঝাই একটি দিন: ফটক খুঁড়ে বের করা দরকার। জানালার ঢাকনা আটকাতে হবে কব্জায়। উঠোনের বরফ পরিষ্কার করতে হবে। এগুলির পরই শুধু সকালের খাওয়া: একবাটি গরম ঝোল: দুধে সেদ্ধ বীট কিংবা আলু, বাড়ির তৈরি পিঠে। স্তেপানিদা প্রায়ই একসঙ্গে ত্রিশটির মতো পিঠে বানিয়ে জমে যাওয়ার জন্য বাইরে খুঁটিতে ঝুলিয়ে রাখে। ঠিক খাবারের আগেভাগে সে প্রয়োজনমতো ওই পিঠেগুলি কয়েক মিনিটের জন্য গরম উনুনে চড়ায়, ফুলে উঠে সেগুলিতে সুন্দর সর পড়ে। এর চেয়ে ভাল কিছু প্রখোর পিটার্সবুর্গে মুখে দিতে পারে নি।

সকালের খাবার পর্ব শেষ। এবার প্রখোরের 'স্কুল'। ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌না খুব কড়া শিক্ষিকা। তাঁর কাছ থেকে প্রখোর সামান্যও প্রশ্রয় পায় না। স্কুলের যাবতীয় পাঠ্যের মধ্য দিয়ে তিনি তাকে নির্মমভাবে তাড়িয়ে নিয়ে চলেন।

তাঁর স্বামী কোন কোন সময় প্রখোর আর ডাক্তারের ছেলেটাকে বক্তৃতা শোনাতে আসেন। এগুলি সাধারণ পাঠের মতো নয়। অচিরেই মিখাইল আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর বিষয় নিয়ে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তিনি লাফালাফি করেন, চুল এলোমেলো করে ফেলেন, ঘরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে দৌড়ন, পা ফাঁক করে চেয়ারে বসেন, তারপরই আবার ছুটোছুটি শুরু করে দেন।

'পাঠ্যসূচী অনুসারে আমাদের আজকের বক্তব্য হল...'

কিন্তু পনেরো মিনিটের মধ্যেই তিনি পাঠ্যসূচী পুরোপুরি ভুলে যান। তিনি হয়ত মহান পিটার সম্পর্কে, সুইডেনের দ্বাদশ চার্লস সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন কিম্বা পল্‌তাভার যুদ্ধ নিয়ে পুশকিনের কবিতার কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করলেন। তারপরই হঠাৎ একেবারে অন্যকিছু বলতে শুরু করেন আর বিমুগ্ধ শ্রোতারা তখন খেই হারিয়ে ফেলে এই মোড়বদল ব্যাপারটা ধরতেই পারে না। এবারকার ঘটনাস্থল প্যারিস। বিশাল শহর। ছোট ছোট রাস্তা, রঙবেরঙের সাজসজ্জা। স্কোয়ারে চলমান বড় বড় জাহাজের মতো বাড়ি। ক্যাথলিক চার্চ — উঁচু, কারুময় মিনার। ঘণ্টা থেমে গেছে। ভয়ে কুঁকড়ে-যাওয়া প্রাসাদগুলির সবকটি দরজায় শক্ত তালা। লাল কাপড় গরীবদের বাড়ির জানালায় ঝাপট মারছে। রাস্তায় জনতার ভিড়। চাকার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ। ঘোড়ার চিঁহিঁহিঁ। রাইফেলের আওয়াজ। কামানের গোলার প্রচণ্ড শব্দে জানালার কাচ ভাঙছে। প্যারিসের উপর বারুদের ধোঁয়ার কটুগন্ধী মেঘ। মহান ফরাসী বিপ্লব। জনগণ হাজার বছরের রাজকীয় শাসন উপড়ে ফেলছে। ফ্রান্সের শেষ রাজাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার জন্য তড়িঘড়ি বধ্যভূমি তৈরির আয়োজন চলছে লুভ্‌র প্রাসাদের সামনে পঞ্চদশ লুই চকে...

তারপর শতাব্দী পেরিয়ে গেল। দৃশ্য ও ভাবানুষঙ্গ বদলেছে। প্যারিসের পেরে লাইসে কবরখানা। দীর্ঘ, জনহীন পথের দুধারে স্মৃতিমিনার। ধূসর পাথর। স্তব্ধ, হতাশ। মৃতের শহর ধূসর পাথরে বোঝাই। কবরখানার নিচে পুরনো গাছের ছায়াঢাকা আরেকটি দেয়াল, রৌদ্রহীন, গাঢ় সবুজ। এটি কমিউনারদের দেয়াল। প্যারি কমিউনের শেষ রক্ষকদের এর সামনেই গুলি করা হয়। রাজা আর নেই। পুঁজিই এখন ক্ষমতায়। কমিউনিস্টরা খতম।

কিন্তু ডাক্তারের বাড়ি থেকে একসঙ্গে বেরনোর পরই কেবল কিছু কিছু জিনিস সিল্‌ভিন একা প্রখোরকে বলেন। শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির দিশারী 'সংগ্রামী লীগের' কথা তিনি তাকে শোনান, বছর পাঁচেক বেশি বয়স হলে প্রখোরও হয়ত এর সদস্য হতে পারত। পিটার্সবুর্গের গুপ্তচক্রের সদস্য! কী আশ্চর্য ভাবনা! নিজেদের সভাসমিতি অনুষ্ঠানের কায়দা-কানুনগুলি বলতে সিল্‌ভিন ভালবাসতেন। সম্ভাব্য পুলিশী হামলা আঁচ করার জন্য বাইরে তাঁরা পাহারাদার রাখতেন: সিল্‌ভিনের

মুখে গুপ্তচক্র এবং তার সদস্যদের দুঃসাহসী কাহিনী শুনে প্রখোর রোমাঞ্চিত হয়।

এগুলিরই একটি গল্প।

সিল্ ভিনের মতে চক্রীদের সেরা ছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ। এক সন্ধ্যায় তিনি শ্রমিকচক্রের একটি বৈঠকে চলেছেন। গন্তব্যে পৌঁছনোর অনেক আগেই নেমেছেন ঘোড়ার ট্রাম থেকে। তাঁর চোখে পড়ল একটি লোক: মাথায় খাটো কানাতের টুপি, চোখে কালো চশমা। লোকটি তাঁর পিছনে চলছে। ওর বেপরোয়া চলার ধরনেই সবকিছু স্পষ্ট। ঠান্ডা আর বাতাস ছিল খুবই বেখাপ্পা। প্রথমে যে-গলিটা পড়ল সেটাই ভ্লাদিমির ইলিচ ধরলেন। লোকটাও পিছু নিল। সন্দেহ নেই, লোকটা গোয়েন্দা। ভ্লাদিমির ইলিচ ওভারকোটের কলারটা তুলে দিলেন, টুপিটা টেনে নামালেন এবং দ্রুত, স্বচ্ছন্দ গতিতে চলতে লাগলেন। তিনি আবার একটি গলিতে ঢুকলেন। লোকটাও চলল। ব্যাপারটা খারাপের দিকেই মোড় নিচ্ছে, ভ্লাদিমির ইলিচ ভাবলেন। সংযত, স্বচ্ছন্দ গতিতে চলমান এই তরুণকে দেখে কারও বোঝার উপায় ছিল না যে তিনি পুলিশের এক গোয়েন্দাকে এড়ানোর জন্য প্রাণান্ত করছেন। আচমকা তিনি আরেকবার একটি গলিতে ঢুকে গেলেন। অপ্রস্তুত গোয়েন্দাটি ছুটে এল। এই গলিতে চমৎকার ফটকওয়ালা একটি প্রাসাদ তাঁর চোখে পড়ল। দারোয়ানের চেয়ারটা খালি যে! কী সৌভাগ্য! ভ্লাদিমির ইলিচ সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারে বসে পাশের টেবিল থেকে খবরের কাগজটি তুলে নিয়ে তার পেছনে মুখ লুকালেন। ঠিক সময়ও বটে। গোয়েন্দাটা প্রাসাদটা পেরিয়ে আবার রাস্তায় ফিরে গেল। দারোয়ানের চেয়ার থেকে ভ্লাদিমির ইলিচ পাগলের মতো তার ছুটাছুটি দেখতে লাগলেন। ওর মুখটা তখন রাগে বাঁকা হয়ে গেছে। আঙুলের ফাঁক গলিয়ে এমন একটা শিকার চলে যাওয়া! রাগের কথা বৈকি!

'তাহলে গোয়েন্দা আর তাঁকে ধরতে পারল না।

'নিশ্চয়ই না।'

'কিন্তু তিনি নির্বাসিত হলেন কীভাবে!'

'সেটা পরের ঘটনা।'

প্রখোর সিল্ ভিনের সঙ্গে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত গেল। ফেরার পথে শোনা কাহিনীটাকে সে নিজের খুঁটিনাটিগুলি সহ পুনরুজ্জীবিত করল। তার কল্পনা উদ্দাম হয়ে উঠল, নতুন পরিস্থিতি তৈরি করল। ধীরে ধীরে এর প্রধান চরিত্র হল সে, প্রখোর। এইসব মারাত্মক ও দুঃসাহসী ঘটনা তার জীবনে ঘটে গেল, প্রখোরের...

এইসব কল্পনায় মন আবিষ্ট থাকলেও পাদুটি তাকে অভ্যাসবশে ভানেয়েভদের ওখানেই পৌঁছে দিল। ওখানেই সে প্রতিদিন যেত। যে-বড় ঘরটায় আগে সতের জন সোশ্যাল-ডেমোক্রাট সভা বসিয়েছিলেন, সেটা এখন খুদে তোলের থাকার ঘর। তোয়ালে, সরু সরু জামা, দুধ খাওয়ানোর বোতল, ওষুধের শিশি, মলমের কৌটো,

বাচ্চাদের পাউডারের টিন ইত্যাকার জিনিসপত্রের স্তূপ, সম্ভাব্য সর্বত্র ছড়ানো — টেবিলে, টুলে, জানালার তাকে। পা টিপে টিপে প্রখোর বাচ্চার ঘরে ঢুকল। তার বিছানাটা সাদা কিছু দিয়ে মোড়া, খুব পরিচ্ছন্ন।

প্রখোরকে দেখলে দমিনিকা বরাবরই খুশি হন।

'দেখ, কে আমাদের কাছে এসেছে,' তিনি যেন বাচ্চার উদ্দেশ্যেই বললেন। 'আমাদের কাকামণি, প্রখোর। ওরকম পা ফেলো না প্রখোর, বাচ্চাটাকে জাগিয়ে দেবে। জান, ও হাসতে শুরু করেছে! বিশ্বাস হচ্ছে না? সত্যি বলছি, ঘুমের মধ্যে। শপথ করে বলছি, সত্যি হাসে। দেখ না! ভুরু গজাচ্ছে। ওর বাবার মতোই কালো ভুরু হবে। ঠোঁটগুলো কী মিষ্টি, তাই না? খুদে তোল্, ঘুমো বাছা, সোনামণি।'

ভাল করে দেখার জন্য প্রখোর বাচ্চার খাটের উপর ঝুঁকে পড়ল। উইলো গাছের ডালপালা থেকে তৈরি খাটটি। লেপেশিন্স্কিদের মেয়ের পর পেয়েছে খুদে তোল্। ওর ছোট লাল মুখটা এত কোঁচকান, নাকটা তো বোতামের মতো, বেচারি। অসম্ভব দুঃখে প্রখোরের কান্না পাচ্ছিল। সে খুব কষ্টে চোখের জল আটকাল।

'চমৎকার মিষ্টি, তাই না?' চোখ নামিয়ে দমিনিকা ফিস্‌ফিস্ করে বললেন। তাঁর মুখটা মমতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

প্রখোর এদের সাহায্য করার চেষ্টা করছিল। বিষণ্ণ স্বরে দমিনিকা যখন তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন তখনই সে হেঁড়ে গলায় হঠাৎ বলে উঠল: 'আমাকে ধন্যবাদ জানানোর কী হল!' তারপর কুয়ো থেকে আরও জল আনল, সামোভার ধরাল, আলু আনতে ভাঁড়ারে গেল।

দমিনিকার কাছে প্রখোর প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল কেবল কাজকর্মে সাহায্যের জন্য নয়, ভানেয়েভ সম্পর্কে আগে যেমন অবিরাম বলে যেত, এখন তেমনি তার কাছে উজাড় করে দেন নিজের এখনকার দুশ্চিন্তা আর দুঃখের কাহিনী। এখন তিনি কী করবেন? মা-বাবার কাছ থেকে কোন টেলিগ্রাম এল না।

'দুনিয়ায় ভাল লোকও আছে, দমিনিকা ভাসিলিয়েভ্না।'

'ঠিক কথা। কোন ভুল নেই। তুমি সত্যিকার সাধুসন্ত, প্রখোর। এক সময় নিশ্চয়ই কোন পথ খুঁজে পাব। যেভাবেই হোক। তোর থুতনিটা একটু তোল তোল্। মিষ্টি, সোনা আমার, মাথাটাও এখনো তুলতে পারিস না। আমরা দিশেহারা হব না। তাই না, তোল্? তোর বাবার কথা বলব তোকে? সে খুব কাজের। খুব বড় সুখের স্বপ্ন দেখত। আপশোস, বাঁচল না বেশিদিন। তোকে দেখার বড় আশা ছিল তার!'

কথাগুলি তিনি বলছিলেন বাচ্চার খাটের উপর ঝুঁকে, পাশগুলি ধরে, যেমন পাখি তার ছানাকে ডানা দিয়ে আড়াল করে রাখে।

একদিন সন্ধ্যায় প্রখোর রাতের খাবারের আয়োজনে উনুনের সামনে বসে আলুর

খোসা ছড়াতে ছড়াতে দমিনিকার নৈমিত্তিক বিলাপ শুনছিল। হঠাৎ তার কানে এল বাড়িওয়ালীর গলা। ব্যস্তসমস্ত হয়ে কাকে যেন সে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলছে:

'আসুন, আসুন! কোটটা ছাড়ুন। নিশ্চয়ই এত দূরের পথ ঝড়-বাদলায় এই রাতের বেলায় পাড়ি দিতে আপনার খুব কষ্ট হয়েছে। অভ্যেস না থাকলে বরফের এসব ঢিপি পেরনোর ধকলে মারা যাওয়ার অবস্থা হয়। আর দেখছেন তো, এখানে তারা, আপনার অনাথ...'

'কে সে?' দমিনিকার মুখ মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

প্রখোর জানালার কাছে ছুটে গেল। দুই-ঘোড়ার ছইওয়ালা একটি স্লেজ ফটকের মুখে দাঁড়ানো। গাড়োয়ান লটবহর নামাচ্ছে। বছর পঞ্চাশ বয়সী এক মহিলা স্লেজ থেকে নেমে সিঁড়িতে উঠছেন: ছোটখাটো, শুকনো শরীর, ঠাণ্ডায় গালগুলি টকটকে লাল, চোখদুটি বসে গেছে। তিনি ঘরের দরজায় পেঁছিলেন ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে হাতদুটি গলার কাছে আড়াআড়ি করে চেপে ধরলেন। দমিনিকা আর্ত চিৎকারে ছুটে গিয়ে মহিলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শরীরের সঙ্গে তাঁকে আঁকড়ে ধরে তাঁর মুখে, হাতে বারবার চুমু খেতে লাগলেন।

বৃদ্ধা দমিনিকার ঘাড়ে মাথা রাখলেন। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে তাঁরা নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন।

শেষে আগন্তুক নিজেকে মুক্ত করে বললেন: 'এবার আমার নাতিকে দেখাও।'

হাত ধরাধরি করে তাঁরা খাটের কাছে গেলেন। মহিলাটি ঝুঁকে পড়লেন, তাঁর মুখটা কাঁপতে লাগল।

'নাতি... বেচারি... অনাথ, অভাগা...'

তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে যেন রেগে উঠে ফিস্‌ফিস্ করে বলতে লাগলেন:

'কেন, কীজন্যে? কেন বাচ্চাটাকে অনাথ বানালে?'

'কার কথা বলছ, মা? কী বলছ তুমি?'

'কীজন্যে? হায় ভগবান, কেন ওর বাপকে নিয়ে গেলে? জন্মের আগেই কেন তাকে অনাথ করলে? কেন?'

'এসো মা, মামণি...'

দমিনিকা শাশুড়ীর ভাঁজ-পড়া, মোটা মোটা শিরা-ওঠা হাতদুটি বুকে চেপে ধরে চুমু খেতে লাগল।

'চলে এসো মাগো...'

'আমার নাতির কী নাম রেখেছ?'

'আনাতোলি।'

'ভেবেছিলাম, তুমি এটাই করবে। সোনার মেয়ে, ধন্যবাদ তোমাকে। আমার বাছা কী খুব কষ্ট পেয়েছে? সত্যি কথাটা বলবে কিন্তু।'

'না, মোটেই কোন কষ্ট হয় নি ওর। মরার আগে ভোল্‌গা আর তোমাকে ওর মনে পড়ত... তোমাকে বড় ভালবাসত।'

'সবকিছু আমাকে বল। কিছু লুকবে না।'

দমিনিকার অনুরোধ সত্ত্বেও আনাতোলির মা চা খেলেন না, কাপড়-চোপড় বদলে আরাম করে বসলেন না। ধীরে ধীরে লাল রঙ হারিয়ে গালগুলি তাঁর মোমের মতো হলদে হয়ে উঠছিল। অশান্ত, ক্ষুব্ধ এই মহিলা সারাক্ষণ বেঞ্চে বসে থেকে দমিনিকার মুখ থেকে ভানেয়েভের শেষ দিনগুলির কথা শুনলেন। ছেলের মৃত্যুর ঘটনা কিছুতেই তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। 'কেন তুমি তাকে এই শাস্তি দিলে? তার চেয়ে আর ভাল মানুষ কে ছিল? তাহলে? ভগবান, তোমার দয়া নেই, বিচার নেই কেন?'

তিনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। তাঁর মন থেকে ভয়ের শেষ চিহ্নটুকুও উবে গেল। নির্জন নভ্‌গরদবাসী কেরানির এই স্ত্রীটি স্বামীর চাকুরিস্থল সমেত কয়েকটি জেলাসদর ছাড়া আর কোথাও যান নি। অথচ তিনিই আজ এতদূর এই দীর্ঘ অজানা পথ পাড়ি দিয়েছেন। ছেলের বউ আর নাতিকে তিনি বাড়ি নিয়ে যাবেন।

* * *

পরদিন নির্বাসিতদের পুরো দলটি ভানেয়েভদের সঙ্গে কবরখানায় গেল। কবরগুলি বরফ-চাপা পড়েছে, ঝোপগুলি একটানা, একঘেয়ে। কেবল ভানেয়েভের কবরেই কোন ক্রুশ নেই। সেখানে রয়েছে একটি লোহার পাত আর তাতে লেখা:

'আনাতোলি আলেক্‌সান্দ্রভিচ ভানেয়েভ। নির্বাসিত রাজনৈতিক কর্মী।

মৃত্যু: ৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯, বয়স ২৭। শান্তিতে নিদ্রিত থেকো, কমরেড।'

ভ্লাদিমির ইলিচই ফলকটি তৈরি করান আবাকান লোহাঢালাই কারখানায়।

বাবাকে বিদায় জানানোর জন্য দমিনিকা ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। কবরের সামনে নুয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে তিনি বললেন:

'বিদায়, আনাতোলি। তোমাকে জানার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য। শপথ করছি, তোমার ছেলেকে একজন সৎ মানুষ হিসেবে আমি গড়ে তুলব। বিদায় বড় তোল্‌, প্রিয়তম বিদায়।'

তিনি তাঁর দামী, গরম পুঁটলিটাকে বুকে চেপে ধরলেন। কয়েক পরত শাল আর কম্বলের ভেতরে বাচ্চাটার শ্বাসপ্রশ্বাস তিনি অনুভব করছিলেন। 'তোমার বাবার কাছে বিদায় নাও, খুদে তোল্‌।'

সকালটায় বরফ পড়ছিল। নতুন পড়া বরফ রোদে চকচক করছিল।

কয়েকদিন পর দুই-ঘোড়ার ছইওয়ালা একটি স্লেজ ভানেয়েভের ফটকে এসে দাঁড়াল। বোঝা বোঝা খড় এনে আসন বোঝাই করে উপরে কম্বল বিছান হল। দমিনিকা ও তাঁর শাশুড়ী শীতের পোশাকের উপর ভেড়ার চামড়ার মোটা কোট চাপিয়ে গাড়িতে উঠলেন। বাচ্চাটাকে শক্ত পুটলি বানিয়ে দমিনিকার কাছে দেয়া হল। হাঁটুর উপর চাপান হল অনেকগুলি কম্বল। বন্ধুরা অঢেল পথের খাবার দিলেন, বিদায় জানিয়ে বললেন: 'ভাল থেকো, দমিনিকা, সুখে শান্তিতে অনেক দিন বেঁচে থেকো। বাচ্চাটাকে দেখ! আমাদের ভুলো না, মনে রেখো আমাদের কথা!'

ঘোড়াগুলি চলতে শুরু করল; ছোট আনাতোলি ভানেয়েভকে ইয়ের্মাকভ্স্কয়ে থেকে চিরদিনের জন্য দূরে নিয়ে যেতে লাগল।

ভবিষ্যতে কী তার জন্য অপেক্ষিত? জীবনটা তার কেমন হবে?

তার জীবনের কাহিনী হবে সেই প্রজন্মের মতো যারা আঠারো বছর বয়সে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল। এই প্রজন্মের পতাকা, বিবেক আর নেতা ছিলেন লেনিন। এরাই বিপ্লবকে রক্ষা করেছিল শ্বেত ফৌজ আর হামলাকারীদের হাত থেকে। তারাই তৈরি করেছিল কলকারখানা, খনি, পুল, সড়ক, বিদ্যাশিক্ষা করেছিল, বলতে গেলে গড়েছিল সোভিয়েত রাশিয়া, অটল বিশ্বাস রেখেছিল লেনিনের উপর। সম্মানের, দুঃসাহসের কাজ বলেই এতে তারা শরিক হয়েছিল।

এই প্রজন্মই মধ্যযৌবনে লড়েছে নাৎসি হামলাকারীদের বিরুদ্ধে।

১৯৪১ সালে যখন যুদ্ধ শুরু হল খুদে তোল্ তখন রীতিমতো ইঞ্জিনিয়র। যুদ্ধের প্রথম দিনই সে স্বেচ্ছায় সৈন্যদলে যোগ দেয়। তার উপর ছিল লেনিনগ্রাদ রক্ষার ভার। লেনিনের শহর, তার বাবার শহর। এই শহরেই প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে লেনিনের সঙ্গে তার বাবা বিপ্লবের পথে পা দিয়েছিলেন।

বিমান আক্রমণের মুখে, কামানের গোলাগুলির মুখে, কালো স্বস্তিকা আঁকা জার্মান ট্যাঙ্ক আর বিমান দেখে দেখে এসব কথা সে ভেবেছিল। মায়ের কাছ থেকে শোনা সব কথাই তার মনে পড়েছিল: শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য পিটার্সবুর্গে লেনিন 'সংগ্রামী লীগ' গড়েছিলেন, তোলের বাবা তাঁকে সহায়তা যোগান। এটা লেনিনের শহর, তার বাবার শহর।

১৯৪১ সালের শরতে লেনিনগ্রাদ রক্ষার লড়াইয়ে আনাতোলি ভানেয়েভ শহীদ হয়।

লেনিনগ্রাদের পিস্কারেভ্স্কয়ে স্মরণিক কবরখানার গণসমাধিতে শায়িত হাজার হাজার বীরশহীদের উদ্দেশ্যে সেখানকার দেয়ালে একগুচ্ছ কবিতা উৎকীর্ণ রয়েছে। এদেরই একজন আনাতোলি আনাতোলিয়েভিচ ভানেয়েভ।

এখানে সমাহিত লেনিনগ্রাদের মানুষেরা,
সমাহিত তোমার প্রতিবেশী — পুরুষ, নারী, শিশু।
তাদের পাশেই লালফৌজের সৈনিক,
যারা জীবন দিয়ে বাঁচিয়েছে তোমাদের,
বাঁচিয়েছে লেনিনগ্রাদ, বিপ্লবের ধাত্রী।
তাদের মহান নামগুলি লেখা গেল না,
তারা যে অগণিত, শায়িত শান্তিতে।
তবু তাকিয়ে দেখ:
ভুলি নি আমরা কাউকেই,
ভুলি নি আমরা কিছুই।

॥ ২১ ॥

একদিন বিকেলে প্রখোর মাঠ থেকে খড় নিয়ে ফিরছিল। স্তেপানিদা বুড়ির শান্ত ঘোড়ীটাকে সে চালিয়ে আনছিল হাঁকিয়ে, চাবুক চালিয়ে পাকা চাষীর মতো।

পথে তার সঙ্গে ডাঃ আর্কানভের ছেলের সঙ্গে দেখা। সে চলেছে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের দিকে, বগলে স্লেজ। 'হেই প্রখোর, জান বাবা কাল শুশেনস্কয়ে যাচ্ছেন খুব সকালে, কার অসুখ যেন। তোমার জার্মান পড়া হয়েছে? আর যোজক অব্যয়গুলি? কী? শেখ নি? কমরেড প্রখোর, লাড্ডু পাবে কিন্তু!'

ছেলেটা এক পাক ঘুরেই মিলাল।

এর পরও কি বলবেন যে মানুষের জীবনে দৈবঘটনার কোন ভূমিকা নেই? প্রখোরের জীবনে এর ভূমিকা তো রীতিমতো বিস্ময়কর। এইমাত্র ডাক্তারের ছেলেটার সঙ্গে দেখা না হলে তার বাবার শুশেনস্কয়ে যাবার খবরটা কি সে জানতে পারত? শুশেনস্কয়ে যাবার জন্য কোন সঙ্গীর কথা যে সে মোটেই ভাবে নি, সেটা নয়। তবে একবারে অচেনা কারও চেয়ে ডাক্তারের সঙ্গে যাওয়াটা তার হাজারগুণ পছন্দসই। তাছাড়া তাঁর সঙ্গে যাওয়ার ব্যাপারে অনুমতি আদায়ও সহজ হওয়ারই কথা।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সে খড় নামাল, ঘোড়ার সাজ খুলল, ওকে আস্তাবলে রাখল এবং শেষে কেরানির অনুমতি আনার জন্য তার কাছে ছুটল। সন্ধ্যা। অফিসে পেঁছে প্রখোর দেখল দরজায় জং-ধরা একটা মোটা তালা ঝুলছে। কাগজপত্র আর সীলমোহরটা ওখানেই আটকান। অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। কালকের আগে আর খুলছে না।

'ওর বাড়িতেই তাহলে যাব। এমন সুযোগ হারান কোন কাজের কথা নয়। আবার ওকে 'স্যর' বলব। হয়ত কাজ দেবে এতে,' প্রখোর ভাবছিল।

লেখক ভ্সেভলদ গার্শিনের মতো চেহারার নির্বাসিত রাজনৈতিক কর্মী পানিন

একদিন জারের এই ভৃত্যটাকে খোশামোদ করার জন্য প্রখোরকে বকেছিলেন: 'মুখ বুজে থাকা উচিত, একটাও কথা না বলা উচিত তোমার। অথচ তুমি ওকে 'স্যর' বল!

'মোটেই তা নয়। নিজের স্বার্থের জন্যেই ওই আহাম্মকটাকে তোয়াজ করি।'

প্রখোর এখন আর সেই বিশ্বাসী, সরলমনা, নিষ্পাপ ছেলেটা নেই। জীবন তাকে বেশ কিছুটা শিক্ষা দিয়েছে। বিশ্বাসঘাতক বন্ধু পিওতর বেলোগরুস্কি, জেলখানা তরুণ অত্যুৎসাহী উকিল, বদ্ধমুখ পাথরের মূর্তি তার সৎমা, মায়ের ভয়ে ভীতকম্পিত বাবা, একটি রাতের মতো আশ্রয় দিতে অপারগ ক্ষুদ্রমনা ছেলেবেলার বন্ধু। এসব অভিজ্ঞতার পর প্রখোর আজকাল সবাইকে আর অভিন্ন ভালমানুষ ভাবে না। স্কুলের পাদ্রি বলতেন: সব মানুষই ভাই-ভাই। এখন সে ভালই জানে, সব মানুষ মোটেই ভাই-ভাই নয়। আজ সে মানুষকে আলাদা করতে জানে: যারা বন্ধু আর যারা বন্ধু নয়... বন্ধুদের সঙ্গে যেমন ইচ্ছা আলাপ করা যায়, কিন্তু জেলা-অফিসের ওই কেরানিটার সঙ্গে...

সে কেরানির বাড়ির দরজার কড়া নাড়ল। পরিবারের চা-পান পর্ব চলছে। ঘর খুবই গরম। টেবিলে বিরাট সামোভার — যেন খাঁটি সোনায় তৈরি। সামোভারের চিমনি দিয়ে নীলচে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কেরানির শার্টের বোতাম খোলা। রোমশ বুক বেরিয়ে আছে। সে তোয়ালের প্রান্ত দিয়ে তার দাগফুটকি মুখ আর কোঁকড়ান দাড়ি মুছছিল।

'আসতে পারি, স্যর...'

কেরানির মতোই মোটাসোটা ঘামে-ভেজা তার বউ যে-প্লেটে চা খাচ্ছিল সেটা নামিয়ে রেখে স্বামীর দিকে ভক্তিভরে তাকাল।

'আর শুশেনস্কয়েতে তোমার কাজটা কী শুনি?' কেরানি জানতে চাইল।

'আমার এক বন্ধু আজ ওখানে। তার জন্মদিন, স্যর।'

'কারও জন্যে কাজের দিন আর অন্যদের জন্যে ছুটির...'

বৃথাই সে কঠিন হওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু 'স্যর' শব্দটি তাকে গলিয়ে দিল। সারা মুখে তার আলো ফুটল।

* * *

পরিকল্পনামতো তাঁরা খুব ভোরে শুশেনস্কয়ে রওয়ানা হতে পারল না, ইয়েরমাকভস্কয়ে ছাড়তে ছাড়তে তাঁদের প্রায় দুপুর গড়িয়ে গেল। ডাক্তারের ছইওয়ালা ছোট স্লেজের খড়ের গদির উপর কম্বল বিছিয়েই যাত্রা শুরু হল।

বরফ-ঢাকা মাঠের ওপরে গ্রামটি চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত কেউ কথা বলল না। এবার গাড়ি চলেছে মসৃণ বনপথে দ্রুত, চোখে পড়ছে বিশাল পাইন আর অ্যাস্প গাছ।

'দেখুন, প্রখোর আর্তেমভিচ,' কোমল মার্জিত গলায় ডাক্তার বললেন। 'ওই শুশেনস্কয়ে কিছুদিন থেকে আমাকে বেশ টানছে আর তা ওখানকার জন কয়েক মানুষের জন্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় কয়েকজন সেরা লোক, বলা যায় প্রতিভাবান লোকের সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়েছিলাম। আর সেজন্যেই ভ্লাদিমির ইলিচের অসাধারণ পান্ডিত্য কিছুটা আঁচ করতে পারি। একাধারে পন্ডিত, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ আর আইনজ্ঞ! তাঁর বইগুলি, মানে 'অর্থনৈতিক সমীক্ষা' আর 'রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ', এতে আছে সামাজিক শ্রেণী গঠন, এগুলির গঠনপ্রক্রিয়া, সমাজ বিকাশের দ্বান্দ্বিকতা। এসব বিচার-বিবেচনার গুরুত্ব খুব বেশি, বুঝলেন? কিন্তু তাঁর যে-দিকটা আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে সেটা হল এমন অসম্ভব জটিল দার্শনিক সমস্যার মধ্যে থেকেও তিনি মানুষের সাধারণ প্রয়োজনের দিকেও খুব সহজেই নজর দিতে পারেন। এই অস্‌কার এঙবার্গের কথাটাই ধরুন না...'

জেলা চিকিৎসক হিসেবে ডাঃ আর্‌কানভ রোগী দেখার জন্য নিয়মিত শুশেনস্কয়ে যান, এবার যাচ্ছেন অস্‌কার এঙবার্গকে দেখতে। একদিন আগে ভ্লাদিমির ইলিচের চিঠি তিনি পেয়েছেন। চিঠিতে লেখা রয়েছে:

'প্রিয় ডাক্তার, যদি সম্ভব হয় তবে আজ সন্ধ্যায় আমাদের অসুস্থ কমরেড অস্‌কার আলেক্‌সান্দ্রভিচ এঙবার্গকে (উনি থাকেন ইভান সসিপাতভিচ ইয়েরমলায়েভের বাড়িতে) একবার দেখতে এলে বাধিত হব। গত তিনদিন থেকে তিনি শয্যাশায়ী— মারাত্মক পেটব্যথা, বমি আর তরল পায়খানা হচ্ছে। আমাদের সন্দেহ, হয়ত বিষক্রিয়া।

শ্রদ্ধান্তে
ভ্লাদিমির উলিয়ানভ।'

'সত্যি বললে ওই অস্‌কার এঙবার্গ তো একজন সাধারণ কর্মী বই আর কিছু নন। অথচ ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁকে দেখেন কমরেড হিসেবে। কিম্বা ওই ভানেয়েভের কথাই ধরুন না... ওঁর বন্ধুত্বের প্রতিভা আছে, খুবই সদগুণ। আর তাঁর বিচার-বিবেচনার কথা কীই বা বলব! সমাজ বিকাশ সম্পর্কে তার মার্কসীয় বিশ্লেষণ...'

ডাক্তার মার্কসবাদ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য শেষ করে বিরোধী দার্শনিক তন্ত্রগুলি সম্পর্কে বলতে লাগলেন। কিন্তু, প্রখোরের মনে অন্যতর ভাবনা। মাঝেমধ্যে মাথা নাড়লেও সে ভাবছিল অন্যকিছু। ডাক্তার বলার আগেই সে ভ্লাদিমির ইলিচের 'বন্ধুত্বের প্রতিভা' লক্ষ্য করেছিল। তখন, সেই কবরখানায়...

সে ভ্যাদিমির ইলিচকে খ্‌ুজছিল। তাঁর গলা এখনো কানে বাজছে। এমনটি আর কারও নেই। তাঁর উজ্জ্বল চোখ, তাঁর পরামর্শ, প্রখোরের জন্য উদ্বেগ, তাকে মাথা উঁচু রাখতে, প্রচুর পড়াশোনা করতে বলা।

প্রখোর নিজের সম্পর্কে ভ্যাদিমির ইলিচকে হয়ত কিছু বলবে। তিনি নিশ্চয়ই শুনে খুশি হবেন যে সে তাঁর পরামর্শ শুনেছে, যথাসম্ভব পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে। ভ্যাদিমির ইলিচ সম্পর্কে প্রখোরের ভাবটা এমন যেন তিনি তার ঘনিষ্ঠতম, প্রিয়তম আত্মীয়! একটু ভাবলেই দেখা যায় অনেকগুলি ঘটনা তাঁদের একত্রে বেঁধেছে। একেবারে গোড়ায় পদল্‌স্ক, তাকে দেয়া সিল্‌ভিনের রাজনৈতিক বইগুলি, তাছাড়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার নিজের চিন্তাভাবনা।

শুশেনস্কয়ে আসার ব্যাপারে তার আগ্রহের অন্যতম কারণ অবশ্যই পাশা। সেই সময় ওর ওভাবে চলে যাওয়াটা অনুক্ষণ তার মনে পড়ে: মায়ের দস্তানা পাশার পকেটে গুঁজে দিয়েছিল। জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে ছুটে গেল। জমে যাওয়া পথের উপর ওর জুতোর শব্দ এখনো প্রখোরের কানে বাজে। সে সময় প্রখোর ওকে জোর করে আটকে রাখে নি। হয়ত বা মনে আঘাত লেগেছিল। তাই কি?

মধুময়ী পাশা! এক ও অনন্যা প্রেমিকা তার।

'কীজন্যে সে ছুটে পালাল? প্রথম দেখায় কোন অপরিচিতের কাছে ধরা দেয়ার মতো মেয়ে সে নয়, তাই কি? এজন্যেই তাকে ভালবাসি: তুমি গরবিণী, সহজলভ্যা নও। তোমাকে আমি ছেড়ে দেব না, পাশা! তুমি অবশ্যই পোল্যাণ্ডে যাচ্ছ না। ওখানে যেতে দেব না তোমাকে। মেয়াদ শেষ হলে তুমি যাবে আমার সঙ্গে।'

এই ভাবনাগুলি অবশ্যই সে লেওপোল্ড প্রমিন্‌স্কিকে বলবে। এতে দোষটুকু কেটে যাবে।

অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা স্তেপ আর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পঞ্চাশ মাইলের মতো পাড়ি দিয়েছে। পৌঁছে গেছে শুশেনস্কয়ের মূল সড়কে। সেই তুষার ঝড়ের তাণ্ডবে সারা গাঁ বরফে ঢেকে গেছে। বেড়ার ধারে জমেছে বরফের উঁচু ঢিপি। চলার পথ হয়ে গেছে সরু সরু। ছুটলে বরফ ভাঙ্গার শব্দ ওঠে। কুয়োর উপরকার জল-তোলা কলের লম্বা ঘাড়টা আনত হয়ে গাঁয়ে আসা নতুন মানুষকে স্বাগত জানাল। গাঁয়ের বধূ জলে ভরা বালতি তুলল।

ইভান সসিপাতভিচ ইয়ের্‌মলায়েভ তার কুঁড়েঘরের সামনে দাঁড়িয়ে, কাঁধের উপর চামড়ার ওভারকোট।

'এদিকে, সোজা উঠোনে চলে আসুন। ঘোড়াটাকে এমুখে চালান,' সে ডাক্তারকে বলল। 'আমার ভাড়াটের অবস্থা গতরাতে এতটা খারাপ ছিল যে আমরা ভয়ই পেয়েছিলাম হয়ত বা বেচারী আর বাঁচবেন না।'

নতুন তালি লাগান বুটে পা টেনে টেনে ইয়ের্‌মলায়েভ স্লেজের জন্য ফটকটা পুরো খুলে দিল।

চটপটে ছোটখাটো মানুষটি। মাথার বিরাট টাকটা ঘিরে আছে বৃত্তাকার চুলের সরু একটি রেখা। গতরাতের এই ঝক্কির পরে কুঁড়েঘরের উঠোনে একটি হালফ্যাশনের স্লেজ, আর সেটা থেকে শেয়ালের চামড়ার লাইনিং দেয়া কোট গায়ে, শহুরে ডাক্তারের ব্যাগ হাতে জনৈক ভদ্রলোক নেমে আসার দৃশ্যটা তার কাছে প্রীতিকর ঠেকল। 'কেবল গতকালই ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁকে চিরকুটটি পাঠান, আর এরই মধ্যে তিনি হাজির!' ইয়ের্‌মলায়েভ ভাবল। 'এর মানে আমাদের এই নির্বাসিত লোকটিকে সবাই খুব শ্রদ্ধাভক্তি করে। ওঁর মাথা আছে। এটা মানতেই হয়।'

অস্‌কার এঙবার্গের অবস্থা খুবই করুণ: উস্কোখুস্কো চুল, এলিয়ে পড়া লম্বা গোঁফ, গর্তে ঢুকে যাওয়া গাল। ফাটা ঠোঁটের ফাঁক গলিয়ে মাঝে মাঝে শ্বাস ফেলছেন। চোখগুলি ঘোলাটে।

'ধন্বন্তরি নিকোলাই, সন্ত পান্তেলেইমন, দয়া কর প্রভু!' বাড়িওয়ালী বিড়বিড় করে ক্রুশচিহ্ন আঁকছিল। অবিরাম বিলাপ আর করুণ চোরা চাহনিতে সে অস্‌কারের মনে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছিল।

'আপনি তো অনেকক্ষণ সাধুসন্তদের কাছে অঢেল জপতপ করলেন, এবার ওষুধের দেবীকে জায়গাটা ছাড়ুন,' জোরেসোরে বললেন ডাঃ আর্‌কানভ এবং হাত ছড়িয়ে বুড়িকে বিছানার কাছ থেকে সরালেন। ইয়ের্‌মলায়েভ আর প্রখোরও দরজার কাছে সরে দাঁড়াল। বুড়ি নিজের শরীরে ক্রুশচিহ্ন এঁকে এঁকে উনুনের পাশে পর্দার আড়ালে লুকাল। বুড়ো একটা সিগারেট ধরিয়ে তার এই ভাড়াটের সঙ্গে নিচু গলায় পেরোভ হ্রদে হাঁস শিকারের গল্প জুড়ল: ভ্লাদিমির ইলিচও তাঁর কুকুর জেনিকে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে জুটতেন, উত্তেজিত ভ্লাদিমির ইলিচ বন্দুকটা নোয়াতে ভুলে যেতেন, আর অস্‌কার আলেক্‌সান্দ্রভিচ কখনই বেশি শিকার পেতেন না, এই হল তাঁর দৌড়।

প্রখোর ডাক্তারের শান্ত, সুরেলা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল: চিকিৎসা আর ওষুধের ব্যবস্থা দিচ্ছেন, লাতিন সব নাম বলছেন। এসব উদ্ভট নাম শুনে বুড়ি আরও ভয় পেয়ে গেল, জোরেসোরে বিলাপ জুড়ল: 'বেচারী ছেলেটা, এত অল্পবয়সে, বিয়ে-থা করার আগেই... বাছারে, কোথায় কোন বিভুঁইয়ে তোকে কবর দেবে রে। কেউ এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না রে!'

ডাক্তার আসার পরপর এমনিতেই অস্‌কার অনেকটা ভাল বোধ করছিলেন। বোবা হতাশায় আর তিনি সটান শুয়ে থাকলেন না। তাঁর চোখে আবার প্রাণের লক্ষণ ফুটল। বাড়িওয়ালীকে তার তৈরি ক্র্যানবেরির চা দিতে তিনি অনুরোধ করলেন। ডাক্তার অনুমতি দিয়ে ওষুধ খাওয়ার খুঁটিনাটি আরেকবার বলে গেলেন। সবার

উপর থেকেই একটা বোঝা নেমে গেল: অস্‌কার এঙবার্গকে আর বিদেশ-বিভুঁইয়ে কবর দিতে হবে না! ডাক্তারের সঙ্গে ফেরার জন্য কখন কোথায় দেখা হতে পারে সেই ব্যবস্থা পাকা করার পর প্রখোর লেওপোল্ডের বাড়ির দিকে রওয়ানা হল।

'তাদের আমার চিরকালের জন্যে শুভেচ্ছা জানাবেন!' অস্‌কার বললেন।

'চিরকালের জন্যে কেন? কিন্তু তখন এর রহস্য নিয়ে ভাববার মতো মনের অবস্থা প্রখোরের ছিল না।

জীবনের কী অদ্ভুত জটিলতা! সে উলিয়ানভদের বাড়ি যাওয়ার জন্য মরে যাচ্ছে। নীল-চোখ পাশা ওখানে। এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্‌না। ভ্লাদিমির ইলিচ। কিন্তু তাকে যেতে হচ্ছে লেওপোল্ডের বাড়ি। কেন? শীঘ্রই হয়ত লেওপোল্ড চলে যাবে। শুশেনস্কয়ে থেকে পোল্যাণ্ড — অনেকটা পথ বৈকি! কাটবে সপ্তাহের পরে সপ্তাহ। শুশেনস্কয়ে তার চিঠি পেঁছতে লেগে যাবে কয়েক মাস। প্রথমে ক্রাসনোয়ার্স্ক পর্যন্ত রেলে, তারপর ঘোড়ার ডাকে। পাশা মা-বাবার হাত-পা ধরে লদ্‌জে যাওয়ার অনুমতি চাওয়ার আগে কত দিন, কত সপ্তাহ, কত মাস কেটে যাবে!

আর পাশার মা-বাবা, যারা কোনদিন ট্রেন দেখে নি (ট্রান্স-সাইবেরীয় রেল সবে তিন বছর হল চালু হয়েছে), বাড়ি ছেড়ে মিনুসিন্‌স্কের বেশিদূর কোথাও যায় নি। তারা কি মেয়েটিকে দূরের ওই লদ্‌জে যেতে দেবে? জায়গাটা কোথায়? ওই জন কয়েক রাজনৈতিক নির্বাসিত পোল ছাড়া পোল্যাণ্ডের আর কী তারা জানে?

নাকি প্রখোরের দিক থেকে লেওপোল্ডকে কিছু না বলাই ভাল? সে তো কয়েক দিনের মধ্যেই চলে যাচ্ছে... না, এটা সে পারবে না। প্রখোর পা চালাল। তার চামড়ার কোটটা খোলা, গলায় দ্‌মিত্রি ইলিচের মাফলার জড়ান। হাঁটতে হাঁটতে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সে আওড়ে চলল: 'লেওপোল্ড তোমাকে ঠকাতে চাই না, তুমি চলে যাবে কিন্তু আমি তাকে ভালবাসি।'

হাত দুলিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে দ্রুত এগিয়ে চলল। কিন্তু লেওপোল্ডের বাড়ি কাছিয়ে আসতেই তার গতি কমে এল। গন্তব্যে পেঁছে সে এক মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়াল, যেন এখনই কিছু একটা ঘটবে। কিন্তু কিছুই ঘটল না। সে বারান্দার সিঁড়িতে পা দিয়ে ইতস্তত করছিল। বাড়িতে তর্ক চলছিল। সে স্ত্রীলোকের কান্নাভেজা কণ্ঠস্বর শুনল:

'আর কিছু আমি নিতে পারব না। আমার শরীরের আর এতটুকু শক্তি নেই। আমি খুব ক্লান্ত। এটা বুঝতে পার না? ঈশ্বর, এর কি কোন শেষ নেই!'

আর পুরুষের জড়ান উৎফুল্ল গলা:

'আহা, আহা, তেক্‌লা। তোমার পরিবার তোমার সঙ্গে থাকছে, সবকটি ছেলেমেয়ে। কেউ আর জেলে নেই। আমরা আর নির্বাসিতও নই। আমরা মুক্ত। তাই বলছি

কী, তোমার ঈশ্বরকে আর নাই বা রাগালে, শেষে উনি আমাদের সত্যিকার কোন দুর্ভাগ্যে না জড়ান।’

‘আর এটা কি দুর্ভাগ্য নয়!’ মহিলাটি খেপে গেলেন। ‘আমাকে নিয়ে মশকরা করছ, আমার চোখের জল নিয়ে তামাশা...’

‘তেক্‌লা, সোনা, কী জান, কাঁদলে তুমি অনেকটা সহজ হয়ে যাও কি না...’

দরজায় টোকা দিয়ে প্রখোর সেটা খুলে ফেলল। কী কাণ্ড! সর্বত্র কাপড়চোপড়, জিনিসপত্র ছড়ান। ঘরের মাঝখানে একটা খোলা ট্রাঙ্ক, কাপড়ে অর্ধেক বোঝাই। মেঝের উপর কমলা রঙের এক গাদা পেঁয়াজ, মালার মতো বাঁধা, কাঠের একটি খালি বাক্স, আরেকটায় খড়ে জড়ান বাসনপত্র; রান্নাঘরের উল্টান টুল, কয়েকটি হাঁড়ি পাতিল, জানালার তাকের গায়ে দাঁড় করে রাখা একটি উনুনের চিমটে। এবং এই সবকিছুর মাঝখানে জনৈক পুরুষ আর এক মহিলা। পুরুষের গোঁফটা রেপিনের আঁকা বিখ্যাত ছবির — ‘জাপরোজিয়ে’র কসাক’দের মতোই জবরজং। তবে চেহারাটা ওদের মতো নয় — পোষ-মানা, বিষণ্ণ। মহিলাটির মুখ ফ্যাকাশে, ভুরু কালো, রাগী চোখ। উনি লেওপোল্ডের মা — চেহারার মিল থেকে প্রখোর তখনই অনুমান করল। নানা বয়সের ছেলেমেয়েরা বেঞ্চে বসে নুন ছড়ান রুটি চিবুচ্ছে।

‘নমস্কার। তুমি কী চাও?’ লেওপোল্ডের মা কোমরে হাত রেখে মারমুখো দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, যেন বলতে চাইলেন: ঠিক আছে, সবকিছু ছড়িয়ে আছে। ঠিক কথা, আমরা খুবই গরীব আর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে আমাদের, তাতে কী? আমরা তো কোন নালিশ জানাচ্ছি না, আমাদের জন্য দুঃখ করতেও বলছি না। ‘তুমি আমাদের বড় ছেলের সঙ্গে দেখা করতে চাও? সে ওখানে,’ তিনি কাঁধের ইশারায় জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন।

প্রখোর পার্টিশনের ওধারে গিয়ে বইয়ের স্তূপে চিন্তাচ্ছন্ন লেওপোল্ডকে দেখতে পেল। তার চাহনি ব্যথাবিধুর, নাকের ছিদ্রগুলি উত্তেজনায় কাঁপছে। প্রখোরকে দেখেই সে হতাশ স্বরে বলল:

‘সর্বনাশ হয়ে গেছে। পোল্যান্ডে আমাদের যাওয়া হচ্ছে না।’

ভ্রমণ-ভাতার জন্য দেয়া তাদের দরখাস্তটি নাকচ হয়ে গেছে। অঢেল অর্থ খরচা না করে তাঁদের পক্ষে দেশে ফেরা অসম্ভব। সাইবেরিয়ায় স্বামীর কাছে আসার জন্য তেক্‌লা যখন ছেলেমেয়েদের পুরো দঙ্গল নিয়ে লদ্‌জ ছাড়েন তখন কর্তৃপক্ষ ফিরতি ভাড়া দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এই রকম একটা আইনও ছিল। ভ্যাদিমির ইলিচ তাঁদের একদা দরখাস্ত লিখে দেন। তিনি আইন-কানুন ভালই জানেন। সরকার তাঁদের ঠকিয়েছে। মা কি তবে তাঁদের বাড়ির স্বত্ব খোয়াবেন? ওহ্, কিন্তু কী ধরনের বাড়ি? প্রায় ভিতঘরের দুটো ভাঙ্গাচোরা কোঠা। তাঁরা পোল্যান্ডকে খুইয়েছেন। সারা পোল্যান্ড হল প্রমিন্‌স্কিদের সম্পত্তি, তাঁদের পিতৃভূমি, কারখানার বাঁশির শব্দমুখর তাঁদের

লদ্‌জ। সকালে এগুলি বেজে ওঠে, আর্তনাদ করে, গান গায়, নিজস্ব স্বকীয় পিতলের ভেরীর অর্কেস্ট্রা — উঁচু, নিচু আর সবগুলিই মানুষকে কাজে ডাকে, পথ ভরে ওঠে কাজের কোট-পরা লোকের ভিড়ে। লদ্‌জের শ্রমিক শ্রেণীর একজন হওয়ার জন্য লেওপোল্ড কত স্বপ্নই না দেখেছে। এই তো তার পোল্যান্ড। বিদেশী সৈন্যদের বুটে সে দলিত হয়েছে, পরাজিত হয় নি। দেশ, দেশ আমার! আমি তোমায় ভালবাসি...

'ঈশ্বর, জানি না, এই মালপত্তর নিয়ে আমি কী করব!' লেওপোল্ডের মায়ের গলা তারা শুনতে পেল। 'জাঁ, তুমিই বল না? উনুনের চিমটে নেব, নাকি ফেলে যাব?'

'এসো বইগুলি বাঁধি,' রাগী গলায় লেওপোল্ড বলল।

তারা কোথায় যাচ্ছে সেকথা প্রখোর জিজ্ঞেস করতে পারল না। অপরাধবোধে তার জিভটা অসাড় হয়ে গেল।

* * *

আসলে বইয়ের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। এগুলিরই একটি হল ভ্লাদিমির ইলিচের উপহার। আর এটাই! নকশা-তোলা মলাট, চামড়ার কোণামোড়া বইটি দেখে প্রখোরের বুক কেঁপে উঠল। এমন একটি বইই তো কত দিন আগে সে এক রাতে পিটার্সবুর্গে গোগ্রাসে গিলেছিল। 'স্কুলের বন্ধুরা'। এদমন্দো দ্য অ্যামিচিস। ইতালীয় ভাষা থেকে অনুদিত... সে মনশ্চক্ষে উলিয়ানভদের দেখতে পেল। চেনা উলিয়ানভদের সবাইকে। তাঁদের সঙ্গে দেখা করার পর সব সময়ের মতো এবারও সে উদ্দীপ্ত হল। এমন ঘটনার সংখ্যা খুব বিরল হলেও এগুলি তার পুরো জীবনটাকেই আলোকিত করেছে।

চরম হতাশায় লেওপোল্ডের মা ঈশ্বরের দোহাই দিতে লাগলেন। তিনি আর তাঁর স্বামী এই মালপত্র নিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন।

প্রখোর কাজে হাত লাগাল: মালপত্র প্যাক করল, পেরেক ঠুকল, দড়ি বাঁধল আর লেওপোল্ডের মা কেবল হুকুমই দিলেন।

'বাসনপত্রের বাক্সটা এবার আটকান যায়। উনুনের চিমটে আমি সঙ্গেই নেব। এছাড়া আমার চলবে না। লেওপোল্ড, কোথায় আমার স্কার্ট রেখেছ? ঈশ্বর, এটা পরেই তো আমি লদ্‌জে গির্জায় যেতাম। জাঁ, সোনা, দেখ তো, আমার সেরা স্কার্টটার জন্যে খানিকটা জায়গা করতে আর কি না! জসিয়া, ব্রনিয়া, স্তাসিক! ওই বড় হাঁড়িটা আমাকে দাও তো। এটা এত বড় যে, জানি না নেওয়া যাবে কি না। না, আমি মারা যাব দেখছি... হা, ঈশ্বর!'

ডাঃ আর্‌কানভ যখন প্রখোরকে নিতে এলেন তখন অন্ধকার নেমে এসেছে।

'আমাদের যাওয়া পর্যন্ত তুমি থাকছ না?' হতাশ লেওপোল্ডের মা জিজ্ঞেস করলেন।

'থাকছ না?' লেওপোল্ডের গলায় অভিমানের আঁচ।

আর তাই প্রখোর ডাক্তারকে জানাল যে কেরানিটা তাকে যতদিন খুশি শুশেনস্কয়ে থাকতে বলেছে।

'খুবই অদ্ভুত!' ডাক্তার বললেন। কিন্তু প্রখোরকে এ-নিয়ে কোন প্রশ্ন না করে নিঃশব্দে চলে গেলেন।

'এখন, বস্তাটা সেলাই কর,' নতুন উদ্যমে তেক্‌লা সহকারীকে হুকুম দিতে লাগলেন। 'লেওপোল্ড, কেবল তাকিয়ে থেকো না। এগুলি তো তোমারও জিনিস, জান নিশ্চয়ই!'

'মা, চুপ কর তো...' বিরক্ত হয়ে সে মুখ ভেঙচাল।

শুশেনস্কয়েতে শেষবারের মতো রাতের খাবার খেতে সবাই বসলেন। বাচ্চারা খাওয়ার পরপরই শুতে গেল। জনকয়েক গাদাগাদি করে উনুনের উপরের বিছানায়, অন্যরা গুটিসুটি মেরে বেঞ্চে।

'চলে যাওয়ার আগে আমরা কি একটু আলাপ করার সময় পাব না?' প্রখোর এই নীরব প্রশ্নটি বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল।

লেওপোল্ডের বাপ পাইপে তামাক ভরে বুড়ো আঙুল দিয়ে তাতে চাপ দিচ্ছিলেন। তিনি তামাকটা শুধু চেপেই চললেন, মনে হল, মন তাঁর অনেক দূরে।

বারান্দায় আবার পায়ের শব্দ শোনা গেল, তাহলে তাঁরা এসে গেছেন! আপনি কি ভেবেছিলেন জাঁ প্রমিন্‌স্কি? কেন এমন সন্দেহ আপনার মনে এল?

'প্রিয় পানি তেক্‌লা,' তাঁর হাতদুটি নিজের হাতে নিয়ে আদর করতে করতে নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না বললেন। 'তুমি যাওয়ায় কত কিছু যে হারাব! সুখে-দুঃখে কত না আপন ছিলাম আমরা... তোমরা যাওয়ার মানে জীবনের একটা যুগ শেষ হয়ে গেল...'

প্রখোরের বুকে ব্যথা বাজল। সে জানত: পাশা এখানে আছে। পাশা পরেছে হলুদ রঙের চামড়ার কোট, ফুল-তোলা শাল। প্রখোরের চোখে উজ্জ্বল এই পোশাকে পাশাকে অসম্ভব বিষণ্ণ দেখাল। সে ভেতরে দরজা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল, হাতগুলি কোটের হাতার মধ্যে ঢুকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না ও ভ্লাদিমির ইলিচ প্রমিন্‌স্কিদের বিদায় জানানোর সময়। সে হাসছিল না, কথাও বলছিল না।

'তাহলে কালই শুশেনস্কয়েকে চিরদিনের মতো বিদায় জানাবেন,' ভ্লাদিমির ইলিচ বলছিলেন। 'ভাবছি, আর কি আমাদের দেখা হবে কোনদিন? সেটা হোক বা না হোক, কমরেড জাঁ, আপনার বন্ধুত্বের জন্যে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ হাঁস শিকারের জন্যে, গানের

জন্যে, যে দিবসের জন্যে — মনে পড়ে কত আনন্দে আমরা লাল পতাকা দিয়ে দিনটা পালন করেছিলাম! আপনার বিপ্লবী কঠোরতার জন্যেও ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ ভ্লাদিমির ইলিচ। কিন্তু, আপনি কি জানেন, আমরা রীতিমাফিক কাজ করছি না,' তাঁর কসাক গোঁফে তা দিয়ে জাঁ প্রমিন্‌স্কি বললেন। 'এটা হবে ঠিক নিয়মমাফিফ,' আর তিনি নিচু গলায় গাইতে লাগলেন:

> শত্রুতার ঘূর্ণিবাত্যা মোদের ঘিরেছে হন্যে,
> অশুভ শক্তি হানিছে বজ্রবাণ,

ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁর সঙ্গে আস্তে আস্তে গলা মেলালেন:

> আমরা লড়িব মৃত্যু অবধি সত্য ন্যায়ের জন্যে,

ফিস্‌ফিস্‌ করে নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌নাও যোগ দিলেন:

> অজানা ভাগ্য, তবু চির অম্লান...

লেওপোল্ড সিধে হয়ে দাঁড়াল। আনুগত্যের শপথ নিচ্ছে এমনভাবে সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে শব্দগুলি উচ্চারণ করল:

> কিন্তু ওঠাব সদর্পে, সাহস ভরে
> জঙ্গী নিশান মেহনতীদের তরে...

অনুচ্চ স্বরে গাওয়া এই গানের মূর্ছনা, শপথের মতো উচ্চারিত এই শব্দাবলী প্রখোরের প্রতিটি স্নায়ুতন্দ্রীতে শিহরণ জাগাল।

'লেওপোল্ড ভুলো না!' গান শেষ হলে অর্থপূর্ণভাবে ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন।

'কোনদিন না!'

ভ্লাদিমির ইলিচ আর নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না প্রমিন্‌স্কিদের বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন। পাশা একপাশে সরে দাঁড়িয়ে তাঁদের যেতে দিল। এবং তারপর একটিও কথা না বলে সে লেওপোল্ডের বাবা ও মা'র সামনে অনেকটা ঝুঁকে মাথা নোয়াল। দূর থেকে সে প্রখোরের দিকেও মাথাটা একটু হেলাল।

লেওপোল্ড ঠায় সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। তাকে বিভ্রান্ত, বিধ্বস্ত দেখাল, যেন কোন ঘূর্ণিঝড়ে উড়ছে। হঠাৎ সে সংবিৎ ফিরে পেল এবং তারপর কোট আর টুপিটা আঁকড়ে ধরে পাশার পেছনে ছুটে গেল।

'কী মিষ্টি মেয়েটা,' স্বপ্নিল কণ্ঠে পানি তেক্‌লা বললেন। 'আমাদের বড় ছেলের তরুণী রূপসী বান্ধবী।'

তাঁর স্বামী চুপ করে রইলেন। পাইপে তামাক ঠাসতে ঠাসতে তিনি পেছনে সরে গেলেন।

'সারা দুনিয়ায় উলিয়ানভদের মতো এমন দয়ার মানুষ, ভালো মানুষ কেউ আছে কি না জানি না!' বললেন পানি তেক্‌লা।

* * *

পার্টিশনের ওধারে মেঝের ওপর রাখা তালি মারা কম্বল মাথার নীচে বালিশের বদলে কাপড়চোপড়ের স্তূপ — লেওপোল্ড আর প্রখোরের বিছানা। প্রখোর শুয়ে পড়ে চামড়ার কোট দিয়ে শরীর ঢাকল।

জানালায় পূর্ণিমার সাদাটে চাঁদ। রাত স্তব্ধ, বিষণ্ণ। সারা দিনের তালগোল প্রখোরের মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। সকাল। স্লেজে বন পাড়ি, শীতের সমারোহ — বরফের কুচিমাখা আকাশ-ছোঁয়া বিশাল পাইন। তারপর হঠাৎ দৃশ্যবদল। প্রখোর এখন বদ্ধ, ঠাসাঠাসি, কলরবমুখর, অগোছাল একটি ঘরে। তার কানে এলো ঈশ্বরের নামে পানি তেক্‌লার বিলাপ... দরজায় পাশা দাঁড়িয়ে, পরনে তার হলুদ রঙের চামড়ার কোট। শুরু হল গান... পাশা এখনো ওখানে, নিথর, নির্বাক। লেওপোল্ডের সঙ্গে প্রখোর অনেকক্ষণ আছে, অথচ কোন আলাপই হল না। স্বপ্নচরের মতো লেওপোল্ড অগোছাল ঘরে ঘুরছে, দৃষ্টিহীন নির্লিপ্ত। সে তড়িঘড়ি কাজটা শেষ করে ফিরুক!

জানালা থেকে সাদা চাঁদ সরে গেল। ঘরের কোণগুলি ছায়ায় ঢেকে গেল। উঠোনে মোরগ ডাকছে।

পা টিপে টিপে লেওপোল্ড এল। নিঃশব্দে জুতো খুলল সে, প্রখোরের পাশে শুয়ে পড়ল। কেউ কোন কথা বলল না।

'প্রখোর, জানি তুমি ঘুমোচ্ছ না,' লেওপোল্ড ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল।

'না।'

'কী ভাবছ?'

'জীবনের কথা।'

লেওপোল্ড আচমকা উঠে বসল। হাতদুটি দিয়ে হাঁটু আঁকড়ে ধরল। সাদাটে আধো-আলো আধো-অন্ধকারে প্রখোর তার সুন্দর পার্শ্বছবি আর কালো লম্বা একটি ভুরু দেখতে পাচ্ছিল।

'পোল্যাণ্ড যেতে পারলে আমি অবশ্যই ওখানে পাশার আসাটা ভাবতে পারতাম। আমি জানি, সে আসতই। কিন্তু, এখন এটা ভাবাই যায় না। নিশ্চয়ই সে আসবে না। জানি, ভালই জানি, আর কোনদিন তাকে দেখতে পাব না। সে আসবে না। প্রখোর, আমি যে...'

'লেওপোল্ড, ওটা এভাবে নিও না... না, লেওপোল্ড, না,' প্রখোর তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে, যদিও জানে সবই বৃথা।

‘ওকে বল আমি সারা জীবন তাকে মনে রাখব। ভালবেসে যাব। বলবে, বলবে তাকে?’

‘তোমার বলাই তো ভাল।’

‘বলেছি। তবু কাল তুমি আরেকবার বলবে। বলবে?’

‘বলব।’

মাথার নিচে হাত রেখে লেওপোল্ড আবার শুয়ে পড়ল। নিশ্চল, দৃষ্টি ছাদে স্থির। সে ভাবছিল: ‘কী অসহ্য...’

॥ ২২ ॥

পূব আকাশে গাঢ় পাঁশুটে রঙে সবে হলুদের আঁচ লেগেছে। নিরেট ছাইরঙের ওপারে সূর্য উঠছে, কিন্তু জেগে-ওঠা গাঁয়ের উপর নিচু হয়ে আসা তুষার-মেঘের চাঙর ভাঙতে পারছে না। সকালটা মোটেই উজ্জ্বল নয়। অন্ধকার থাকতেই প্রমিন্‌স্কিরা বেরিয়ে পড়েছেন। তাঁদের কোঠাগুলির দরজা উদোম। ফটক খোলা। উঠোনে একটু আগে বেরিয়ে যাওয়া জোড়া-স্লেজের দাগ।

প্রখোর বরফ ভেঙ্গে এগিয়ে চলল। মুখ-ভার আকাশের মতোই তার মন ভারাক্রান্ত। তার এই সামান্য জীবনে সে অনেকগুলি বিদায়ের দৃশ্যই দেখেছে। বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভেঙে যায়, হৃদয়ে শূন্যতা দেখা দেয়...

লেওপোল্ড গেল ক্রাসনোয়ার্স্কে। তার বাবাকে ওখানটায় রেলে চাকরি দেয়া হয়েছে। ক্রজিজানভ্‌স্কিরা, স্তারকভ্‌রা মিনুসিন্‌স্ক ছেড়ে চলে গেছেন। সবাই যাচ্ছেন। মিখাইল আলেক্‌সান্দ্রভিচ সিল্‌ভিন সামরিক কাজের নির্বাচন পেয়ে শীঘ্রই এতে যোগ দিচ্ছেন। স্বামী চলে গেলে ওল্‌গা আলেক্‌সান্দ্রভ্‌নার সাইবেরিয়ায় থাকার দিন ফুরোবে। লেপেশিন্‌স্কিদের মেয়াদও প্রায় শেষ। উলিয়ানভদেরও আর মাত্র তিন মাস বাকি। সবাই যাচ্ছেন...

প্রখোরের জন্য পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠছিল। এইসঙ্গে ছুটি ছাড়া গরহাজির থাকার ব্যাপারটাও। কেরানিটা তাকে কী ধরনের শাস্তি দেবে — সেটা প্রখোর ভাবছিল। হয়ত তাকে দুনিয়া ছাড়া করবে, খোদ সুমেরুতে পাঠাবে। আর এটা হবে তার জন্য মরণের সামিল।

সে অস্‌কার এঙবার্গকে দেখতে গেল।

এত ভোরেও সবগুলি বাড়ির উনুন জ্বলছে। চিমনির ধোঁয়া চালের কাছাকাছি ঝুলছে। কুয়োর উপরকার কাঠের গুঁড়িগুলিতে ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ উঠছে। রাস্তা থেকে শক্ত বেড়ার নিরাপদ আড়ালে উঠোনে গিয়ে লোকজন কথা বলছে। তাদের আলাপের

রেশগুলি শোনা যাচ্ছে। বরফে পায়ের আওয়াজ পেয়ে গোরুগুলি জাবের আশায় ডাকছে।

ইভান সসিপাতভিচ টেবিলের উপর ধোঁয়া-ওঠা সিদ্ধ আলুর একটি লোভনীয় পাত্র নিয়ে বসে আছে।

'এসে বোস, হে ছোকরা, আমার অতিথি হবে,' সে ব্যস্ত হয়ে বলল। 'দুঃখের বিষয়, আমার এই ভাড়াটেকে স্বাস্থ্যপান করার জন্যে চা ছাড়া আর কোন কড়া পানীয়, আমার নেই। অবশ্য বিপদ এখন কেটে গেছে, খারাপের দিকে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই...'

ফ্যাকাশে ও দুর্বল হলেও আজ সকালে অস্কার এঙবার্গকে অনেকটা ভাল দেখাচ্ছিল। পরিষ্কার করে মুখ কামান, টেড়ি সোজা করে কাটা, ফরসা গোঁফ ছুঁচাল করে তা দেয়া। আর ভবিষ্যতের অঢেল পরিকল্পনায় মাথাটা বোঝাই।

'আমার হাতিয়ারগুলো আর আমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারছে না,' তিনি প্রখোরকে বললেন।

নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্নাই তাঁর জন্য একপ্রস্থ হাতিয়ার রাশিয়া থেকে নিয়ে আসেন। ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁকে লিখেছিলেন: শুশেনস্কয়েতে তাঁর বন্ধু, অস্কার এঙবার্গ একজন দক্ষ ধাতুকর্মী, কাজের জন্য হা-পিত্যেশ করছে, প্রয়োজনীয় হাতিয়ার পেলে তাঁর পক্ষে খেটে খাওয়া সম্ভব হত।

লেওপোল্ডের কাছ থেকে মাক্সিম গোর্কির বদলে প্রখোর পেয়েছিল 'স্কুলের বন্ধুরা'। বইটি ভ্লাদিমির ইলিচের মা তাঁর অনুরোধে পাঠান প্রমিন্স্কির ছেলেমেয়েদের জন্য। বোন শিশুদের একটি বই অনুবাদ করেছেন শুনে আনন্দিত ভ্লাদিমির ইলিচ একটি কপি পাঠানোর জন্য মাকে অনুরোধ জানান।

...অস্কার এঙবার্গ প্রখোরকে তাঁর পরিকল্পনার কথা বলছিলেন: ডাক্তারের হুকুমমতো তিনি আর দু-একদিন বিছানায় থাকবেন। তারপর নির্বাসন থেকে বাড়ি যাবার দিন নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্নার জন্য কিছু একটা তৈরি করবেন। এটা হবে বইয়ের আকারের একটি ব্রোচ, ওপরে খোদাই করা থাকবে — 'কার্ল মার্কস, মনে রেখ।' তাই তিনি মনে রাখবেন কীভাবে তাঁকে মার্কসের 'পুঁজি' পড়িয়েছিলেন, রাজনীতির পথ দেখিয়েছিলেন। তাঁর মনে পড়বে শুশেনস্কয়ে আসার সময়, তিনি কী অনুপমা ছিলেন — যেন হালকা, লম্বা একটি কচি বার্চ গাছ। তিনি যখন হাসতেন, মনে হত যেন বাসন্তী উদ্যানের একটি দুয়ার খুলে গেছে!

যা হোক, এটা হবে অস্কারের স্মরণিক। আর নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্নার কাজ হবে উপহারটি নিয়ে বাড়ি ফেরা।

আকাশ ক্রমেই নিচু হয়ে আসছিল: ইস্পাত-ধূসর, তুষারবোঝাই। প্রখোর কামনা করছিল যেন অস্কার দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন, ইভান সসিপাতভিচ ভাল শিকার পায়

আর শুশার দিকে নেমে যাওয়া নির্দিষ্ট নির্জন গলিটিতে সে পৌঁছয়। বরফ-ঢাকা নদীটি এখন চেনা কঠিন হয়ে উঠেছে, শুধু জলের গর্তে যাওয়ার একটি হাঁটা-পথ দেখা যায়। ওই ছোট গর্তটার মসৃণ সবুজ পার, ধোঁয়া উঠছে তুষারশীতেল জল থেকে। 'পাশা সম্ভবত এখানে জামাকাপড় ধোয়ার কাজে আসে,' সে ভাবল।

প্রখোর রান্নাঘরে এল। তাকে দেখে পাশার যেন শ্বাস আটকে গেল! সে টুলে ধপ্ করে বসে পড়ল, যেন মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা। গত রাতে তাকে সে প্রমিন্স্কিদের ওখানে দেখেও দেখে নি। একটিও কথা বলে নি। সামান্যতম শুভেচ্ছাও উচ্চারণ করে নি।

গত রাতে নিশ্চয়ই পাশাও ঘুমোয় নি, তার চোখে উজ্জ্বলতা ছিল না।

'দেখ, কে এসেছে!' এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্না হাঁক ছাড়লেন। 'পিটার্সবুর্গের ছাপাখানার কর্মী, কমরেড প্রখোর! পাশা, সোনামণি, চা হলে মন্দ হত না? আর কিছু খাবার। ওর হয়ত খিদেও পেয়েছে? তোমার কী মনে হয়? প্রখোর, লজ্জা কর না। তোমাদের পিটার্সবুর্গ থেকে কত কাল ধরেই তো খাইয়ে আসছি। আমি সব জানি। তাহলে কমরেড, এসো আমরা স্মরণ করি আনিচ্কভ পুল, ঘোড়ার পিঠে মহান পিটার, কী বল?' প্রখোরের আসার প্রথম দিনের প্রতিযোগিতার কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্না তার দিকে গোপনে চোখ টিপলেন।

তখনকার সময়টা ছিল সন্ধ্যার কাছাকাছি। টেবিলে সামোভারে জল ফুটছিল, ধোঁয়া উঠছিল। এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্না সহজে, সানন্দে হেসেছিলেন। প্রখোর ভুলে গিয়েছিল নির্বাসনের কথা। জীবনকে স্বচ্ছন্দ মনে হয়েছিল! এই একই টেবিলে বসে সে চা খেয়েছিল। নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্নাকে গাঢ় রঙের পোশাক আর কাঁধের উপর ফেলা হালকা পশমী শালে কিশোরীর মতো রোগা-পটকা দেখাচ্ছে। ছোট ছোট পায়ে তিনি হাঁটছেন। যখন-তখন তিনি থামছেন, গলায় শালটা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

প্রখোর লেওপোল্ড হলে নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্নার এই পায়চারিটা তার কাছে অদ্ভুত ঠেকত। এটা ভ্লাদিমির ইলিচের একক অভ্যাস। এঁদের অভ্যাসগুলি না জানলেও নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্নার অস্থিরতা প্রখোরের নজর এড়াল না। তিনি পিটার্সবুর্গের দিনগুলির কথা ভাবছিলেন। হঠাৎ সবকিছুই তাঁর মনে পড়েছিল। লিফার্তে ছাপাখানার শিক্ষানবিস মুদ্রাকর প্রখোরকে দেখা মাত্রই দেশে ফেরার প্রবল ইচ্ছা তাঁকে মাতিয়ে দিল: পিটার্সবুর্গের শ্রমিক চক্র, যেখানে তিনি পড়াতেন, সেই সান্ধ্য স্কুল, সবকিছু। পুলিশকে লুকিয়ে কাজটা তাঁকে করতে হত। খুব ভালবাসতেন এটা। কত কষ্ট করে, কত উৎসাহে তিনি বক্তৃতাগুলি তৈরি করতেন! পড়ুয়ারা তাঁকে কত না ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। কিন্তু কী চমৎকারই না ছিল সব!

'শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বাস করলে, অন্তত আংশিকভাবে হলেও ওখানে কাটালে

জীবনের শক্তি, তাৎপর্য সম্পর্কে এক অদ্ভুত বোধ জন্মায়। আমি সব শ্রমিকের কথা বলছি না, বলছি তরুণ শ্রমিকদের কথা যাদের ওপর ইতিহাসের সব আশাভরসা... এইসঙ্গে প্রত্যেকটি শ্রমিককে জানাও খুবই জরুরি, খুবই কৌতূহলের ব্যাপারও বটে! তারা জান্তব সত্য, কোন বিমূর্ত প্রত্যয় নয়, জীবন্ত মানুষ, খুবই আলাদা, প্রত্যেকের আছে নিজস্ব মন... জানি না, কেন আজ আমাকে এমন বিষণ্ণতা পেয়ে বসল...'

'প্রমিন্‌স্কিদের চলে যাওয়ার জন্যে,' তাঁর মা বললেন।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। যখন জানা থাকে কেন বেঁচে আছি, যখন সামনে থাকে বড় রকমের কোন সমস্যা তখন ভালই বলতে হয়।' মায়ের কাছে গিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না বললেন। 'মামণি আমার।'

এলিজাভেতা ভাসিলিয়েভ্‌না টেবিলে বন-রুটি রাখলেন। ইয়ের্‌মলায়েভের ওখানে অঢেল আলু খাওয়ার পর প্রখোরের পেটে আর তিল ধরনের স্থান ছিল না। সে চা শেষ করে তার বাড়িওয়ালীর কঠোর নিয়মমতো খালি কাপটা পিরিচের উপর উল্টে বাকি চিনিটুকু ওতে রাখল। ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়ে ফিরে যাবার বিষণ্ণ চিন্তা তাকে পেয়ে বসল। চায়ের জন্য সে গৃহকর্ত্রীকে ধন্যবাদ দিল, এই পরিবারের জন্য ইয়ের্‌মাকভ্‌স্কয়ের বন্ধুদের পাঠান শুভেচ্ছার কথা জানাল এবং যাওয়ার আগে সম্ভব হলে ভ্লাদিমির ইলিচের সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য দেখা করতে চাইল।

'জরুরি কিছু?' নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না জানতে চাইলেন।

'না, জরুরি কিছু নয়। এমনি তাঁকে একটু দেখতে চাই।'

প্রখোরের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে ক্ষণেক তাকিয়ে তিনি কাজের ঘরে গেলেন। রেলিং দেয়া ডেস্ক আর বাঁয়ের কোণে রেলিং ঘেসা সবুজ শেডের বাতিটা আজও প্রখোর দেখে নি। ভ্লাদিমির ইলিচ প্রতিদিন গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করেন। চারপাশে মাইলের পর মাইল বিরান ভুঁই। সাইবেরিয়া, অসীম সাইবেরিয়া। তাইগা, অন্ধকার। আর কেবল একটিই আলোকিত জানালা...

ভ্লাদিমির ইলিচ ডেস্কে লিখছিলেন। ধারাল পেন্সিল পাতার উপর অবিরাম চলছিল। নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না তাঁর লেখার ধরন জানাতেন — অসম্ভব দ্রুত লেখেন তিনি। লেখার এই অসম্ভব গতি তাঁর পছন্দসই। কাউকে ভালবাসলে তার সবকিছুই ভাল লাগে।

নাদেজ্‌দা কন্‌স্তান্‌তিনভ্‌না নিজের টেবিলে বসলেন। ওখানেই তাঁর অসমাপ্ত কাজ পড়ে আছে — জার্মান থেকে কিছু অনুবাদ আর 'নারী শ্রমিক' বইটির পাণ্ডুলিপি। টেবিলে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে তিনি হাতে থুতনি রাখলেন। ভ্লাদিমির ইলিচ লেখায় ব্যস্ত থাকলে তিনি ওভাবেই অনেকক্ষণ বসে থাকেন। কোন শব্দ বা নড়াচড়া করেন না।

ভ্লাদিমির ইলিচ মাথা তুললেন, এক পলক তাকালেন। মায়াভরা চাহনিতে যেন

বলতে চাইলেন: 'এসেছ প্রিয়তমা, এখানেই থেকো। খানিকটা অপেক্ষা কর। ওটা শেষ করতে হবে। জরুরি ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়া চলবে না...' আবার তিনি চিন্তায় ডুবে গেলেন।

'উনি খুব বেশি খাটছেন,' নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্না ভাবছিলেন। 'খুব বেশি! ভাল ঘুমুচ্ছেন না। রোগা হয়ে যাচ্ছেন। ওঁর স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ছে। আলাপের মাঝখানে হঠাৎ চুপ করে যান। বাক্যটা আর শেষ করেন না। শুশেনস্কয়েতে আরও তিন মাস থাকতে হবে। নির্বাসনের কঠিনতম মাস তিনটি! তাঁর হৃদয়, মন, সমগ্র সত্তা ভবিষ্যচিন্তায় মগ্ন। শেষটা যতই এগুচ্ছে ততই তিনি বাস্তব কাজে নেমে পড়ার জন্যে, পার্টির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পুনর্গঠনের জন্যে অধীর হয়ে উঠছেন!'

ভ্লাদিমির ইলিচ তখন 'রাবোচায়া গাজেতা' কাগজের জন্য একটি প্রবন্ধ লিখছিলেন। এক বছর আগে মিন্স্কে অনুষ্ঠিত পার্টির প্রথম কংগ্রেসে এটিকেই পার্টির আনুষ্ঠানিক মুখপত্র করা হয়। প্রায় সকল প্রতিনিধিই গ্রেপ্তার হন। কাগজটি পুলিশী হামলার লক্ষ্য হয়ে ওঠে। শুধু দুটিমাত্র সংখ্যা বেরয়। পরোক্ষ সূত্রে ভ্লাদিমির ইলিচ জানতে পারেন যে সহকর্মীরা কাগজটি আবার বের করার চেষ্টা করছেন। আসল কথা হল প্রবন্ধটি লেখা, এমন কি 'রাবোচায়া গাজেতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলেও।

তিনি লিখেছেন: 'পুরোপুরি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমরা আমাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। মার্কসবাদী প্রথম সমাজতন্ত্রকে ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করেছে... মার্কসের তত্ত্বকে পূর্ণাঙ্গ আর অলঙ্ঘ্য বলে আমরা মনে করি না... আমাদের মনে হয় মার্কসীয় তত্ত্বের 'স্বাধীন' বিশদীকরণ রুশ সমাজতন্ত্রীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ... রাশিয়ায় কেবল শ্রমিকরাই নয়, সকল নাগরিকই রাজনৈতিক অধিকারহীন। রাশিয়া অন্তহীন, স্বেচ্ছাচারী এক রাজতন্ত্রের অধীন। জার একাই আইন জারি করেন, কর্মচারি নিয়োগ করেন, তাদের নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।'

নির্বাসনের গুরুত্বপূর্ণ এই শেষ মাসগুলিতে ভ্লাদিমির ইলিচ শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামের কর্মসূচিটি মনে মনে সূত্রবদ্ধ করেন: জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে, পুলিশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, যথেচ্ছাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

সমাজতন্ত্রের জন্য। নতুন সমাজের জন্য।

বিপ্লবী শ্রমিক পার্টির খসড়া কর্মসূচিটি ক্রমেই তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পরিকল্পনায় বিস্ময়কর কিছুই ছিল না। শূন্যগর্ভ বাক্যাবলীও নয়। সবই হল বাস্তব, প্রায়োগিক ও সম্ভবপর। অসম্ভব, অপ্রাপ্য কোন আদর্শ দেখিয়ে কী লাভ? ব্যর্থ চেষ্টার কী অর্থ? রাশিয়ার শ্রমিক পার্টির জন্য ভ্লাদিমির ইলিচের পরিকল্পিত কর্মসূচিটির শক্তির উৎস ছিল তার বাস্তবমুখী লক্ষ্য।

লেখা থামিয়ে তিনি স্ত্রীর কাছে এসে দাঁড়ালেন।

'কী, সোনা আমার?'

'কিছু না, শুধু দিবাস্বপ্ন,' তিনি হাসলেন। 'ওহ্, ভলোদিয়া, জানো, ওই অল্পবয়সী ছেলেটি, প্রখোর এসেছে...'

দুজনেরই গোড়া থেকে প্রখোরকে পছন্দ হয়েছিল। ভ্লাদিমির ইলিচের মতে ছেলেটা সত্যিসত্যিই তাঁদের দিকে, বিপ্লবের আদর্শের দিকে ঝুঁকেছে।

'কী খবর? পড়াশোনা কেমন চলছে?' কাজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রখোরকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন। 'জোরেসোরে শুরু করেছেন? রোজ রোজ? আপনার জন্য ভাল। মিখাইল আলেক্সান্দ্রভিচ সিল্ভিন ফরাসী বিপ্লব নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন? দেখ, দেখ, নাদিয়া, কমরেড প্রখোর কতটা এগিয়েছেন। ক্লাসে কি দর্শন নিয়েও আলোচনা চলে? বলতে পারেন পুরনো দার্শনিক আর মার্কসবাদী, আমাদের কালের দার্শনিকদের পার্থক্যটা কোথায়? এদের মধ্যেকার বিরাট, মূল ফারাকটা জানেন কমরেড?'

প্রখোরের মধ্যে তিনি তাঁর অন্তর্লীন, দুর্দম সাহসী চিন্তার সাড়া আঁচ করে তাকে মনের মূল চিন্তাগুলি, সকালের কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, মৌলিক ব্যাপারগুলির কথা বললেন।

'মার্কস বলেছেন যে, অতীতের দার্শনিকরা কেবল দুনিয়াকে ব্যাখ্যাই করেছেন অথচ আমাদের মতাবলম্বী, আমাদের কালের দার্শনিকরা দুনিয়াকে ঢেলে সাজাতে চান। এটাই তাঁদের মধ্যেকার মূল পার্থক্য। আমরা পৃথিবীর স্বরূপ বুঝতে পেরেছি। এটাকে ব্যাখ্যাও করেছি। আমরা তাকে নতুন করে গড়ব।'

'আমার মনে হয়, ইতিমধ্যেই আমাদের প্রজন্মের মানুষেরা...' বললেন নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্না।

'হ্যাঁ!' যোগ দিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ। 'ইতিমধ্যেই আমাদের প্রজন্ম, কমরেড প্রখোর, তোমাদের তো কথাই নেই, তাদের লক্ষ্যে পৌঁছবেই। পরিকল্পনা মতোই তারা লক্ষ্যসাধন করবে। আমাদের কর্তব্য আমরা ভালই জানি: দুনিয়াকে নতুন করে গড়তে হবে। ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর রকমের জরুরি, কমরেড প্রখোর। এটা জানা, এতে অটল থাকা, বিশ্বাস রাখা দরকার! নড়বড়ে হওয়া নয়...'

প্রখোর শুনে গেল। ভ্লাদিমির ইলিচের কথাগুলি অন্তর দিয়ে সে গ্রহণ করল।

উলিয়ানভরা এখানে আরও তিন মাস আছেন। এর মধ্যে আরেকবার আসা কি তার পক্ষে সম্ভব হবে? আর কি কোনদিন ভ্লাদিমির ইলিচের সঙ্গে দেখা হবে? ইতিহাসই শুধু এর উত্তর জানে। ১৯১৭ সালে হয়ত আবার তাঁদের দেখা হবে...

ঘরে আর পাশা ছিল না। সে কোথায়? কোথায় সে গেছে? যে-প্রশ্নটি তার মনে তোলাপাড় জাগিয়েছে, ভ্লাদিমির ইলিচের কাছে কি সে তার সমাধান চাইবে? কেন,

প্রখোর, তোমার কি মাথা বিগড়েছে? ভ্লাদিমির ইলিচের এই সারগর্ভ বক্তৃতা শোনার পর? ঠিক কথা! ধরা যাক, প্রখোর তাঁকে বলল:

'দুজন বিপ্লবী একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছে। তারা কী করবে?'

'আর মেয়েটি? সে কাকে ভালবাসে?' সম্ভবত ভ্লাদিমির ইলিচ এমন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন।

কিন্তু কথাগুলি প্রখোরের গলায় আটকে গেল। সে কিছুই জিজ্ঞেস করল না। এমন স্পর্ধা তার ছিল না। 'কিন্তু ভ্লাদিমির ইলিচের উত্তর ঠিক এমনটিই হত,' সে ভাবল।

* * *

বিদায় নিয়ে সে চলে গেল। আকাশ ভারি, পাঁশুটে। মনে হল, যেন এখনই আকাশ চৌচির হয়ে সারা গাঁয়ে বরফ ছড়িয়ে পড়বে। সায়ানের উপর বরফ। তাইগার উপর। বরফ, আর বরফ...

সামনের উঠোনে কুঞ্জের উপরের হপ লতা এখন শুকনো, বাদামী, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ান। ভ্লাদিমির ইলিচ, নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনভ্না গ্রীষ্মের রাতে এখানে বসে পাতার ফাঁক দিয়ে আর কোনদিন তারাভরা সাইবেরিয়ার আকাশে তাকিয়ে থাকবেন না।

'প্রখোর!'

বাড়ির পেছন থেকে পাশা বেরিয়ে এল। তার গায়ে হলুদ চামড়ার কোট, পায়ে ফেল্টের বুট, শুধু শালটাই নেই।

'প্রখোর, একটু দাঁড়াও প্রখোর!' নরম, ছাই-রঙা দস্তানাদুটি হাতে গুঁজে দিতে দিতে রুদ্ধশ্বাসে তড়িঘড়ি সে বলল।

'কেন?'

'মায়ের স্মৃতি হাতছাড়া করতে নেই। এটা যত্ন করে রেখে দেয়া উচিত। নাও ওগুলো। ভাল করে রাখবে।'

মুখ নুইয়ে পাশা সামনে দাঁড়াল। সে হতাশ, বিষণ্ণ।

'পাশা, তুমি লেওপোল্ডকে কিছু বললে না কেন?'

'আর তুমি?'

'পাশা, লেওপোল্ড আমাকে বলেছে যে তোমাকে যেন বলি — সে কোনদিন তোমাকে ভুলবে না। সারা জীবন তোমাকে ভালবাসবে,' জবাবে সে বলল।

পাশা কথা বলল না, মাথাও তুলল না।

'পাশা, আমাকে দূরে কোথাও না পাঠালে আমি আবার এখানে আসব। আর যদি পাঠায়ও, তবু যেভাবেই হোক আমি আসবই।'

হঠাৎ পাশা হাতদুটি প্রখোরের কাঁধে রেখে বলল:

'হ্যাঁ, এসো, এসো, অবশ্যই আসবে! নির্বাসিত বেচারীরা, তোমাদের জন্যে আমার ভারি দুঃখ হয়। সব সময় কেবল তাড়িয়েই নিচ্ছে। না আছে স্বাধীনতা, না কিছু। অথচ মানুষ তোমরা ভালই। বেচারীরা...'

সে মাফলারটা তার গলায় এ'টে দিল। বিস্মিত, পুলকিত, দুঃখিত প্রখোর শুনল পাশা আবার বলছে:

'প্রখোর, এসো, আসবে কিন্তু!'

তারপর সে ছুটে গেল। ওই সেবারের মতোই।

শুশেনস্কয়ের আকাশ ভারি হয়ে উঠেছে। বারান্দায় খোদাই-করা খুঁটি লাগান বাড়িটার দিকে শেষবারের মতো প্রখোর ফিরে তাকাল।

'স্থানীয় জেলা-প্রশাসকের অফিসে অথবা সরাইখানায় গিয়ে ইয়ের্মাকভ্স্কয়ে যাবার জন্য একটা স্লেজের ব্যবস্থা করতে হবে। ভাগ্য প্রসন্ন না হলে সে পায়ে হেঁটেই স্তেপ আর জঙ্গল পাড়ি দেবে। কী আর হবে! আসলে নেকড়েরা তো হামেশাই জ্যান্ত মানুষ খেয়ে ফেলে না। কোনক্রমে সে পেণছে যাবেই। ইয়ের্মাকভ্স্কয়ে গাঁয়ে তার জন্য কী অপেক্ষা করছে, গরহাজিরা জন্য কী শাস্তি সে পাবে' — প্রখোর ভাবছিল।

কিছু আসে-যায় না। যা হবার হবে। সে অটল সংকল্পে এগিয়ে চলল। সে প্রায় সুখী।

'ভ্লাদিমির ইলিচ বলেছেন: আমাদের কাজ শুধু ব্যাখ্যা নয়, নতুন দুনিয়া গড়াও' — চলতে চলতে সে তাই ভাবছিল। আর পাশা, প্রিয়তমা পাশা চোখের সামনে দাঁড়িয়ে বলে: 'তোমরা ভালো মানুষ, বেচারী সব...'

১৯৬৪-১৯৬৫

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন
১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো ১১৯৮৫৯, সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow 119859, Soviet Union

মারিয়া প্রিলেজায়েভা জন্মগ্রহণ করেন শিক্ষক পরিবারে। শৈশবে তাঁকে কঠিন অবস্থার মধ্যে কাটাতে হয়, ১৩ বছর বয়স থেকে কাজ করতে হয়। শিক্ষক-প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় শেষ করার পর ইনস্টিটিউটের পাঠ শেষ করে প্রিলেজায়েভা অনাথ শিশুভবনের এবং স্কুলের শিক্ষিকার কাজ করেন। এই কারণে তাঁর প্রথম দিককার রচনা—স্কুল সম্পর্কিত নানা উপাখ্যান। পরবর্তীকালে লেখিকা লেনিন সম্পর্কিত বিষয়বস্তু, মহানায়কের জীবনী ও তাঁর সৃজনকর্ম সংক্রান্ত বিষয়ের আশ্রয় নেন। বহু ভাষায় অনূদিত তাঁর বহুল পরিচিত গ্রন্থ 'লেনিনের জীবন' ১৯৮০ সালে বাংলায় প্রকাশিত হয়।

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের ব্যক্তিত্বের প্রতি মারিয়া প্রিলেজায়েভার আগ্রহ এত দূর ছিল যে লেনিনগ্রাদের ভার্সিলিয়েভস্কি দ্বীপের অনাড়ম্বর ঘরটিতে, সাইবেরিয়ার শুশেনস্কয়ে গ্রামে—যেখানে যেখানে লেনিনকে থাকতে ও বাস করতে হয়েছিল সেখানেই তিনি যান। 'লেনিন: অরণ্যে অন্তরীণ' (১৯৬৬) উপাখ্যানটিতে শুশেনস্কয়ে গ্রামে ভ্লাদিমির ইলিচের তিন বছর বসবাসকালের একটি পর্বের (১৮৯৯), লেনিনের সৃজনকর্ম ও কার্যকলাপের এক অসাধারণ ফলপ্রসূ সময়ের কথা বিবৃত হয়েছে।

**'রাদুগা' প্রকাশন থেকে ১৯৮৫ সালে
প্রকাশিত হবে**

ইউরি দ্মিত্রিয়েভ। ওরাও কথা বলে

লেখক জনপ্রিয় ও চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে শিশুদের কাছে জীবজন্তুর 'ভাষা' চর্চার বিবরণ দিয়েছেন। যে-সমস্ত কীটপতঙ্গ খেতের ফসল নষ্ট করে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য অথবা বিপদগ্রস্ত পশুপাখি ও মাছকে উদ্ধার করার ক্ষেত্রে এই সব জ্ঞান মানুষ কী ভাবে কাজে লাগায় তিনি তারও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

প্রকৃতি ও জীবজন্তুকে ভালোবাসা এবং তাদের রক্ষা করা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এই বইয়ে তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। জওহরলাল নেহরুর কথায়: 'আমাদের চমৎকার পশুপাখিদের অস্তিত্ব নষ্ট হওয়া মানে জীবন সঙ্গে সঙ্গে হয়ে দাঁড়াবে বৈচিত্র্যহীন ও নিষ্প্রভ।'

‘রাদুগা’ প্রকাশন থেকে ১৯৮৫ সালে
প্রকাশিত হল

আলেক্সান্দর গ্রিন। রাঙা পাল: গল্প ও উপাখ্যান

রোমাণ্টিক কথাশিল্পী আলেক্সান্দর গ্রিন (১৮৮০-১৯৩২) সাগরের স্বপ্ন দেখতেন, আর দেখতেন সুখ ও নির্মল ঊষার স্বপ্ন, তাঁর আস্থা ছিল বিশুদ্ধ প্রেমের অপার শক্তিতে। তিনি নিজে স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন এবং তাঁর নিজের কল্পনাশক্তির বলে এমন এক আশ্চর্য জগতের সঙ্গে পাঠকবর্গের পরিচয় ঘটান, যেখানে মানুষের পূর্বনির্দিষ্ট উচ্চ লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাস এবং ন্যায়বিচার জয়লাভ করে। আলেক্সান্দর গ্রিনের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উপাখ্যান কোটি কোটি তরুণ-তরুণীর হৃদয়গ্রাহী ‘রাঙা পাল’-এর এই হল মূল বক্তব্য: আসল নামে যে মেয়েটি সাগর-উপকূলে বাস করত তার বিশ্বাস ছিল যে মানুষ যদি মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচয় দিতে পারে, তাহলে সূর্যোদয়ের আলোয় ঝলমলে রাঙা পালও রাঙাই থেকে যাবে।

সংকলনটিতে এই সঙ্গে তিনটি গল্পও স্থান পেয়েছে।

‘রাদুগা’ প্রকাশন থেকে ১৯৮৫ সালে
প্রকাশিত হল

আলেক্সান্দর ফাদেয়েভ। মেতেলিৎসা

আলেক্সান্দর ফাদেয়েভ (১৯০১-১৯৫৬) তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘ছত্রভঙ্গ’ লেখেন ১৯২৪ সালে। সোভিয়েত দূরপ্রাচ্যে গৃহযুদ্ধ ও গেরিলা আন্দোলন সম্পর্কে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উপন্যাসটির ভিত্তি। যে সমস্ত বীরত্বপূর্ণ ও ট্র্যাজিক ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেন সেগুলি তাঁর মনে অনপনেয় ছাপ ফেলে এবং তারই ভিত্তিতে তিনি শ্বেতরক্ষী ও বিদেশী সামরিক হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত লালফৌজের এক গেরিলা ডিট্যাচমেণ্ট সম্পর্কে একটি উপন্যাসের প্লট তৈরি করেন।

এই বইটি উক্ত উপন্যাসের একটি অধ্যায়। গল্পের নায়ক গেরিলা ডিট্যাচমেণ্টের এক সাধারণ সৈনিক মেতেলিৎসা। সঙ্কটের মুহূর্তে যে দৃঢ়তা, সাহস ও অদম্য ইচ্ছাশক্তির পরিচয় সে দিয়েছিল সেই কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে এখানে।

Мария Прилежаева. Удивительный год.
На языке бенгали. Перевод сделан по книге:
М. Прилежаева. Удивительный год. — М.